ন. লুচ্‌নিক

কেন
আমি

বাবার

মতন

ন: লুচ্‌নিক

কেন আমি বাবার মতন

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো
১৯৭৭

অনুবাদ: দ্বিজেন শর্মা

অঙ্গসজ্জা: গ. সাউকভ

Н. ЛУЧНИК

«ПОЧЕМУ Я ПОХОЖ НА ПАПУ»

На языке бенгали

© সংশোধিত বাংলা অনুবাদ · সচিত্র · প্রগতি প্রকাশন · ১৯৭৭

Л $\frac{21003-619}{014(01)-77}$680—77

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

সূচীপত্র

প্রস্তাবনা ৭

অধ্যাপক বনাম গির্জার যাজক ৭

মরণোত্তর খ্যাতি ১৩

সেই মহারহস্য ১৩
স্থলী ও কোষ ১৫
আকাদমি আয়োজিত একটি প্রতিযোগিতা ১৯
বিজ্ঞান আকাদমি ও বিজ্ঞান ২৫
যোহান হলেন গ্রেগর ২৭
প্রকৃতির নিয়মাবলী ৩০
একটি উন্মদ প্রকল্প ৩৫
ষোল বছর পরে ৪২

মাছি আর হাতি ৪৬

যেন এক চলচ্চিত্র ৪৬
ক্রমোসোমের নৃত্যকলা ৪৮
অর্ধ-বিভাজন প্রক্রিয়া ৫০
প্রকল্প থেকে তত্ত্ব ৫৩
বংশানুসৃতির মানচিত্র ৫৯
একটা জিন দেখান তো ৬৩
কীভাবে এমনটি ঘটে? ৬৯

প্রকার উৎপত্তির নিয়ম ৭২

একটি আত্মহত্যার কাহিনী ৭২
বিজ্ঞানীর প্রতি ইঞ্জিনিয়রের চ্যালেঞ্জ ৭৭
বিস্মৃতির অতল থেকে ফিরে পাওয়া নতুন ৮১
বংশাণুবিদদের কাজ শুরু ৮৩

একটি সাদা কাকের ভাগ্য ৯০
সেই গুরুত্বপূর্ণ সংশ্লেষ ৯৪
নবজীবনের সন্ধান ৯৯
প্রাচুর্যের স্রষ্টা ১০২

আক্রান্ত জিন ১০৪

একটি দুর্গের পতন ১০৪
ছলনাকারী রশ্মি ১১০
আণবিক বিস্ফোরণের পাল্লা ১১২
একটি বিজ্ঞানের জন্ম ১১৭
এক হেঁয়ালির সমাধান ১২০
আয়োডিন থেকে ইপেরাইট ১২৪
কোষ পুনর্নবায়ন ১২৮
অপসৃত শংকা ১৩১
মানুষের কল্যাণে ১৩৫

স্বপ্রজননক্ষম অণু ১৪০

বংশাণুবিদ্যা ও জৈবরসায়নের দোস্তি ১৪০
অবয়ব ও উপাদান ১৪২
স্বপ্রজননক্ষম অণু? ১৪৪
সন্দেহজনক নিউক্লিক এসিড ১৪৯
সঞ্চীয়মান প্রমাণপুঞ্জ ১৫২

রাণী হলেন সিণ্ডারেলা ১৬০

স্বপ্রজননক্ষম সেই অণু ১৬০
পরীক্ষণীয় প্রকল্পটি ১৬৪
তাত্ত্বিকেরা দায়িত্ব পেলেন ১৬৭
মানুষের তৈরি নিউক্লিক এসিড ১৭২
নিরেনবার্গের মহাসাফল্য ১৭৬

বংশানুসৃতির অ-আ, ক-খ ১৮০

নববর্ষে অপ্রত্যাশিত উপহার ১৮০
একটি রোমাঞ্চকর ঘটনা! ১৮২
একটি নিয়মের সন্ধানে ১৮৬
তত সহজ নয় ১৮৮

তিনটি পথ ১৯১

তবু কেন বাবার মতন ১৯৯

চতুর্দশ পুরুষ অবধি ১৯৯
দাবাখেলার ঘোড়ার চাল ২০১
আরোগ্যাতীত নয় ২০৬
জিন আর মানুষ ২০৯

পরিভাষা ২১২

প্রস্তাবনা

অধ্যাপক বনাম গির্জার যাজক

খুঁতখুঁতে স্বভাব ও সময়নিষ্ঠা সম্পর্কে আত্যন্তিক জেদের জন্য মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কার্ল ফন নেগেলির খ্যাতি ছিল। এ নিয়ে তাঁর নিজের অহঙ্কারও কিছু কম ছিল না। হয়ত-বা এজন্যই উদ্ভিদবিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে তিনি হায়েরেশিয়াম *(Hieracium)* তাঁর গবেষণার বিষয় হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন। গাছটির মাথায় ছিল ঝাঁকড়া হলুদফুলের মঞ্জরী। এদের নিয়ে কাজ করতে হলে সবকিছু অত্যধিক নিখুঁত হওয়া চাই।

অধ্যাপক সর্বত্রই ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় চলতেন এবং যথাসময়ে চিঠির উত্তর দিতেন। কিন্তু প্রায় দু'মাস পার হলেও একটি চিঠির উত্তর তিনি দিতে পারছিলেন না। কিন্তু এর উত্তরে কী বলা উচিত? চিঠিটি কোন বিজ্ঞানীর নয়। স্বাক্ষর থেকে তা স্পষ্টতই প্রমাণিত। লিখেছে: 'মহামান্যের শ্রদ্ধাবনত ও বিনীত ভৃত্য, গ্রেগর মেণ্ডেল, গীর্জার যাজক এবং মঠস্কুলের শিক্ষক।' তারিখ ৩১শে ডিসেম্বর ১৮৬৬, আর আজ ফেব্রুয়ারির ২৫শে... কিন্তু নামই তো সবকিছু নয়। মেণ্ডেল তাঁর কাছে প্রবন্ধ পাঠিয়েছেন। তবে নেগেলির মতে কোন বিজ্ঞানীর পক্ষে এমন উদ্ভট কিছু লেখা অসম্ভব: এ তো উদ্ভিদবিজ্ঞান ও বীজগণিতের জগাখিচুড়ী।

যদি উদ্ভিদবিজ্ঞানী হও, কেবল উদ্ভিদবিজ্ঞান নিয়েই থাকবে, আর যদি গাণিতিক হও উদ্ভিদ সংকরণে মাথা গলানো কেন? সত্য কথা, ছোকরা লেখকটিকে নিরুৎসাহিত করাও তো কাজের কথা নয় (নেগেলি জানতেন না

যে মেণ্ডেলের বয়স তখন চল্লিশ পার হয়ে গেছে)। সে অত্যন্ত পরিশ্রমী। তার যত্ন ও ধৈর্য অনেকের জন্যই অনুকরণীয়। তার দাবী, সে সংকরসমূহের চারিত্র্যগঠন সম্পর্কিত নিয়মাবলী আবিষ্কার করেছে। তবে তাকে বোঝাতে হবে যে, আবিষ্কারের কথাই এখানে ওঠে না।

অধ্যাপকের গম্ভীর মুখে ধূর্ত হাসি ঝলকে উঠল। তিনি তাঁর চশমা ঠিক করলেন, উঁচু মসৃণ ভ্রূর উপর আস্তে আস্তে হাত বুলালেন এবং কলম হাতে নিলেন। তিনি লিখলেন: 'আমার মনে হয় পাইসাম সম্পর্কিত পরীক্ষা শেষ হতে এখনো অনেক দেরী। এ কেবল শুরু মাত্র। এখনকার গবেষকদের সবচেয়ে যা বড় ভুল তা হল কোল্‌রয়টার ও গের্টনারের তুলনায় তাঁদের আত্যন্তিক স্বল্প অধ্যবসায়।' এতেই চলবে। কিন্তু তরুণ গবেষককে উৎসাহিত করা উচিত।

'আমি দেখে খুশি হয়েছি যে আপনার ক্ষেত্রে এ ত্রুটির পুনরাবৃত্তি ঘটে নি। আপনি প্রখ্যাত পূর্বসূরীদের পদাংক অনুসরণ করছেন। উৎকর্ষতায় তাঁদের অতিক্রমের চেষ্টা করা আপনার কর্তব্য এবং আমার মতে (এবং কেবল এতেই সংকরণ তত্ত্বের অগ্রগতি নিহিত) একটিমাত্র লক্ষ্যবস্তুর সামগ্রিক চারিত্র্যের ভিত্তিতে, সুচিহ্নিত লক্ষ্যে পরীক্ষাটি চালিত হলেই তা শুধু সম্ভবপর।' এসব প্রসংশা শুনে সে দ্বিগুণ শক্তিতে তার কাজ চালিয়ে যাবে।

কিন্তু চিঠিতে নেগেলি যথেষ্ট তুষ্ট হলেন না। তিনি তাঁর বিরাট আর্মচেয়ারে হেলান দিয়ে ছোট দাড়িতে আঙুল চালাতে শুরু করলেন।

সমীকরণগুলো সম্পর্কে কী বলা যায়? মেণ্ডেলের মতে এগুলোই প্রবন্ধের সারাংশ অথচ অধ্যাপক সে সম্পর্কে এখনো কিছুই লিখেন নি। গণিত তাঁর অপছন্দ। আর উদ্ভিদবিজ্ঞানীর কাছে এর প্রয়োজনই-বা কী? তিনি টেবিলের উপর নুয়ে পড়লেন ও লিখলেন যে মেণ্ডেলের সমীকরণগুলি কেবলমাত্র মটরশুঁটি পরীক্ষায়ই প্রযোজ্য। তারপর যোগ করলেন: 'অন্য ধরনের উদ্ভিদ নিয়ে আপনার পরীক্ষার ইচ্ছা খুবই চমৎকার এবং আমি নিশ্চিত যে, নানা প্রকার গাছগাছড়া নিয়ে পরীক্ষায় আপনি বিভিন্ন ধরনের ফল দেখতে পাবেন।'

সে অন্য কোন কিছু নিয়েই না হয় পরীক্ষা করুক। হায়েরেশিয়াম নিয়েই কাজ করার জন্য তাকে উপদেশ দিই না কেন? মনে হচ্ছে মেণ্ডেল খুবই নিয়মনিষ্ঠ, হয়ত-বা এ থেকে কোন ফলও পাওয়া যেতে পারে। এতে নেগেলিরও অনেক সাহায্য হবে। কার্ল ফন নেগেলির লেখা ও শব্দাবলীতে মারাত্মক সম্ভাবনা নিহিত ছিল।

ব্রিউন (এখনকার ব্রুনো)-এর মঠস্কুলের শিক্ষক যোহান গ্রেগর মেণ্ডেল একটি মহান আবিষ্কারের অধিকারী ছিলেন। তিনি একজন প্রখ্যাত উদ্ভিদবিজ্ঞানী, একজন সংকরণ বিশেষজ্ঞের সমর্থন চেয়েছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিটি এর বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারলেন না। এতে কোন ক্ষতি নেই। কারণ, মেণ্ডেল নিজে নিশ্চিত ছিলেন যে, তিনি প্রকৃতির একটি সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করেছেন।

এর মারাত্মক দিক হল হায়েরেশিয়াম নিয়ে কাজ করা সম্পর্কে তাঁর প্রতি নেগেলির উপদেশ। অতি ক্ষুদ্রাকৃতি ফুলের জন্য এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা দুঃসাধ্য ছিল। কিন্তু তাছাড়াও দুর্লভ কিছু বৈশিষ্ট্যের জন্য ওটি ছিল সংকরণ পরীক্ষার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। মেণ্ডেল ও নেগেলি উভয়েরই মৃত্যুর পর, বিংশ শতাব্দীর শুরুতে স্কাণ্ডিনেভীয় উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন যে, হায়েরেশিয়াম [কম্পোসিটি *(Compositae)* গোত্রীয় বহু প্রজাতির মতো] পরাগায়ণ ব্যতিরেকেই বীজোৎপাদনে সক্ষম। এদের মধ্যে নিষেক দুষ্প্রাপ্য। ফলত যে কয়েক বছর মেণ্ডেল হায়েরেশিয়াম পরীক্ষা করেছিলেন তার ফল

হয়েছিল অন্য উদ্ভিদ অপেক্ষা স্বতন্ত্র এবং শেষে এমন কি তিনি তাঁর নিজের আবিষ্কারের যাথার্থ্য সম্পর্কেও সন্দিহান হতে বাধ্য হয়েছিলেন।

নেগেলি যদি মেণ্ডেলের আবিষ্কারের যথার্থ গুরুত্ব বুঝতে পারতেন তবে আধুনিক বংশাণুবিদ্যার জন্ম হত ১৮৬০-এর দশকে। কিন্তু তার পরিবর্তে মেণ্ডেলের গবেষণা গ্রন্থাগারের অন্ধকারে হাতের স্পর্শ এড়িয়ে সাড়ে তিন দশক আটকা পড়ে থাকল। কেবল ১৯০০ সালে তাঁর নিয়মাবলী এবং সেই সঙ্গে তাঁকেও পুনরাবিষ্কার করা হল এবং তিনি বিখ্যাত হলেন। এখন সারা দুনিয়ায় তিনি পরিচিত।

বংশানুসৃতির মৌল নিয়মাবলী আবিষ্কারের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য ১৯৬৫ সালের আগস্ট মাসে সারা দুনিয়ার বংশাণুবিদরা চেকোস্লোভাকিয়ায় সমবেত হন।

আমার বিশেষ সৌভাগ্য যে, আমিও উৎসব ও আলোচনানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম এবং অন্যতম অধিবেশনে একটি নিবন্ধ পাঠ করেছিলাম। পক্ষকালের এ এক অবিস্মরণীয় স্মৃতি। বংশাণুর সূক্ষ্ম সংযুতির আধুনিক প্রত্যয় সম্পর্কিত নিবন্ধ, চার্লস্‌-সেতু থেকে দেখা ভ্ল্‌তাভার বিশাল জলরাশির প্রশংসা, গির্জার প্রাক্তন মোহন্ত ও ঊর্ধ্বতন যাজক গ্রেগর মেণ্ডেলের স্মরণে আয়োজিত মোৎসার্টের *Ave verum* অনুষ্ঠান — এসবের মধ্য থেকেও আমার মনে সর্বক্ষণ যে একটিমাত্র ভাবনা সোচ্চার ছিল তা হল বিজ্ঞানের ভবিতব্য।

অবশ্য অনুষ্ঠানে মেণ্ডেলবাদের ইতিহাস অথবা বংশাণুবিদ্যা সম্পর্কে আমি কোন নতুন তথ্য শুনি নি। কিন্তু বিগত এক শতাব্দীর পরিসরে বংশানুবিদ্যা যে পথে অগ্রসর হয়েছে, আলোচনাকালে পঠিত নিবন্ধাবলী এবং সার্বিক পরিবেশ, সে সম্পর্কে ভাবতে আমাকে বাধ্য করেছিল। বিস্ময়কর কত কিছুই না এখানে ঘটেছে।

মেণ্ডেলের আবিষ্কার ৩৪ বৎসর অজ্ঞাত থাকার পর একই সঙ্গে তিনটি বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের দ্বারা তার পুনরাবিষ্কারের

কাহিনী সম্ভবত অনেকেই জানেন। কিন্তু আপনারা কি জানেন বংশাণুর রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য এবং তেজস্ক্রিয়তা ও রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে বংশানুসৃতির পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রথম আবিষ্কারে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল? পদার্থবিদদের মতো বংশাণুবিদরাও যে ইদানীংকালে আণবিক ও পারমাণবিক পর্যায়ে অনুপ্রবিষ্ট এবং কোন কোন বংশানুসৃত ব্যাধির 'রাসায়নিক সূত্র' লিখনে সক্ষম, এ কি বিস্ময়কর নয়? কিন্তু গত শতাব্দীর শেষ থেকেই যে বিজ্ঞানীরা এককভাবে প্রতিবন্ধ ভেদ করে আধুনিকতম আবিষ্কারের পথে অভিযাত্রী হয়েছিলেন কতজন তা জানেন? মেণ্ডেলবাদের সমান্তরালবর্তী মেণ্ডেলবাদের বিরোধী তত্ত্বের সার্বক্ষণিক অস্তিত্ব এবং সময়বিশেষে তার প্রাধান্যের বাস্তব বিবেচনা থেকেই-বা আজ কীভাবে নীরব থাকা সম্ভব?

পূর্বোক্ত উপলব্ধি থেকেই বংশাণুবিদ্যা ও বংশাণুবিদ, এই বিজ্ঞান এবং এর স্রষ্টাদের নিয়তি সম্পর্কে গ্রন্থ রচনার চিন্তা আমার মনে আসে।

বিজ্ঞানের সাফল্য ছাড়াও এতে আছেন সত্যিকার মানুষ, যাঁরা এদের সৃষ্টি করেন, যাঁরা প্রথম আবিষ্কারকের জয়োল্লাসে আলোড়িত হন, যাঁরা ভুল করেন এবং দুর্ভাগ্যের শিকার হন। মেণ্ডেল বনাম নেগেলির ঘটনা কি নাটকীয় নয়? আমার মতে তা শেক্সপীয়রের কোন ট্রাজেডীর বিষয় হতে পারত। ১৮৬৬ সালের শেষে তাঁর কাছে প্রেরিত প্রবন্ধের মর্মোদ্ধারে যদি নেগেলি সক্ষম হতেন তাহলে তাঁদের উভয়ের জীবনই হয়ত বদলে যেত। তখন মেণ্ডেলের মৃত্যু হত না লোকচক্ষুর অন্তরালে আর একটি নতুন বিজ্ঞানের জন্ম ৩৪ বছর বিলম্বিত করার অভিযোগে নিন্দিত হতেন না নেগেলিও।

যদিও প্রাচীন ও আধুনিক বংশাণুবিদ্যার উভয় ধারা থেকেই তথ্যাদি এখানে উল্লিখিত, তবু স্মর্তব্য যে আমার গ্রন্থটি বংশাণুবিদ্যা সম্পর্কে নয়, এর লক্ষ্য বিজ্ঞানী, তাঁদের আবিষ্কারের নিয়তি, তাঁদের প্রত্যয়ের বিবর্তন ও সঞ্চার এবং আমরা যেখানে বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করি সেই প্রতিবেশ।

কিন্তু শুরুতেই দুটি বিষয়ে পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আমি সঙ্গত মনে করি। প্রথমত, গ্রন্থটি একটি রূপরেখা মাত্র। বংশাণুবিদ্যার সম্পূর্ণ বিবরণ অথবা এমন কি এর উল্লেখ্যতম বিষয়গুলি সম্পর্কেও কিছু বলা এধরনের গ্রন্থে একান্তই অসম্ভব... এর অজস্র তথ্যসম্ভার থেকে কেবলমাত্র একান্ত অপরিহার্য অথবা সর্বাধিক আকর্ষণীয় দৃষ্টান্ত চয়নেই আমার চেষ্টা সীমিত। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত রুচি, বিষয়ান্তরে অধিকতর দখল এবং বিজ্ঞানীদের দলবিশেষের সঙ্গে অধিকতর পরিচয় দ্বারাও আমার পক্ষে প্রভাবিত হওয়া সম্ভব।

মরণোত্তর খ্যাতি

সেই মহারহস্য

কৃপণ মালিক মেষপালকের সঙ্গে অনেকক্ষণ থেকেই দরকষাকষি করছিলেন। শেষ অবধি রফা হল পালের ফুটকিপড়া আর তিলপড়া ভেড়ার বাচ্চাগুলো পাবে পালক, আর কালোগুলো থাকবে মালিকের। কিন্তু ধূর্ত মালিক পালের সবক'টি কালো মেষ ফেলে রেখে অন্যগুলোকে আলাদা করে দু-তিন দিনের পথ দূরে সরিয়ে নিয়ে গেল। তবে দেখা গেল মেষপালকই বেশী চালাক। সে তাল গাছের ডালপালা আর চেস্টনাট ফেলে রাখল যেখানে মেষরা জল খেত। কৃপণ মালিক অবাক হয়ে দেখল কালো মেষগুলোর বাচ্চা হয়েছে ডোরাকাটা, তিলপড়া ও ফুটকিপড়া। মেষপালকের ধনদৌলত হল।

জীবন্ত প্রাণীর জন্ম এবং দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের বংশানুসৃতি ও অবংশানুসৃতি সম্পর্কিত বহু কাহিনী ও সংস্কার অতীতে ছিল এখনো আছে। প্রাচীন গ্রীকরা আসন্নপ্রসবা স্ত্রীর বিছানার পাশে অ্যাপলোর মূর্তি রাখত। ঐ দেবতার মতো সুদর্শন সন্তানলাভের আশা থেকেই ব্যবস্থাটির

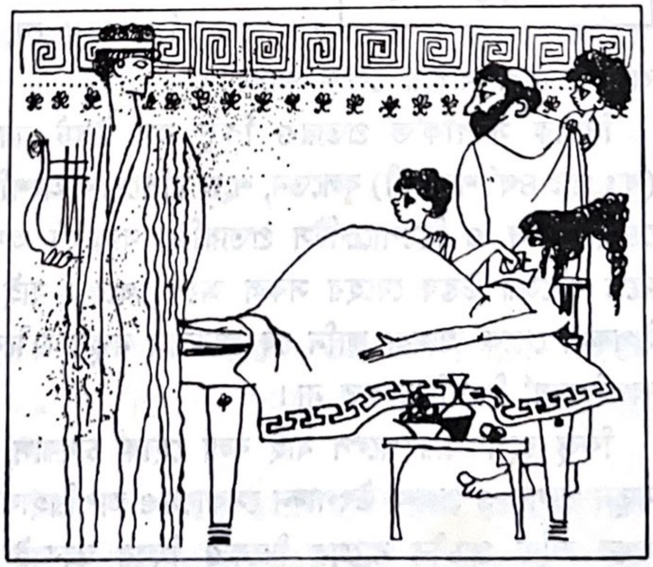

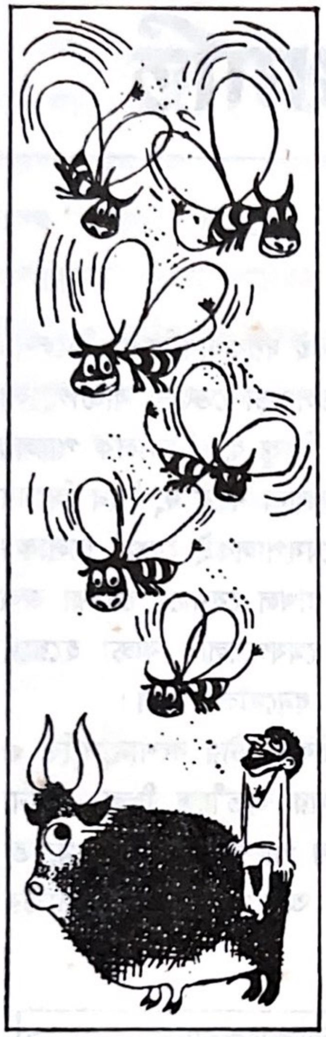

উদ্ভব। এমন কি আজও বহু লোকের বিশ্বাস সন্তানসম্ভবা নারীর পক্ষে অগ্নিকাণ্ডের দিকে তাকানো উচিত নয়, এতে লালচুল শিশু জন্মাতে পারে!

পৃথিবীতে নতুন প্রাণের জন্ম এবং কিছুকাল পরই পিতা-মাতার সদৃশ চেহারালাভ কি সত্যি বিস্ময়কর নয়? শিশু ছেলে না মেয়ে হবে এবং সে কার মতো হবে এ কি কম রহস্যময়? যতদিন পর্যন্ত বিজ্ঞান নতুন প্রাণের জন্ম এবং বংশানুসৃতিলগ্ন প্রশ্নাবলীর উত্তর দিতে পারে নি, স্বাভাবিকভাবেই ততদিন স্থানটি পূরণ করেছে অজস্র আজগবি কল্পনা।

বিখ্যাত রোমান পণ্ডিত ও লেখক মার্কাস টেরেনটিয়াস ভারো (খৃঃ পূঃ ১১৬-২৭) তাঁর কৃষি সংক্রান্ত গ্রন্থে লিখেছেন: 'মৌমাছিদের একাংশ মৌমাছি থেকে ও অন্য অংশ ষাঁড় থেকে উৎপন্ন। ষাঁড় অবশ্য পচে যাওয়া ষাঁড়। সেজন্য গ্রীক দার্শনিক আর্কেলেয়াস তাঁর ব্যঙ্গ কবিতায় মৌমাছিকে গলিত ষাঁড়ের পক্ষল সন্তানরূপে উল্লেখ করেছেন। তিনি আরো লিখেছেন যে, বোলতা ঘোড়া থেকে আর ভোমরা বাছুর থেকে জন্মে।'

নিষেক সম্পর্কিত প্রত্যয়ও কিন্তু কম উদ্ভট নয়। ক্রটনার আল্‌ক্‌মেয়ন (খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দী) বলতেন, শুক্র মস্তিষ্কের অংশবিশেষ। অ্যানাক্সাগোরাস, ডেমোক্রিটাস ও হিপোক্রেটিস প্রত্যয়টির যাথার্থ্য অস্বীকার করেন। তাঁদের মতে বীজের উদ্ভব দেহের সকল অংশ থেকে। যাই হোক কল্পকাহিনী ও উপকথা থেকে আমরা জানি যে সেকালে নতুন জীবের জন্মের জন্য নিষেক অপরিহার্য বিবেচিত হত না।

কিন্তু রূপকথার গল্পে যাই বলা হোক চাষবাস, পশুপালন এবং এদের নতুন প্রকার ও প্রজন্ম উৎপাদন সেকালেও অপরিহার্য ছিল। এমন কি আমরা যখন অতি প্রাচীন যুগের দিকেও ফিরে তাকাই তখন এক্ষেত্রে কোথাও

কোথায় মানবপ্রয়াসের পরিধি দেখে অবাক হই। খেজুর গাছের উপর ডানা মেলা এক পক্ষল প্রাণীর খোঁদাই করা একটি পাথরের ব্যাস-রিলিফ প্রত্নতত্ত্ববিদরা খুঁজে পেয়েছেন। গাছটির পাশে ছদ্মবেশ ও আনুষ্ঠানিক পোষাক পরিহিত আসিরীয় পুরোহিতরা খেজুর গাছের স্ত্রী-ফুলের কৃত্রিম পরাগায়ণে রত। ব্যাস-রিলিফটি ২,৫০০ বছরেরও বেশী পুরানো। অথচ গত শতাব্দীতেও বিজ্ঞানীরা উদ্ভিদে যৌনতার অস্তিত্ব নিয়ে বিতর্করত ছিলেন। অধিকাংশ কৃষি ফসলেরই চাষ হত কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগেই।

সুতরাং দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরে বংশানুসৃতি এবং সংশ্লিষ্ট প্রতীতব্যাপার সম্পর্কে দুটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি পাশাপাশি ছিল: একদিকে অতি সরল উপকথা ও সংস্কার — কখনো কাব্যিক, কখনো-বা উদ্ভট, অন্যদিকে সহস্র বৎসরের উঞ্ছজীবিতার ফল হিসেবে আকস্মিক আবিষ্কার ও অন্ধ ভুলভ্রান্তির পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে অর্জিত জ্ঞান এবং কিছু নিয়ম যা তথ্যনির্ভর না হলেও কার্যোপযোগী ছিল।

কিন্তু মানবসমাজের বিকাশের ফলে কৃষির উপর সৃষ্ট নতুন চাহিদার মোকাবিলা একমাত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই সম্ভবপর ছিল। তাই মেণ্ডেলের গবেষণা কৃষক ও পশুপ্রজনকের বাস্তব প্রয়োজনের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল না। অন্যপক্ষে মেণ্ডেলবাদ ব্যতিরেকে বংশানুসৃতির ক্রমোসোম তত্ত্ব অথবা আণবিক বংশাণুবিদ্যার উদ্ভব যেমন অসম্ভব ছিল, তেমনি পূর্বতন কিছুসংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা ছাড়া মেণ্ডেলের পক্ষেও তাঁর আবিষ্কার সম্ভবপর ছিল না। যদিও মনে হয় বংশানুসৃতির নিয়মাবলী আবিষ্কারের সঙ্গে এদের কোন প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই, তবু বলা বাহুল্য এতেই নিষ্পাদিত হয়েছিল এর অপরিহার্য পূর্বশর্তাবলী।

স্থলী ও কোষ

অণুবীক্ষণ বহু রহস্য উদ্ঘাটিত করেছে। এই রহস্যাবলীর অন্যতম জীবদেহের কোষসংস্থা যার পূর্বাহ্ন আবিষ্কার বংশানুসৃতির নিয়মাবলী ব্যাখ্যার পক্ষে একান্ত অপরিহার্য ছিল।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রের স্রষ্টা ব্রিটিশ পদার্থবিদ রবার্ট হুকই প্রথম কোষনিরীক্ষক (সেই ১৬৬৭ সালে)। হুক একটি অণুবীক্ষণ তৈরি করে হরেক রকম জিনিস

পরীক্ষা করতে শুরু করলেন। একদিন মদের বোতলের একটি পুরানো কর্কের ছিপি তাঁর হাতে এল এবং তিনি তা-ই অণুবীক্ষণের নীচে রাখলেন। আশ্চর্য... নরম ও মসৃণ হলেও দেখা গেল মৌচাকের মতো অজস্র ছোট ছোট গর্তে কর্কটি বোঝাই। হুক এদের নাম দিলেন 'কোষ'। তিনি অন্য উদ্ভিদজাতীয় পদার্থ, গাজর ও সালগমের টুকরোয়ও এই একই জিনিস দেখতে পেলেন। কিন্তু তা থেকে বিরাট কিছু আবিষ্কৃত হল না। তরুণ বিজ্ঞানী কেবল কোষের মাপজোক নিয়েই থেমে গেলেন এবং বিস্মিত হয়ে লিখলেন: 'এগুলো এতই ছোট যে, এপিকিউরিয়াস কল্পিত পরমাণুর পক্ষেও এদের ভেতর দিয়ে গলিয়ে যাওয়া অসম্ভব।'

এক্ষেত্রে বিপুল সাধারণীকরণের জন্য প্রয়োজন ছিল আরো প্রায় ২০০ বৎসর। বহু বিজ্ঞানী কখনো কখনো অণুবীক্ষণে তাকিয়ে কোষাকীর্ণ অথবা স্থলীপুঞ্জিত কাঠামো পর্যবেক্ষণ করেছেন। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তাঁদের অণুবীক্ষণ ও কৃৎকৌশল ছিল অত্যন্ত ত্রুটিদুষ্ট। সকল জীবের ক্ষেত্রেই যে কোষকাঠামো সাধারণ নিয়ম ১৮৩০-এর দশকের শেষ পর্যায়ের আগে এ সম্পর্কে সন্দেহনিরসন ঘটে নি। কয়েক জন বিজ্ঞানীই যে পরস্পর থেকে স্বতন্ত্রভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন তা আপতিক নয়।

কোষতত্ত্বের কৃতিত্ব সাধারণত জার্মান অধ্যাপকদ্বয় — উদ্ভিদবিজ্ঞানী ম্যাথিয়াস যেকব শ্লাইডেন এবং প্রাণীবিজ্ঞানী ফ্রেডারিক থিওডোর শ্‌ভানের উপরই ন্যস্ত হয়। কিন্তু একই সময়ে জনৈক চেক ইয়ান পুর্কিনে এবং এর কিছু আগে রুশ অধ্যাপক পাভেন গরিয়ানিনভও একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। পাভেল গরিয়ানিনভ ছিলেন সেণ্ট-পিটার্সবুর্গ মেডিকো-সার্জারী আকাদমির অধ্যাপক। ১৮৩৭ সালে তিনি লিখেছিলেন: 'যাকিছু জৈবিক তাদের সকলেরই মূল আণুবীক্ষণিক স্থলীতে নিহিত। স্থলীর মিলন থেকেই কোষকলার উৎপত্তি যা শ্লথ, গোলাকার স্থলীকীর্ণ অথবা ঠাসা কিংবা অংশুময়, দীর্ঘস্থলী বা কোষকীর্ণ। কোষকলার প্রধান স্থলীসমূহ বহুবার পরিবর্তিত হয় ও সর্বপ্রকার জৈবিক কলা উৎপাদন করে। উদ্ভিদকোষ স্থলীর গাণিতিক সমতায় সুচিহ্নিত কিন্তু স্বল্পপ্রকার..., পক্ষান্তরে প্রাণীকোষ এতো সুসম নয় কিন্তু তা বহুবিধ।'

সেকালে খোদ কোষ সম্পর্কে জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত ছিল। কোষতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতাদের কেউই এমন কি ক্রমোসোমের অস্তিত্ব সম্পর্কেও বিন্দুমাত্র অবহিত ছিলেন না। ক্রমোসোম, কোষ ও নিউক্লিয়াস বিভাগের নিয়মাবলী,

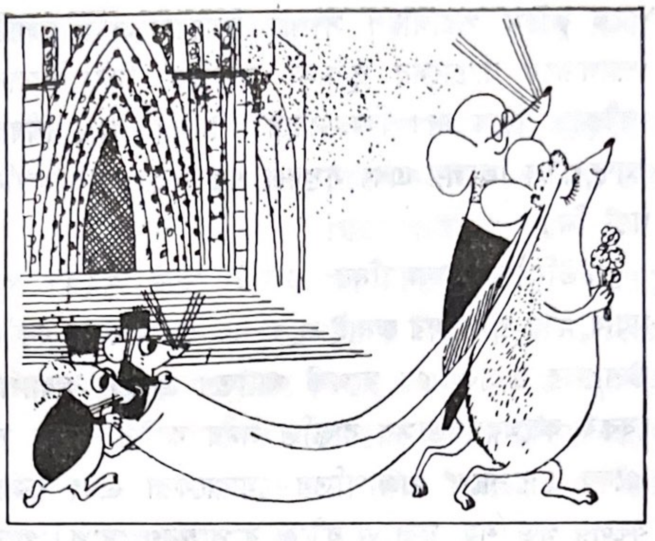

নিষেককালীন কোষান্তর্গত প্রক্রিয়া — এসবই আবিষ্কৃত ও পর্যালোচিত হয়েছে মেণ্ডেলকৃত আবিষ্কারের পরবর্তীকালে। আর কোষের অতি সূক্ষ্ম দেহবস্তু, ক্রমোসোমের অভ্যন্তরীণ গঠন ও অন্যান্য অণুপ্রত্যঙ্গ নিয়ে আমাদের কালে গবেষণা করা হচ্ছে।

কোষকাঠামো সম্পর্কে গরিয়ানিনভ, পুর্কিনে, শ্লাইডেন, শ্ভান কেবলমাত্র জানতেন: কোষ একক নিউক্লিয়াসযুক্ত, ঝিলিবেষ্টিত আঁটাল পদার্থের (যাকে তাঁরা প্রটোপ্লাজ্ম বা প্রাণপঙ্ক বলেছেন) একটি স্থলীবিশেষ। শুধু একটি বিষয়ে সকলেই নিশ্চিত ছিলেন যে, সকল জীবন্ত সত্তাই কোষপূর্ণ। মেণ্ডেলের কালে এ বিজ্ঞান ছিল সে পর্যায়েই।

উদ্ভিদ সংকরণ মেণ্ডেলের মূল গবেষণারূপে চিহ্নিত। মাত্র এক শতাব্দী আগেও উদ্ভিদ সংকরণই ছিল এক অর্থে 'বিজ্ঞানের শেষ কথা'। আমরা এমন বিস্ময়কর কালে বসবাস করছি যখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিকাশ মানব ইতিহাসে দৃষ্টান্তহীন এক গতিবেগ অর্জন করেছে। সুতরাং যখন বিজ্ঞানের ইতিহাসের দিকে ফিরে দেখি আজ যে সমস্যা আমাদের কাছে এতো সাধারণ অথচ একদা এদের সমাধানেই কেটেছে কত দীর্ঘ বছর, তখন বিস্ময়াপন্ন না হয়ে পারি না।

এই হল অবস্থা। উদ্ভিদে যৌনতার অস্তিত্ব ও সংকরণের সম্ভাবনা এর একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত। উদ্ভিদের কি যৌনাঙ্গ আছে? তিন শো বছর আগেও বিজ্ঞানে এর সুস্পষ্ট উত্তর ছিল না, যদিও আসিরীয় পুরোহিতরা খেজুর

গাছে কৃত্রিম পরাগায়ণ সম্পন্ন করতেন এবং জ্যেষ্ঠ প্লিনি (২৩-৭৯ খৃঃ) পরাগায়ণে বাতাসের ভূমিকা সম্পর্কে লিখেছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞানে এর স্বীকৃতি ছিল না। বিজ্ঞানীরা অতিদীর্ঘকাল বিষয়টি সম্পর্কে নানা মতে আস্থাশীল ছিলেন এবং সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ অবধিও এর কোন পরিবর্তন ঘটে নি।

টিউবিঙ্গেন জার্মানির একটি ছোট শহর। অজস্র পর্যটক আকর্ষক মধ্যযুগীয় প্রাসাদের জন্যই শুধু নয়, ইউরোপের একটি প্রাচীনতম বোটানিকাল উদ্যানের জন্যও এর যথেষ্ট খ্যাতি। এখানে অধ্যাপকপুত্র তরুণ রুডোল্‌ফ যেকব কামেরারিউসের বাড়তি সময় কাটত অদ্ভুত সব উদ্ভিদ পরীক্ষা করে, এদের চারপাশে প্রজাপতির ঘোরাফেরা এবং ক্রমান্বয়ে ফুলকুঁড়ির ফুলে, ফুলের গর্ভাশয়, ফল ও বীজে রূপান্তরণ দেখে। পরে তিনি উদ্যানের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং ১৬৯৪ সালে 'উদ্ভিদের যৌনতা সম্পর্কে পত্র' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। গ্রন্থটিতে অন্যান্য বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার সহ তাঁর নিজের নিরীক্ষাসমূহও পর্যালোচিত হয়েছিল। তিনি ফুলের গঠন, এর পুং ও স্ত্রী অঙ্গ এবং উভলিঙ্গতা ও একলিঙ্গতা প্রতীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। কিন্তু তন্মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখ্য ছিল বীজোৎপাদনে পরাগরেণুর গুরুত্বের প্রশস্ত বিবরণী। পরাগায়ণ ব্যতিরেকে যে বীজোৎপাদন অসম্ভব, কামেরারিউস তা অকুণ্ঠভাবে ব্যক্ত করেন।

যদিও গ্রন্থটি ছিল উদ্ভিদ সম্পর্কে, তবু কামেরারিউস প্রাণীদের যৌনসমস্যাও উপেক্ষা করেন নি। উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের মধ্যে তুলনাক্রমে তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, উভয় ক্ষেত্রেই স্ত্রী ও পুং যৌনজাত পদার্থের মিশ্রণ ব্যতীত ভ্রূণোৎপাদন অসম্ভব। অবশ্য পরাগরেণু ও শুক্রের সঠিক ভূমিকা সম্পর্কে তার বক্তব্যে অস্পষ্টতা ছিল। সেজন্য প্রয়োজন ছিল আরো দুই শতাব্দী প্রতীক্ষার।

কামেরারিউস আরো একটি প্রশ্নের উত্তর দেন নি: একটি উদ্ভিদ প্রজাতি কি অন্য প্রজাতির রেণুতে নিষিক্ত হতে পারে? কিন্তু তিনি যে প্রশ্নটি উত্থাপন করেছিলেন এবং প্রক্রিয়াটি সফল হলে ফলাফল কী হবে তা চিন্তা করেছিলেন, এ-ই যথেষ্ট। এর উত্তর সহজসাধ্য নয় এবং বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক কারণসঞ্জাতও নয়। বস্তুত এমন পরাগায়ণ সম্ভবপর হলে সন্ততিরা হত পিতৃ-মাতৃ উভয় পক্ষ থেকেই আলাদা নতুন কিছু। কিন্তু সেকালের সাধারণ বিশ্বাস ছিল যে, পৃথিবীর সকল প্রজাতি শুরু থেকেই ঈশ্বরসৃষ্ট।

আকাদমি আয়োজিত একটি প্রতিযোগিতা

গুরুত্বপূর্ণ, অথচ দীর্ঘ অমীমাংসিত বৈজ্ঞানিক সমস্যাসমূহ আলোচনার জন্য বিজ্ঞান আকাদমি কিংবা অন্য সংস্থাগুলি তাদের সীমিত তহবিল থেকে একদা পুরস্কারের জন্য অর্থবরাদ্দ ও প্রতিযোগিতা আহ্বান করত।

উদ্ভিদ সঙ্করণের সমস্যা সম্পর্কে বেশ কয়েকটি প্রতিযোগিতা আহূত হয়েছিল। সেই ১৭৫৯ সালে, সেণ্ট-পিটার্সবুর্গের ইম্পিরিয়াল বিজ্ঞান আকাদমি উদ্ভিদের যৌনতা সম্পর্কে শ্রেষ্ঠতম নিবন্ধের জন্য একটি পুরস্কার ঘোষণা করে। প্রথম প্রজাতি শ্রেণীবিন্যাসবিদ সুইডেনের প্রখ্যাত উদ্ভিদবিজ্ঞানী ক্যারলাস লিনিয়াস এই পুরস্কারে সম্মানিত হন। তাঁর নিবন্ধের নাম ছিল: 'উদ্ভিদের যৌনতা সম্পর্কে আলোচনা'।

নিবন্ধপাঠে বহু ব্যক্তি বিস্ময়াভিভূত হন। ১৭৫১ সালে প্রকাশিত তাঁর 'উদ্ভিদদর্শন' গ্রন্থের নিম্নোল্লেখিত উদ্ধৃতি তখনো সকলের মনে ছিল: 'বর্তমান বিভিন্ন প্রজাতির সকলেই সেই আদিকালের সৃষ্টি।' তা সত্ত্বেও তাঁর নতুন নিবন্ধে এই প্রখ্যাত সুইডেনবাসী পরপরাগে নতুন প্রজাতি-জন্মের সম্ভাবনা সম্পর্কে দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করলেন। এবং তিনি শুধু মতামত দিয়েই ক্ষান্ত হলেন না, তাঁর নিজের পরীক্ষা থেকে এর সত্যতাও প্রমাণ করলেন। তিনি গোটস্‌বিয়ার্ড (কম্পোসিটি গোত্রের উদ্ভিদ) জাতীয় দুটি প্রজাতির সঙ্করণে সফল হন এবং একটি সঙ্কর প্রজন্ম পান।

লিনিয়াসের পক্ষে এ সিদ্ধান্তে উত্তরণ সহজ হয় নি। তিনি অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন এবং আজীবন তাই থেকেছেন। সুতরাং প্রথমে তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, সকল প্রজাতিই ঈশ্বরসৃষ্ট এবং অতঃপর আর কোন নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটে নি। কিন্তু তিনি প্রকৃতিবিদ তথা শ্রমিষ্ঠ ও চিন্তাশীল। ক্রমশ নিজের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রভাবেই লিনিয়াসের দৃষ্টিভঙ্গিতে শ্লথ পরিবর্তনের সূচনা ঘটে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, টোড্‌ফ্ল্যাক্সের কথা উল্লেখ্য। এ নিয়ে তিনি যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হন। এর হলুদ রঙ ফুলের গড়ন অসমান। কিন্তু কখনো কখনো টোড্‌ফ্ল্যাক্স ফুলের সম্পূর্ণ সুসম পাপড়িরা কেন্দ্র বেষ্টন করে রশ্মির মতো বিকীর্ণ হয়। লিনিয়াস প্রথমবার ঐ ফুল দেখে এর উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন নি। তিনি ঘটনাটিকে আকস্মিক ব্যতিক্রম ভেবেছিলেন। কিন্তু পরে জানলেন যে, এদের সন্ততিবর্গে সুসম ফুলও ফোটে। তাই তিনি

বলতে বাধ্য হলেন যে নতুন প্রজাতির জন্ম সম্ভব। তিনি দীর্ঘদিন এই রহস্যময় বিষয়টির মর্মোদ্ধারে প্রভূত পরিশ্রম করেন। ১৭৪৪ সালে টোড্‌ফ্ল্যাক্সের উপর তিনি এক বিশেষ নিবন্ধও লিখেছিলেন।

অতএব নতুন প্রজাতির উৎপত্তি, বিভিন্ন প্রজাতির সংকরণক্রমে পিতৃপ্রজন্ম থেকে পৃথক সন্ততি উৎপাদনের সম্ভাব্যতা অতঃপর অনস্বীকার্য হয়ে উঠল। কিন্তু আপ্তবিশ্বাসের তাহলে কি হবে? লিনিয়াস তাঁর নিজের বিশ্বাস ত্যাগ করলেন না। তাঁর মনে হল ঈশ্বর সকল প্রজাতিকে একই সঙ্গে সৃষ্টি করেন নি এবং তাঁর সৃজনপ্রক্রিয়া বর্তমানেও অব্যাহত আছে। জীবনের শেষ পর্যায়ে তাঁর ধারণা ব্যক্ত করে এক চিঠিতে জনৈক বন্ধুকে লিখেছিলেন: ‘এরূপ কল্পনা সম্ভবপর যে ঈশ্বর... শুরুতে সরল ও পরে জটিল সত্তা সৃষ্টি করেছিলেন; প্রথমে তিনি গুণানুসারে একটি করে প্রজাতি এবং পরে নতুন প্রজাতি সৃষ্টির জন্য এদের মিশ্রিত করেছিলেন।’

লিনিয়াস অবশ্য বিবর্তনবাদী ছিলেন না। সংকরণের সম্ভাব্যতা তাঁর কাছে দৈব ব্যতিক্রম মাত্র। তাঁর সমসাময়িকদের কেউ কেউ তবু সকল জীবের পারস্পরিক রক্তসম্পর্কের কথা উচ্চারণ করতেন এবং উদ্ভিদ সংকরণ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় রত ছিলেন। কিন্তু লিনিয়াস প্রখ্যাত বিজ্ঞানী, সুপরিচিত ছিল তাঁর রচনাবলী, তাই এঁদের গবেষণা হারিয়ে গেল লোকচক্ষুর অন্তরালে।

১৭৭৮ সালে সেন্ট-পিটার্সবুর্গে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এর নাম ছিল: ‘প্রাণীরূপান্তর সম্পর্কিত দার্শনিক আলোচনা। স্মলেন্‌স্ক সেমিনারির জার্মান ভাষার শিক্ষক ইভান মরোজভ কৃত অনুবাদ।’ এতে গ্রন্থকারের নাম অনুল্লেখিত কিন্তু তাঁর রচনা বিস্ময়কর। প্রজাতির অপরিবর্তনশীলতার প্রত্যয় দৃঢ় যুক্তি সহকারে খণ্ডন করে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, সকল

প্রাণীই এক পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত এবং মানুষও এর ব্যতিক্রম নয়। গ্রন্থটির উৎস ও লেখকের নাম আবিষ্কারের জন্য ঐতিহাসিকেরা বহু চেষ্টা করেন। ফলত আবিষ্কৃত হয় কৌতূহলোদ্দীপক এক ঘটনা।

১৭৬৫ সালে সাম্রাজ্ঞী ২য় ক্যাথারিনের আদেশক্রমে রাশিয়ার প্রথম বিজ্ঞান সমিতির প্রতিষ্ঠা। 'কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ জ্ঞান প্রচারই' এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। একে স্বাধীন অর্থনৈতিক সমিতি বলা হত। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে মৌমাছি পালন সম্পর্কেও সমিতির উৎসাহ ছিল। তাই দুজন তরুণকে স্যাক্সনির অধিবাসী মৌমাছি চাষের বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ অ্যাডাম শিরাকের কাছে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এজন্য নির্বাচিত হন স্মলেন্স্ক সেমিনারির দুই স্নাতক আফানাসি কাভের্জ্‌নেভ ও ইভান বরোদোভ্‌স্কি। তাঁরা দুজনেই যোগ্য ও অনুসন্ধিৎসু ছাত্র। বিদেশে অবস্থানকালে কেবল মৌমাছি চাষই নয় স্বেচ্ছাকৃত উদ্যোগে তাঁরা বিজ্ঞানের অন্যান্য বহু শাখাও অধ্যয়ন করেন। কাভের্জ্‌নেভ বিশেষ প্রতিভাবান হিসেবে চিহ্নিত হন এবং ১৭৭৫ সালে, দেশে ফেরার আগে, 'প্রাণীরূপান্তর প্রসঙ্গে' জার্মান ভাষায় একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। লেখকের নাম উহ্য রেখে এই গ্রন্থই পরে রুশ ভাষায় অনূদিত হয়।

এই প্রতিভাবান বিজ্ঞানীর জন্য দুর্ভাগ্য অপেক্ষিত ছিল। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ত্যাগ করে তিনি স্মলেন্স্কে ফিরে আসতে বাধ্য হন এবং কেরানির পেশায় শেষ অবধি দারিদ্র্য ও অখ্যাতির মধ্যে মৃত্যু বরণ করেন।

সঙ্করণ সম্বন্ধে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলীর লেখক ছিলেন ইয়শেফ গট্‌লিব কোল্‌রয়টার। তাঁর জন্ম জার্মানির জুল্‌ট্‌স শহরে, ১৭৩৩ সালে। তিনি দূরদূরান্তর ভ্রমণ করেন। নিজের শহর জুল্‌ট্‌স, কাল্‌ভ, সেণ্ট-পিটার্সবুর্গ, বার্লিন, লাইপজিগ প্রভৃতি শহরে কাজ করে শেষে তিনি কার্ল্‌সরুয়েতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সেখানে তিনি প্রকৃতিবিজ্ঞানের অধ্যাপক ও পরে সেণ্ট-পিটার্সবুর্গের বিজ্ঞান আকাদমির সদস্য নির্বাচিত হন। তামাকের দুই প্রজাতির আন্তঃসঙ্করণ পরীক্ষায় রাশিয়ায় তিনি প্রথম সাফল্য লাভ করেছিলেন।

আমরা জানি, সঙ্করণের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে তথ্যাদি তখন সহজলভ্য। কিন্তু কোল্‌রয়টারের পরীক্ষার পূর্বে তা ছিল আপতিক নিরীক্ষা কিংবা বিচ্ছিন্ন সঙ্করণ এবং সাধারণ সিদ্ধান্তে উত্তরণের পক্ষে একান্ত অনুপযুক্ত। কোল্‌রয়টার এগুলোর চুলচেরা পর্যালোচনা করেন এবং এমন কি গোটস্‌বিয়ার্ড

সংকরণে স্বয়ং লিনিয়াসের নির্ভুলতা সম্পর্কেও তিনি সন্দিহান ছিলেন। তাঁর পরীক্ষাসমূহের মান আধুনিক যুগের সমপর্যায়ে উন্নীত ছিল এবং তাই তিনি প্রশংসার দাবীদার। তাঁর পরীক্ষা ছিল অতি সতর্কভাবে পরিকল্পিত, ব্যাপক উপদানভিত্তিক এবং কয়েক প্রজন্ম অবধি সন্ততিদের নিরীক্ষাক্রমে সত্যায়িত।

তামাক সংকরণ সম্পর্কে তাঁর প্রথম নিবন্ধ প্রকাশিত হয় ১৭৬১ সালে। অন্যান্য উদ্ভিদের পরীক্ষা সংক্রান্ত কিছুসংখ্যক তথ্যাদিও অতঃপর এর অনুবর্তী হয়।

সংকরণ পরীক্ষায় সাফল্যের জন্যই কেবলমাত্র কোল্‌রয়টার আমাদের কাছে সুপরিচিত নন। তিনি সংকরসাবল্যেরও আবিষ্কারক। প্রথম সংকর প্রজন্মে অধিকতর ফলনশীলতায়ই এ বৈশিষ্ট্য প্রকট। আমাদের কালে অধিক ফলনশীল ভুট্টা ও অন্য কোন কোন ফসলে সংকরসাবল্য সদ্ব্যবহৃত। উদ্ভিদের যৌনতা ও পরাগায়ণে পতঙ্গের ভূমিকা সম্পর্কিত গবেষণায়ও কোল্‌রয়টারের অবদান পর্যাপ্ত।

কোল্‌রয়টারের সাফল্য তাঁর সমকালে সমাদৃত হয় নি। তাছাড়া কোন কোন পালের গোদা উদ্ভিদে যৌনতার অস্তিত্ব তখনও অস্বীকার করে তাঁর পরীক্ষালব্ধ ফলাফল সম্পর্কে আপত্তি অব্যাহত রাখে। পরে এগুলো ডুবে যায় বিস্মৃতির অতলে। তবু এ শতকের আগে অবধি কোল্‌রয়টারের অবদান যথাযথ স্বীকৃতি লাভ করে নি।

তাই সমস্যা অমীমাংসিতই রইল। অতঃপর প্রাশিয়ান বিজ্ঞান আকাদমি সেণ্ট-পিটার্সবুর্গ আকাদমির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করল এবং তা এর ষাট বছর পরে। উদ্ভিদবিজ্ঞানী লিঙ্কের সুপারিশক্রমে ১৮১৯ সালের প্রতিযোগিতার প্রসঙ্গ ছিল: 'উদ্ভিদজগতে কি সংকরপরাগায়ণ ঘটে?' কিন্তু প্রয়াসটি ব্যর্থ হয়। কোন নিবন্ধই আসে নি।

১৮২২ সালে প্রতিযোগিতাটি পুনরাহূত হয়। সাড়া দেন মাত্র একজন: ব্রাউনশ্‌ভিগের ঔষধ প্রস্তুতকারক ও উদ্ভিদবিজ্ঞানী এ. এফ. ভিগ্‌মান। তিনি ১৮২৬ সালে 'উদ্ভিদজগতে সংকর উৎপাদন সম্পর্কে' একটি নিবন্ধ দাখিল করেন। ভিগ্‌মান এক শ্রেণীর অনেকগুলি উদ্ভিদ নিয়েই পরীক্ষা করেছিলেন। পরীক্ষাগুলির পরিসর ছিল সীমিত এবং হস্ত-পরাগায়ণ প্রতিস্থাপিত হয়েছিল পতঙ্গের পরাগায়ণে। উক্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তার ফল হয়েছিল কৌতূহলোদ্দীপক। তাঁর নিবন্ধ প্রতিযোগিতার শর্ত অনুযায়ী যথোপযুক্ত

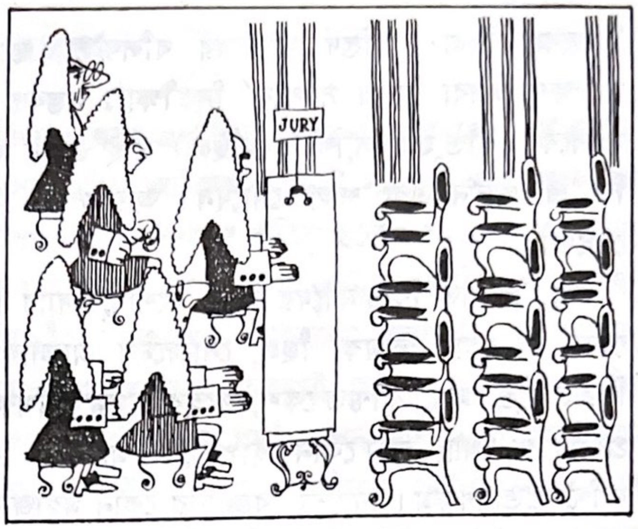

বিবেচিত না হওয়ায় (অথবা হয়ত তার প্রাপ্ত ফলাফল আহ্বায়কদের ইচ্ছানুরূপ হয় নি) ভিগ্‌মান পান প্রতিশ্রুত পুরস্কারের অর্ধাংশ।

হার্লেমে ডাচ বিজ্ঞান আকাদমি কর্তৃক ১৮৩০ সালে একই ধরনের আরো একটি প্রতিযোগিতা ঘোষিত হয়। এবার আলোচ্য বিষয়টি শুদ্ধতরভাবে পরিকল্পিত হয়েছিল: 'কৃত্রিমভাবে এক ফুলের রেণু দ্বারা অন্য ফুলের নিষেকপ্রক্রিয়ায় নতুন প্রজাতি ও প্রকার উৎপাদন সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা থেকে আমরা কী লাভ করি এবং এতদ্বারা কী-কী ফসলী এবং বাহারী উদ্ভিদ জন্মানো ও এদের সংখ্যাবৃদ্ধি সম্ভব?' আবারও শুধু একটিমাত্র নিবন্ধই পাওয়া গেল। এর লেখক কার্ল ফ্রেডারিক ফন গের্ট্‌নার। তাঁর ছোট চিঠি থেকে তাঁর সিদ্ধান্তসমূহের ভিত্তি সঠিক বোঝা গেল না। পরে তিনি তাঁর পরীক্ষার বিস্তৃত রিপোর্ট পেশ করেন। এর অনুপূরক হিসেবে এতে সংযোজিত ছিল তাঁর উৎপন্ন ১৫০টি সংকরের নমুনা। অনধিক ৯,০০০ পরীক্ষাসমৃদ্ধ গবেষণাটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। ১৮৩৭ সালে গের্ট্‌নার পুরস্কৃত হলেন। কিন্তু তাঁর নিবন্ধ ১৮৪৯ সালের পূর্ব পর্যন্ত অপ্রকাশিত রইল। তাঁর মৃত্যু হয় পরের বছরই। সংকরণের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে তাঁর নিবন্ধে সুস্পষ্ট তথ্যাদি নিহিত ছিল এবং তিনি পিতৃ-মাতৃ পক্ষ থেকে সন্ততিতে চারিত্র্যসঞ্চারের কিছুসংখ্যক নিয়মও চিহ্নিত করেছিলেন।

কিন্তু এখানেই প্রতিযোগিতা শেষ হয় নি। ১৮৬১ সালে প্যারিস বিজ্ঞান আকাদমি কর্তৃক একটি নতুন প্রতিযোগিতা ঘোষিত হয়। এবারের

বিষয়বস্তু ছিল: 'উদ্ভিদ সঙ্করের বলিষ্টতা, তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সংরক্ষণ অথবা বিলয় সম্পর্কে নিরীক্ষা'। সম্ভবত তৎকালে এধরনের সমস্যা সম্পর্কে কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছিল। তাই এবার আসে দুটি নিবন্ধ। লেখক ডি. এ. গর্ডন এবং শার্ল নোদেন। আর সঙ্গত কারণেই পুরস্কার পেলেন নোদেন।

বহু প্রখ্যাত বিজ্ঞানীদের মধ্যে, বংশাণুবিদ্যার বিকাশে যাঁদের প্রত্যেকেরই কোন না কোন ভূমিকা ছিল, নোদেনের আলোকচিত্রটি সর্বাধিক আকর্ষী। বিরাট শুভ্র শ্মশ্রু, কুঞ্চিত কেশ, দেহের সুসম ক্লাসিক গড়ন এবং আশ্চর্য চোখ — প্রজ্ঞাদীপ্ত, দয়ার্দ্র, যেন কোন মহাপুরুষের মাহাত্যকীর্ণ। কিন্তু এই বাইবেলোচিত দৃষ্টি প্রতারণক্ষম। নোদেন বিজ্ঞানের কোন মহাজন নন বরং তার বিপরীত। তাঁর দুর্ভাগ্যের পরিধি কল্পনাতীত বিশাল। প্যারিস যাদুঘরে সহকারীর কাজে দুঃসহ কষ্টের মধ্যে তাঁর বহু বছর কেটেছে। বয়স যখন ৬২ শুধু তখনই তিনি প্রথম উদ্ভিদ অভিযোজন কেন্দ্রের অধ্যক্ষের স্বাধীন পদটি লাভ করেন। এবং তার পরই আসে নতুন নতুন দুর্ভাগ্য। তিনি তাঁর সবক'টি সন্তান হারান, নিজে অন্ধ হন এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন চরম নিঃসঙ্গতায়। তাঁর জীবন অনেকাংশে বাইবেলের জনৈক জব-এর উপমা, যিনি ক্রমাগত বহু দুর্ভাগ্যের শিকারে বিপর্যস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু অপরিসীম দুঃখযন্ত্রণায়ও নোদেন জব-এর মতো হতাশ হন নি।

তাঁর প্রত্যয় ছিল আলাদা ধরনের। নোদেন বিজ্ঞান ও মানুষের মানসিক শক্তিতে আস্থাশীল ছিলেন। অজস্র প্রতিবন্ধ সত্ত্বেও অক্লান্ত গবেষণায় অন্য যেকোন বিজ্ঞানীর তুলনায় তিনি মেন্ডেলীয় নিয়মাবলীর সর্বাধিক সমীপবর্তী সিদ্ধান্তে উত্তীর্ণ হন। 'জননকোষের বিশুদ্ধতা', প্রথম সংকর প্রজন্মের সৌসম্য এবং দ্বিতীয়ের চূড়ান্ত বৈচিত্র্যময় চারিত্র্য সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি ব্যর্থ হন নি। তাঁর অবস্থা বড় ধরনের পরীক্ষার প্রতিকূল ছিল। আর সবক'টি পরীক্ষার ক্ষেত্রেও তাঁর মন্দভাগ্যেরই পুনরাবৃতি ঘটেছিল। তাঁর চারাগুলো তুষার অথবা পোকার আক্রমণে বিনষ্ট হয়। সর্বোপরি মেন্ডেলের সকল পূর্বসূরীর মতো তিনিও অন্তঃপ্রাজাকি সংকরণ পরিহারক্রমে আন্তঃপ্রাজাতিক সংকরণের চেষ্টায় একই ভ্রান্তির পুনরাবৃত্তি করেন।

বিজ্ঞান আকাদমি ও বিজ্ঞান

আজ বিজ্ঞানের উচ্চাধিষ্ঠান থেকে এক কিংবা দুই শতক আগের কর্মকাণ্ডের দিকে তাকিয়ে অনেক অসম্পূর্ণতা আবিষ্কার খুবই সহজ। অতি সরলীকৃত এসব নিবন্ধাদি পাঠে অতঃপর হাস্য সম্বরণ কঠিন হলেও স্মর্তব্য যে, তাদের গুরুত্বও কিছুমাত্র কম নয়। কামেরারিউস ও কোল্‌রয়টারের 'ত্রুটিপূর্ণ' গবেষণা আজকের বিজ্ঞান সাময়িকীতে প্রকাশিত বিজ্ঞানের শেষতম আবিষ্কারের ভিত্তিতে লিখিত যেকোন নিবন্ধের চেয়ে অবশ্যই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

অতীত বিজ্ঞানীদের কার্যাবলী প্রথম পাঠে এখন যত সরলীকৃতই মনে হোক বৈজ্ঞানিক প্রত্যয়সমূহের ইতিহাসের ঘনিষ্ঠতর পর্যালোচনায় কিন্তু তার সমর্থন মেলে না। মূলকথা, বহু খণ্ড রচনা, সাময়িকীর স্তূপ এবং আকাদমির বিবরণী থেকে অনেক সময় বিজ্ঞানের সঠিক গতি নিরীক্ষণ কঠিন হয়ে পড়ে। অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তব সত্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের সরকারী ইতিহাসের সন্নিপাত ঘটে না।

বিজ্ঞান আকাদমি ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ সুপ্রাচীন প্রতিষ্ঠান। সেখানে পণ্ডিতজন ও অতি সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত থাকেন কিংবা সুললিত কণ্ঠে বক্তৃতা দান করেন। তাঁরা সহকর্মীদের কাছে সুপরিচিত এবং মুখ্যত এঁদের কার্যাবলীই ঐতিহাসিকদের আলোচ্য বিষয়। বিজ্ঞান এঁদের পেশা। অবশ্য প্রখ্যাত সকল আবিষ্কারের মূলে এঁরাই থাকেন এবং অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু এ নিয়মেরও বহু ব্যতিক্রম আছে। অনেক সময় বিশেষভাবে অতীতে বৃহত্তম সকল আবিষ্কার অ-পেশাদারদেরই কীর্তি (গ্রেগর মেণ্ডেল, যাঁকে নিয়ে কাহিনীর শুরু, প্রসঙ্গত তাঁর কথা স্মর্তব্য)। এমন ঘটনাও ঘটেছে এবং দুর্ভাগ্যবশত যার সংখ্যা খুব কম নয়, যে ক্ষেত্রে 'বিজ্ঞানের কর্ণধারগণ' তাঁদের কার্যকলাপ দ্বারা বিজ্ঞানের স্বাভাবিক বিকাশকে প্রতিহত করেছেন। উল্লেখ্য, এই শতাব্দীর শুরু অবধি বংশাণুবিদ্যার পূর্বতন ইতিহাস এ কাহিনীরই একটি সলেখ চিত্রাঙ্কন।

১৯০০ সাল অবধি সরকারী আকাদমির বিজ্ঞানে মেণ্ডেলের নাম চিহ্নিত হয় নি। ১৮৬০-এর মেণ্ডেলহীন দশক এখন আমাদের কাছে কল্পনাতীত।

বিগত শতাব্দীর প্রথম অর্ধাংশেও সরকারী বিজ্ঞানে উদ্ভিদের যৌনতার অস্তিত্ব অস্বীকৃত ছিল। শেল্‌ভার ও হেন্‌শেলের মতো সুধী জার্মান অধ্যাপকেরাও কোল্‌রয়টারের নিরীক্ষাকে তথ্য-সমর্থিত নয় বলে প্রত্যাখ্যান

করেছিলেন। তাঁদের যুক্তি অনুসারে সংকরণ নীতিগতভাবে একটি অসম্ভব প্রক্রিয়া! এই শতাব্দীর শেষ অবধি সুধী অধ্যাপকবৃন্দের প্রকৃতিদর্শন সম্পর্কিত কয়েকটি তত্ত্ব ছিল। পাঠকক্ষের নির্জনতালালিত এসব তত্ত্বাবলী ছিল সম্পূর্ণ কল্পিত এবং অবিশ্বাস্য রকম বিভ্রান্তিকর। 'ইডিয়োপ্লাজ্ম', 'মাইসেল', 'জেমিউল', 'বায়োফোর', 'ইড্', 'আইডেণ্ট', 'ডিটার্মিন্যাণ্ট' এবং অন্যান্য সমধর্মী বিমূর্ত বস্তুসম্ভারে গঠিত ঐ তত্ত্বাবলী ছিল জটিলতায় ভারাক্রান্ত। এদের স্ব স্ব স্রষ্টাগণ এবং এসব তত্ত্বের কোনটিই দীর্ঘস্থায়ী হয় নি।

পাঠকক্ষ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি থেকে বহুদূরে, নিজস্ব অপ্রতিহত নিয়মে **বিজ্ঞান** তখন বিকাশমান। মেণ্ডেলবাদের জন্মপ্রসঙ্গ অবতারণার আগে এর পূর্ববর্তী কয়েকটি পর্যায়ক্রমিক ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজন।

এ সম্পর্কিত বিক্ষিপ্ত তথ্যাদি সংগ্রহের ইতিহাস স্মরণাতীত কাল অবধি প্রসারিত হলেও ইতিপূর্বে বিস্তৃতভাবে উল্লিখিত কোল্রয়টারের গবেষণা থেকেই মূলত এই প্রত্যয়ের ধারাবাহিক বিকাশ ও তথ্যসংগ্রহের প্রারম্ভ নির্দেশ সম্ভব। তিনিই শেষ অবধি উদ্ভিদে যৌনতার অস্তিত্ব, নিষেক ও তাদের সংকরণের সম্ভাব্যতা প্রমাণ করেন। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক কার্যাদি এবং ব্যবহারিক নির্বাচনে অনুসৃত সংকরণপদ্ধতিও তাঁরই আবিষ্কার।

আকাদমির বিজ্ঞান কোল্রয়টারের সিদ্ধান্তকে স্বীকৃতি দান করে নি। সেজন্য অবশ্য এদের স্বীকৃতি প্রতিহত হয় নি। নার্সারির মালিক এবং উদ্ভিদ প্রজনকরা দ্রুত এর তাৎপর্য অনুধাবনক্রমে নিজেদের ক্ষেত্রে তাঁর পদ্ধতি প্রয়োগ করেন এবং কিছুসংখ্যক ফলিত উদ্যানী তা থেকে বিস্ময়কর ফল লাভ করেন। প্রসঙ্গত টমাস এণ্ড্রু নাইটের নাম সবিশেষ উল্লেখ্য। অষ্টাদশ শতকের শেষ ও ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভকালীন এ ইংরেজ উদ্যানী ও নির্বাচনবিদ দীর্ঘকাল ব্রিটিশ হর্টিকালচ্যারেল সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। সতর্ক পর্যবেক্ষক ও শ্রমিষ্ঠ গবেষক নাইট ফলিত সাফল্য ব্যতিরেকেও এ সিদ্ধান্তে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন যে, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারিত্র্যে 'পৃথকীভূত' হয় এবং শেষে এরা আর বিভক্ত হতে পারে না। আকাদমির বিজ্ঞানের বাহিরে, ১৫০ বছর আগে বংশানুসৃতির কণিকাতত্ত্বের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি এ আবিষ্কারেই নির্ভুলভাবে স্থাপিত হয়েছিল।

নাইটের মৌলিক আবিষ্কারটির তাৎপর্যনির্ণয়ে আকাদমির বিজ্ঞান ব্যর্থ হলেও প্যারিসের কৃষি সমিতির অন্যতম সদস্য, কৃষিবিজ্ঞানী ও নিসর্গী

সাজ্‌রের দৃষ্টি এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। ১৮২৫-৩৫ সাল অর্থাৎ যে সময় উদ্ভিদের যৌনতার অস্তিত্ব নিয়ে আকাদমি পর্যায়ে বাদানুবাদ অব্যাহত তখন তিনি নানা সব্জী, বিশেষভাবে কুমড়োগোত্রীয় উদ্ভিদ সংকরণের বিস্ময়কর পরীক্ষায় নিবিষ্ট ছিলেন। এসব পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেন যে, কোন কোন পৈত্রিক চারিত্র্য প্রথম প্রজন্মে অদৃশ্য হয়ে দ্বিতীয় প্রজন্মে প্রকটিত হয় অর্থাৎ তিনি প্রকটন ও পৃথকীভবনের প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছিলেন। সাজ্‌রে ছিলেন নাইট ও কোল্‌রয়টারের গবেষণার সঙ্গে সুপরিচিত। অধ্যাপকদের আক্রমণের বিরুদ্ধে তিনি কোল্‌রয়টারের তথ্যাদি সমর্থনও করেছিলেন।

বংশানুসৃতির নিয়মাবলী আবিষ্কারের সর্বাধিক সমীপবর্তী ছিলেন নোদেন। তিনিও তাঁর পূর্বসূরীদের পন্থানুসারী এবং তাঁদের গবেষণার সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। অন্যথা তাঁর পক্ষে সাফল্যলাভ সম্ভব হত না।

অবশ্য মেণ্ডেলও একেবারে শূন্য থেকে সবকিছু আবিষ্কার করেন নি। আকাদমি মহলের সঙ্গে সম্পর্কিত না থেকে তিনিও উপরোক্ত সকল বিজ্ঞানীর কার্যাদি সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন এবং তাদের পর্যাপ্ত উন্নতি সাধন করেন।

আজকের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে আমরা ঐ বিজ্ঞানীদের যেরূপ মূল্যায়নই করি না কেন, বিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁরা চিরস্মরণীয়। জীবদ্দশায় খ্যাতিবঞ্চিত এসব বিড়ম্বিত প্রতিভা এখন ক্রমেই অধিকতর স্বীকৃতি লাভ করছেন।

যোহান হলেন গ্রেগর

কৃষকের সন্তান যোহান মেণ্ডেলের জন্ম ১৮২২ সালে, হাইন্সেনডর্ফ গ্রামে (এখনকার চেকোস্লোভাকিয়ার হিঞ্চিৎসে গ্রাম)। স্বপ্ন ছিল শিক্ষক আর বিজ্ঞানী হবেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণ ত্যাগ করে তিনি বাধ্য হয়ে শেষে অগাস্টিয়ান গির্জায় শিক্ষানবিশ হিসেবে প্রবেশাধিকার পেলেন। ১৮৪৩ সালের শরতে গির্জা সন্ন্যাসী হিসেবে তাঁর ভর্তি মঞ্জুর করল, নতুন নাম হল গ্রেগরিয়াস বা গ্রেগর।

সেসময় ব্রিউনে অগাস্টিয়ান গির্জার অধ্যক্ষ বিশপ সিরিল নাপ মোরাভিয়ার সাংস্কৃতিক জীবনে অন্যতম নায়ক। বহু প্রগতিশীল ব্যক্তি তাঁর বন্ধু ছিলেন এবং তাঁরা প্রায়ই গির্জায় আতিথ্য গ্রহণ করতেন। ব্রাদারদের মধ্যে দার্শনিক

ম্যাথিউস ক্লাসেল ও তমাস ব্রাত্রানেকের মতো আকর্ষণীয় সুধীদের সঙ্গে মেণ্ডেলের সংযোগ ঘটল। উল্লিখিত ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে প্রথম জন পরে আমেরিকাবাসী এবং দ্বিতীয় ক্রাকোভের ইয়াগেলো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। মঠের অন্যতম পাদরী ছিলেন পাউল ক্রিঝ্কোভ্স্কি। তিনি গির্জা সঙ্গীতের রচয়িতা ও সংস্কারক এবং প্রখ্যাত চেক সঙ্গীতজ্ঞ ইয়ানাচেকের শিক্ষাগুরু।

নাপ ছিলেন মুক্তবুদ্ধির সমর্থক। ব্রাদারদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন প্রকৃতিবিজ্ঞান, গণিত, পদার্থবিদ্যা, খনিজতত্ত্ব ও উদ্ভিদবিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ। ধর্মীয় কার্যাদি ব্যতিরেকেও মঠে শিক্ষকতা, বোটানিকাল উদ্যান স্থাপন, খনিজের সংগ্রহ ও হার্বেরিয়াম নির্মাণ তাঁদের অতিরিক্ত দায়িত্ব ছিল। ব্রাদার পদে নব্যবৃত গ্রেগরিয়াস মঠস্কুলে ধর্মতত্ত্ব ও প্রাচীন প্রাচ্যভাষা শিক্ষা করতেন। তাছাড়াও তিনি ব্রিউনের দর্শন ইনস্টিটিউটে প্রকৃতিবিজ্ঞানের বক্তৃতা শুনতে যেতেন। মঠের খনিজ ও উদ্ভিদের সংগ্রহ দেখাশোনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল এবং তা নিয়েই তিনি অবসর কাটাতেন।

১৮৪৭ সালে মেণ্ডেল পাদরী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ও যাজক পদে বৃত হন। সেণ্ট অ্যান হাসপাতালে রুগ্ণ ও মুমূর্ষুদের স্বীকারোক্তি শোনাও ছিল তাঁর দায়িত্ব। মানুষের যন্ত্রণা দেখে অতি সংবেদনশীল মেণ্ডেল মনে গভীর আঘাত পেলেন, তাঁর স্নায়বিক বৈকল্য ঘটল। অতঃপর স্বীকারোক্তি আদায়ের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়ে তিনি উচ্চ স্কুলে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হলেন। বলা বাহুল্য তিনি তা গ্রহণ করলেন। তিনি অঙ্ক কষাতেন, ভাষা শেখাতেন। অল্প দিনের মধ্যেই শিক্ষক হিসেবে মেণ্ডেল জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন।

কিন্তু স্থায়ী শিক্ষকতার নিয়মানুগ যোগ্যতা তাঁর ছিল না। অতঃপর শিক্ষকের ডিপ্লোমার জন্য ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকৃতিবিজ্ঞান ও পদার্থবিদ্যায় বহিরাগত হিসেবে তাঁকে পরীক্ষা দানের অনুমতি দেয়া হল। মেণ্ডেল সেজন্য প্রয়োজনীয় নিবন্ধাদি পেশ করলেন। কিন্তু পরীক্ষায় সফল হলেন না। এর কারণ সম্ভবত তাঁর অন্যতম নিবন্ধে তিনি পৃথিবীর উৎপত্তি সম্পর্কে কাণ্ট ও লাপ্লাসের তত্ত্ব বিস্তৃতভাবে ও আত্যন্তিক সহমর্মীতার সঙ্গে উদ্ধৃত করেছিলেন। বলা বাহুল্য এসব তত্ত্বাবলী স্পষ্টতই বাইবেলে উক্ত বাণীর বিরোধী ও ঈশ্বরাদেশের সঙ্গে সঙ্গতিহীন ছিল। ফেল করা সত্ত্বেও মেণ্ডেল মৌখিক পরীক্ষা দেবার অনুমতি পেলেন। এবারও সেই ব্যর্থতা। ধারাবাহিক শিক্ষার অভাবই হয়ত এর কারণ।

ব্রাদার গ্রেগর মঠ কর্তৃপক্ষের সম্পূর্ণ আনুকূল্যই উপভোগ করতেন। তিনি শিক্ষক হিসেবেই তাঁর কাজে বহাল থাকলেন। ১৮৫১ সালের শরৎকালে তিনি ভিয়েনা এলেন। পকেটে বিশপের অনুমোদনপত্র ও লিখিত একটি অনুরোধ। উদ্দেশ্য শিক্ষা সমাপ্ত করা। সেকালে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকের ভিড়। প্রসঙ্গত ডপ্লারের নামোল্লেখই যথেষ্ট। মেণ্ডেল তাঁর পদার্থবিদ্যার ক্লাসে উপস্থিত থাকতেন। তাঁর নাম এ যুগের স্কুলছাত্রদেরও সুপরিচিত (ডপ্লার ইফেক্ট)। বিশ্ববিদ্যালয়ে চার সিমেস্টার কাটিয়ে মেণ্ডেল মঠে ফিরলেন।

তিনি আবার মঠস্কুলে শিক্ষক নিযুক্ত হলেন। তাঁর পাঠনবিষয় ছিল পদার্থবিদ্যা ও প্রকৃতিপাঠ। তিনি অবশ্য ভিয়েনা থেকে ফিরেই বিভিন্ন প্রকার মটরশুঁটির সংকরণ শুরু না করলে আজ এসব কাহিনী বর্ণনার হয়ত অবকাশই থাকত না। বিলম্ব সত্ত্বেও এজন্যই আজ তিনি বিশ্বখ্যাত।

মেণ্ডেলের গবেষণা যথার্থই বিস্ময়কর। একশো বছর পরেও 'উদ্ভিদ সংকরণ পরীক্ষা' নিবন্ধটি পড়ে তাঁর ধৈর্য, অধ্যবসায়, স্বচ্ছচিন্তা, একাধিক পরস্পরসম্পর্কিত বিষয়ের সমাবন্ধনে নতুন পদ্ধতি প্রবর্তনের চেষ্টা ইত্যাকার বৈশিষ্ট্য দেখে অবাক হতে হয়।

মেণ্ডেল যখন ভিয়েনা থেকে ফিরে এলেন তখন তাঁর লক্ষ্য স্থির, পরীক্ষার পরিকল্পনা সুসম্পন্ন। তাঁর পূর্বসূরীরা বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে সঙ্করণের চেষ্টা করেছিলেন অর্থাৎ বহু বৈশিষ্ট্যে পৃথক দুটি উদ্ভিদের সংশ্লেষই তাঁদের লক্ষ্য ছিল। কিন্তু পৃথক, সুস্পষ্ট ও সীমিত সংখ্যক বৈশিষ্ট্য নিয়ে পরীক্ষাই ছিল মেণ্ডেলের লক্ষ্য। তাঁর প্রাথমিক পরীক্ষাধীন সকল উদ্ভিদই শুধু একটি মাত্র বৈশিষ্ট্য ব্যাতিরেকে সম্পূর্ণ অভিন্ন ছিল। অধিকন্তু বহু প্রজাতি নিয়ে কাজ করার ফলে তাঁর পূর্বসূরীদের চেষ্টা বহুধা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু মেণ্ডেল তাঁর চেষ্টাকে সীমিত পরিসরে সংহত করে পরীক্ষাক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ও সুষম চারিত্র্যের একটি উপকরণ নির্বাচনের জন্য মন স্থির করেছিলেন। যে দশ বছর মটরশুঁটি নিয়ে পরিকল্পিতভাবে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন তা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য।

পরীক্ষার উপকরণ নির্বাচনেও মেণ্ডেলের দীর্ঘ সময় ব্যয়িত হয়েছিল। উপযোগী উপাদান নির্বাচন মোটেই সহজ কাজ নয়। পরীক্ষাধীন উপকরণের কোন কোন গুণ থাকা প্রয়োজন তাঁর নিবন্ধে তিনি তা লিখেছেন। তিনি মটরশুঁটিতেই মন স্থির করেছিলেন। সব দিক থেকেই নির্বাচনটি ছিল আদর্শ।

পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত ৩৪ প্রকার মটরশুঁটির জন্য বহু বীজবিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের কাছে অর্ডার প্রেরিত হয়। কিন্তু মেণ্ডেল তখনই তা নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেন নি। দুই বছর তিনি মটরশুঁটির বিশুদ্ধতা পর্যবেক্ষণ করলেন। শেষে যখন দেখলেন যে এদের সন্ততিরা পিতৃবংশেরই অবিকল প্রতিভূ, শুধু তখনই শুরু হয় আসল পরীক্ষা। পরবর্তীকালে মটরশুঁটি পরীক্ষাকালীন সময়ের দীর্ঘ পরিসরে তিনি সেই প্রাথমিক প্রকারসমূহের বিশুদ্ধতা বার বার পরীক্ষা করেছিলেন। পরীক্ষাধীন উপকরণের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে তাঁর চেতনা সমকালীন গবেষকদের অনেকের পক্ষেই শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত।

ব্রনোর সেই মঠে মেণ্ডেলের বীজতলা বা তাদের নির্দিষ্ট স্থান অদ্যাবধি সযত্নে সংরক্ষিত আছে। মঠপ্রাচীর সংলগ্ন এ জায়গাটি ৩৫ মিটার লম্বা ও ৭ মিটার চওড়া। বাগানের সকল কাজ, যা কোন গবেষণা হিসেবে চিহ্নিত হয় নি তাও একা মেণ্ডেলই করতেন।

এসব পরীক্ষা কঠিন ও শ্রমসাধ্য ছিল। পরপরাগায়ণের অসম্ভাব্যতার জন্যই মটরশুঁটি বিশেষভাবে নির্বাচিত হয়েছিল। 'তরীদলে' বন্দী পরাগকেশর ও গর্ভকেশর এবং কুঁড়ি অবস্থায় পরাগদানীর ধারণ এর ফুলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সুতরাং প্রস্ফুটনের আগেই এর গর্ভমুণ্ড পরাগরেণুতে আচ্ছাদিত হয়। কিন্তু এধরনের ফুল নিয়ে পরীক্ষায় জটিলতাও কম নয়। কখন একটি ফুলের কুঁড়ি নিষেকের জন্য প্রস্তুত হবে সেই মুহূর্তটির জন্য মেণ্ডেল সতর্কতার সঙ্গে অপেক্ষা করতেন। তখনই তিনি সন্না দিয়ে ফুলটি খুলে 'তরীদল' উপড়ে ফেলে রুদ্ধশ্বাসে (পাছে গর্ভমুণ্ড শ্বাসে আন্দোলিত হয়) একের পর এক পরাগকেশর ভেঙ্গে ফেলতেন। অতঃপর এদের গর্ভমুণ্ডে তিনি পরপরাগ ছড়িয়ে দিতেন। প্রতি ফুলেই একই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটত আর ফুলও ছিল শত, সহস্র।

ফসলের প্রথম মৌসুম শেষ। ফসল তোলা, পরীক্ষা গণনাও শেষ হল। দেখা গেল সব পরীক্ষার ফলই অভিন্ন। যেমন মেণ্ডেল গোল বীজ (মসৃণ) মটরশুঁটির সঙ্গে কুঞ্চিত বীজ মটরশুঁটির সংকরণ ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু এর সবকটি বীজই হল মসৃণ। আর মাতৃ বা পিতৃ পুরুষ, যারই মসৃণ বীজ থাক, ফলাফলে আসলে কোন তারতম্যই ঘটল না। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, চারিত্র্য হিসেবে মসৃণতা কুঞ্চনের উপর সম্পূর্ণভাবে প্রকটিত।

কিন্তু মেণ্ডেল কেবলমাত্র বীজ নিয়েই তুষ্ট থাকলেন না। তিনি পরীক্ষা শুরু করলেন এদের সাতটি যুগ্মবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে: বীজপত্রের রঙ (হলুদ বনাম সবুজ), বীজত্বকের রঙ (সাদা বনাম রঙিন), ফলের আকৃতি (সাধারণ চ্যাপ্টা বনাম গ্রন্থিল) ইত্যাদি। এবং সবক'টি ক্ষেত্রেই একই ফল: একটি বৈশিষ্ট্য অন্যটির উপর প্রকট, হলুদ বীজপত্র সবুজ বীজপত্রের উপর, ধূসর-বাদামী বীজত্বক সাদা বীজত্বকের উপর... এই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্ত প্রকাশের আগে বহুবার মেণ্ডেল পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করেন।

বসন্ত এল। মেণ্ডেল সঙ্কর বীজ বপন ছাড়া আর কিছুই করলেন না। ভাবলেন, এবার তারা নিজেরাই পরাগায়িত হোক। তাই বলে তিনি হাত গুটিয়ে বসে থাকলেন না। প্রতিটি ফুল তিনি পরীক্ষা করলেন। মাঝে মাঝে দু-একটি ব্যতিক্রম তাঁর চোখে পড়ল। তিনি দেখলেন গর্ভমুণ্ড তরীদল থেকে বেরিয়ে পড়েছে। বায়ু-পরাগায়ণ এক্ষেত্রে সম্ভবপর মনে হল। তিনি তাই সাবধানে সেগুলো তুলে নিলেন। তাছাড়া পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকেও গাছগুলোকে বাঁচানো দরকার। আর এ তো শুধু ফড়িঙের মুখ থেকে ফসল রক্ষা নয়। মূলকথা হল কোন পোকা ফুল খোঁটতে গিয়ে তার পায়ে রেণু লাগিয়ে এক গাছ থেকে অন্য গাছে যেতে পারে। ফলে পণ্ড হতে পারে সমস্ত কাজটি। সারা গ্রীষ্মই মেণ্ডেল এ নিয়ে ব্যস্ত থাকলেন কিন্তু পরাগায়ণে বিন্দুমাত্রও হস্তক্ষেপ করলেন না। সকলই স্বপরাগায়িত হল।

অবশেষে এল দীর্ঘপ্রতীক্ষিত সেই আগস্ট, ফসল তোলার সময়। এবার ফলাফলের হিসেব-নিকেশ। যা দেখলেন তা বিস্ময়কর। যেখানে প্রথম প্রজন্মের সবক'টি উদ্ভিদই ছিল অভিন্ন আর কেবলমাত্র প্রকট বৈশিষ্ট্যের অধিকারী সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রজন্মে এল বৈচিত্র্য। প্রকট বৈশিষ্ট্যের উদ্ভিদদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও বিপরীত চারিত্র্যের (প্রচ্ছন্ন হিসেবেই পরিচিত) উদ্ভিদদের সংখ্যাও এবার পর্যাপ্ত। তাদের উদ্ভব অবশ্যই আপতিক হিসেবে চিহ্নিতব্য নয়। এবং সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা হল প্রকট ও প্রচ্ছন্ন চারিত্র্যের সুস্পষ্ট আনুপাতিক অভিব্যক্তি।

দৃষ্টান্ত হিসেবে যে বীজের গঠন নিয়ে পরীক্ষা শুরু হয়েছিল তারই ফলাফল উল্লিখিত হল। স্মরণীয় যে, মসৃণ বীজ প্রকট এবং কুঞ্চিত বীজ প্রচ্ছন্ন বিধায় প্রথম প্রজন্মের সকল বীজই মসৃণ। দ্বিতীয় প্রজন্মে ২৫৩টি সঙ্কর উদ্ভিদ থেকে পাওয়া যায় ৭,৩২৪টি বীজ। তন্মধ্যে ৫,৪৭৪টি মসৃণ,

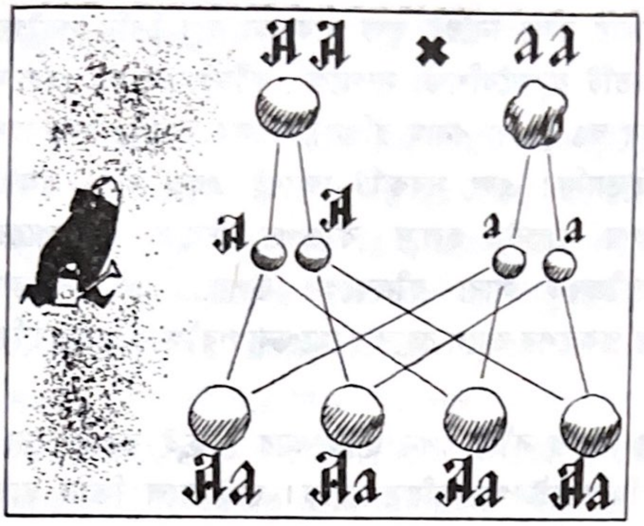

১,৮৫০ কুঞ্চিত। দেখা যাচ্ছে মসৃণ বীজের সংখ্যা কুঞ্চিত বীজের ২·৯৬ গুণ অর্থাৎ প্রায় তিনগুণ।

যে পরীক্ষায় বীজপত্রের রঙ প্রযুক্ত ছিল তার ফলাফল: ৬,০২২ প্রকট হলুদ, ২,০০১ প্রচ্ছন্ন সবুজ এবং গড় ৩·০১:১। সাতটি যুগ্মচারিত্র্যের ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্ত হল একই অবস্থা। দ্বিতীয় প্রজন্মে পৃথকীভবন, তিনটি প্রকট চারিত্র্যের স্থলে একটি প্রচ্ছন্ন চারিত্র্য।

অতএব আবিষ্কৃত হল আরো একটি নিয়ম। পরের বছরের পরীক্ষা থেকেও একই ফল। মেণ্ডেল তাঁর পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করলেন আর মূল পরীক্ষাও অব্যাহত রাখলেন। স্বপরাগায়ণের ফলে তৃতীয় প্রজন্মে কি ঘটে এটা জানার তাঁর ইচ্ছা হয়। আবিষ্কৃত হল আরো এক নতুন বাস্তবতা। প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে স্বপরাগায়ণে চারিত্র্যের পৃথকীভবন ঘটল না। এদের সন্ততিরা সকলেই সদৃশ হল। মেণ্ডেল সাত প্রজন্ম অনুসরণ করেও এদের চারিত্র্যের পৃথকীভবনের কোন লক্ষণ খুঁজে পেলেন না। কিন্তু প্রকট চারিত্র্য উদ্ভিদের ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত সৌসম্য দেখা গেল না। এদের কোন-কোনটির স্বভাব অবিকল প্রচ্ছন্নচারিত্র্য উদ্ভিদের মতো, অর্থাৎ চারিত্র্যে পৃথকীভবন অনুপস্থিত। কিন্তু অবশিষ্টেরা আগের মতো ১:৩ অনুপাতে পৃথকীভূত হয়। কিন্তু এখানেও আবার একটি নির্দিষ্ট সংখ্যাসূচক অনুপাত দেখা গেল: প্রকটদের দুই-তৃতীয়াংশ পৃথকীভূত হল কিন্তু এক-তৃতীয়াংশ হল না।

মেণ্ডেল অতঃপর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, পরিদৃষ্ট গড় প্রকাশের ক্ষেত্রে ৩:১-এর বদলে ২:১:১ লেখাই অধিকতর নির্ভুল। উৎপন্ন সঙ্কর

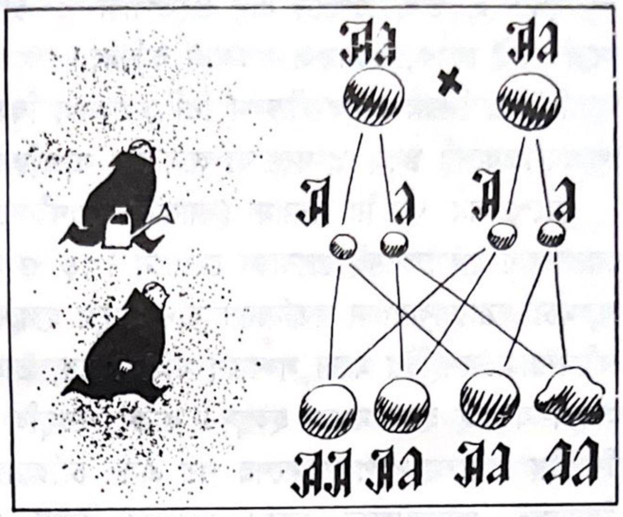
Aa
×
Aa
A
a
A
a
AA
Aa
Aa
aa

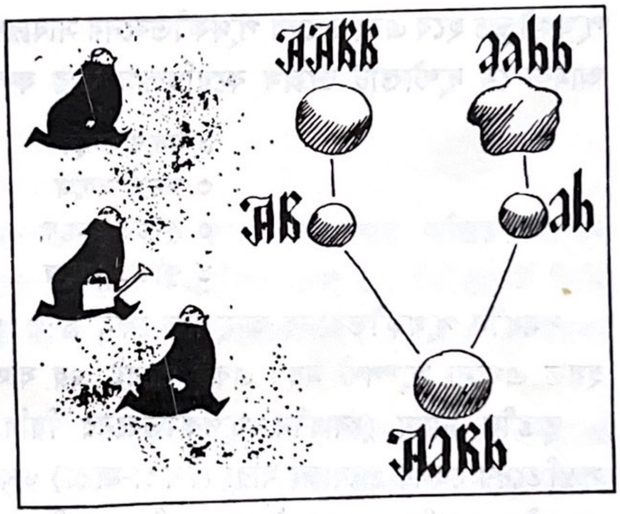
AABB
aabb
AB
ab
AaBb

বীজের অর্ধেকের মধ্যে এক-চতুর্থাংশ অপৃথকীভূত প্রকট এবং এক-চতুর্থাংশ প্রচ্ছন্ন।

এখানেই মূল প্রতিপাদ্য শেষ। বংশানুসৃতি প্রক্রিয়া অবশেষে কয়েকটি সাধারণ নিয়মে পর্যবসিত হল। এর ব্যাখ্যার জন্য অনেক শব্দের প্রয়োজন হল। সরল ছবির সাহায্যে কিন্তু এ নিয়মাবলীর ব্যাখ্যা সহজতর।

পরবর্তীকালে ডাচ উদ্ভিদবিজ্ঞানী ডেভ্রিসের ভাষায় প্রখ্যাত মেণ্ডেলীয় নিয়মাবলী নিম্নরূপ।

প্রথম নিয়মানুসারে (সমসত্ত্বতা ও ব্যতিহার বিধি) প্রথম সংকর প্রজন্ম সম্পূর্ণ সমসত্ত্ব। 'ব্যতিহার' (পারম্পর্য, তুল্যতা) শব্দটি যদিও এ অর্থে

যথাযথ নয়, তবু এখানে এর প্রতিপাদ্য — চারিত্র্য মাতৃ অথবা পিতৃ যে সূত্রজাতই হোক, ফলাফল সর্বদাই অভিন্ন।

দ্বিতীয় নিয়ম (পৃথকীভবন বিধি) কেবল দ্বিতীয় প্রজন্মেই প্রযোজ্য এবং পৃথকীভবনের ১ :২ :১ গড়, যা আমাদের সুপরিচিত, তারই সঙ্গে সম্পর্কিত।

মেণ্ডেলের তৃতীয় নিয়ম (স্বাধীন শ্রেণীবন্ধন বা পুনর্বিন্যাস বিধি) কেবলমাত্র সে ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যেখানে পিতৃ ও মাতৃ পক্ষের মধ্যে একাধিক যুগ্মচারিত্র্যের ব্যবধান বর্তমান। যদি মসৃণ হলুদ বীজ এবং কুঞ্চিত সবুজ বীজের মটরশুঁটির মধ্যে সংকরণ ঘটানো হয়, তাহলে প্রথম সংকর প্রজন্মের সকল বীজই হবে মসৃণ হলুদ। কারণ, ওগুলি মটরশুঁটির প্রকট চারিত্র্য। দ্বিতীয় প্রজন্মে স্বপরাগায়ণের পর এসব চারিত্র্যের সর্বমোট চারটি সম্ভাব্য। বিন্যাসই পরিলক্ষিত হবে। তাছাড়া উভয় যুগ্মচারিত্র্যই স্বাধীনভাবে পৃথকীভূত হবে এবং তাদের পৃথকীভবনের সাধারণ অনুপাত হবে ৯ :৩ :৩ :১। আমরা যে দৃষ্টান্তটি উল্লেখ করেছিলাম তার ফলাফল :

৯ মসৃণ হলুদ
৩ মসৃণ সবুজ
৩ কুঞ্চিত হলুদ
১ কুঞ্চিত সবুজ

স্বাধীন পৃথকীভবনের অনুপাত কেন ৯ :৩ :৩ :১ হল তা আপনার কাছে হয়ত এখনো সুস্পষ্ট নয়। একটু পরেই এর যাথার্থ্য স্পষ্টতর হবে।

তৃতীয় নিয়ম (স্বাধীন পৃথকীভবনের বিধি) সেই সকল পিতা-মাতার সন্ততিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা (পিতা-মাতা) একাধিক যুগ্মচারিত্র্যে চিহ্নিত। স্মরণীয়, সন্ততির মধ্যে ঐ যুগ্মচারিত্র্যের বিন্যাস অটুট থাকবে না, তাদের স্বাধীন সমাবন্ধন ঘটে।

মেণ্ডেল অতঃপর আর অগ্রসর না হলেও তাঁর আজকের প্রাপ্য মর্যাদার কোন ঘাটতি হত না। কারণ, এগুলোই বংশানুসৃতির বিজ্ঞানস্বীকৃত প্রথম নিয়মাবলী। আর জীববিজ্ঞানে প্রবর্তিত মাত্রিক নিয়মের এগুলোই সম্ভবত প্রথম দৃষ্টান্ত। কিন্তু মেণ্ডেল আরো এগিয়ে গিয়েছিলেন। চারিত্র্যসমূহ কেন এই বিশেষ পন্থায় বংশানুসৃত হয় তিনি তাও ব্যাখ্যা করেছিলেন।

তৎকালীন বৈজ্ঞানিক মানের ভিত্তিতে স্বীয় আবিষ্কৃত নিয়মাবলীর নির্ভুলতর ব্যাখ্যাদানে মেণ্ডেলের বিস্ময়কর সাফল্যই তাঁর গবেষণার অনন্য বৈশিষ্ট্য। তথ্যাদির পর্যালোচনায় তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, বংশানুসৃতি

ধারাবাহিক নয় এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি সাধারণত বৃহদাকারে পুঞ্জীভূত না হয়ে এককভাবেই বংশান্তরিত হয়। তিনি একক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে জননকোষে অবস্থিত একক 'বংশানুসৃতি বৈশিষ্ট্য' বা 'উপাদানের' সঙ্গে যুক্ত করেন। ঐ প্রত্যয়সমূহেই তাঁর আবিষ্কারের মূল নিহিত। তাঁর আবিষ্কারগুলো ব্যাখ্যার অন্যথা হতে পারত না।

বর্তমানকালের বংশাণুবিদ্যার পরিভাষা ও প্রতীক থেকে মেণ্ডেলের ব্যবহৃত শব্দাবলী পৃথক ছিল। দৃষ্টান্ত হিসেবে মেণ্ডেলের ব্যবহৃত উপাদান শব্দটি উল্লেখ্য। বিংশ শতাব্দীতে তা জিন বা বংশাণু নামে চিহ্নিত। মেণ্ডেলের তত্ত্বালোচনায় আমরা তাঁর পরিভাষা ব্যবহার করব না এবং যেখানেই এগুলো বর্তমান পরিভাষা থেকে আলাদা সেখানেই একালীন বিজ্ঞানের ভাষায় তা অনূদিত হবে।

একটি উন্মদ প্রকল্প

চারিত্র্য সৃষ্টির জন্য জননকোষে এক প্রকার বস্তুকণার অস্তিত্ব মেণ্ডেল অনুমান করেছিলেন যা আজ জিন নামে চিহ্নিত এবং এর ভিত্তিতেই তিনি তাঁর আবিষ্কৃত নিয়মাবলী ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছিলেন। এ তাঁর বিস্ময়কর সাফল্য।

বংশানুসৃতিতে পুরুষ ও স্ত্রী উপাদানের সমতা ব্যাখ্যায় মেণ্ডেল এভাবেই বিষয়টিকে যুক্তিনির্ভর করার চেষ্টা করেন যে, পিতা-মাতা প্রত্যেকে একটি করে সমতুল্য জিন সন্তানে সঞ্চারিত করে। যেহেতু পিতা-মাতা উভয় পক্ষের চারিত্র্যই দ্বিতীয় প্রজন্মে প্রকটিত হয় তাই অন্যতর কোন ব্যাখ্যা এখানে সঙ্গত নয়। কিন্তু তা ঘটে কীভাবে? স্ত্রী ও পুরুষ জননকোষের মিলনই এর সহজতম পন্থা। এভাবে পিতা-মাতা উভয়ের জিনই সঞ্চারিত হবে ভ্রূণকোষে। কিন্তু তারপর? জননকোষে যেহেতু প্রত্যেক প্রকার জিনের সংখ্যা এক, তাই সন্তানে সংখ্যাটি দ্বিগুণিত হবে অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকার জিনের সংখ্যা হবে দুই... যখন এই বংশ থেকে যে নতুন সন্তান জন্মাবে তাতে কি চারটি জিন থাকবে? কিন্তু তা অবান্তর। প্রক্রিয়াটি সত্যি হলে মটরশুঁটিতে একমাত্র জিন ছাড়া আর কিছুই থাকত না। মেণ্ডেল বিষয়টি নিয়ে ভাবতে শুরু করলেন। কিন্তু কোষগুলো কেনই-বা মিশে যাবে। এমন তো হতে

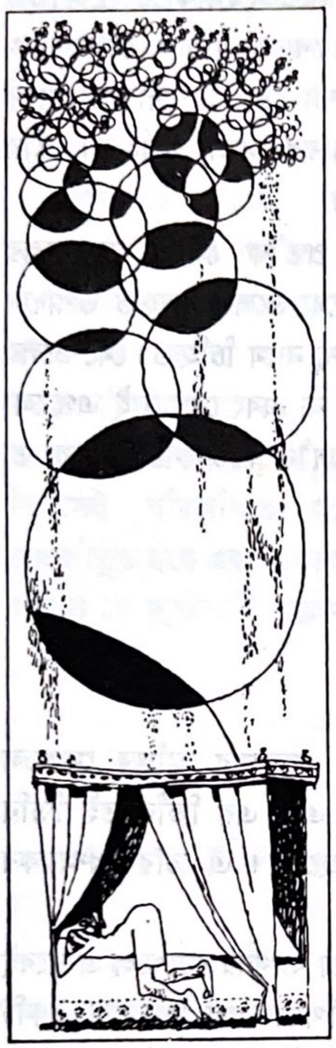

পারে যে, তারা তাদের উপাদানের কেবল অর্ধেক ভ্রূণে সঞ্চারিত করবে। তাহলে অবশ্য পিতা-মাতা প্রত্যেকেরই শুরু থেকেই দ্বিগুণ সংখ্যক জিন থাকা প্রয়োজন। কিন্তু কেন নয়? মেণ্ডেল কিছু সরল অঙ্ক কষলেন এবং সবক'টি ফলাফলেরই যুক্তিনিষ্ঠ ব্যাখ্যা খুঁজে পেলেন। অতঃপর অবশ্যস্বীকার্য, প্রত্যেক প্রকার জিন দ্বিগুণ সংখ্যায় পিতা-মাতার দেহে বর্তমান এবং ভ্রূণকোষে সঞ্চারিত হয় এর অর্ধেক মাত্র। প্রাপ্ত ফলাফলের বিশদ পর্যালোচনায় নিবিষ্ট হলেন মেণ্ডেল।

এবার মসৃণ ও কুঞ্চিত বীজ মটরশুঁটির সংকরণ পরীক্ষায় আবার ফিরে যাওয়া এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এর বিশ্লেষণ করা যাক। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, যে জিন বীজের গঠন 'নিয়ন্ত্রণ করে' উভয় জাতের মটরশুঁটিতে তা সমতুল্য নয়। এবার প্রকট জিনের (অথবা প্রকট যুগল, যেমনটি আজকাল বলা হয়) এবং প্রচ্ছন্ন জিনের (প্রচ্ছন্ন যুগল) সংকেত যথাক্রমে বড় ও ছোট হাতের অক্ষরে লেখা হল। ধরা যাক মসৃণ বীজ ও কুঞ্চিত বীজের যুগল যথাক্রমে A এবং a দ্বারা চিহ্নিত। সুতরাং পিতা-মাতাদের একজনের কোষে থাকবে AA এবং অন্যজনে aa। পরনিষেক মাধ্যমে অতঃপর যে কোষ থেকে ভ্রূণের উদ্ভব ঘটবে সে পাবে A এবং a, ভাষান্তরে এর বংশানুসৃতি সংকেত হবে Aa। কিন্তু যুগল A (মসৃণ বীজ) যেহেতু তার প্রতিযোগী a-র (কুঞ্চিত বীজ) উপর সম্পূর্ণ প্রকট, তাই সন্ততিরা হবে কেবল এদের একজনেরই অনুরূপ। বলা বাহুল্য অন্যত্রও ফলাফল হবে একই, কারণ AA এবং aa-র পারস্পরিক বিক্রিয়ায় Aa ছাড়া অন্যতর বিকল্প সম্ভবপর নয়।

বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো বংশাণুবিদ্যারও নিজস্ব পরিভাষা আছে। এ পরিভাষা ছাড়া আমরা অনন্যোপায় যদিও বংশাণুবিদ্যার সুনির্দিষ্ট

পরিভাষার সংখ্যা বেশী নয়। আমরা এতে কথা সংক্ষেপণের সুযোগ পাই। আপাতদৃষ্টিতে দুর্বোধ্য বাক্যটিও পরিভাষার সাহায্যে সহজবোধ্য হয়ে ওঠে। যেমন, 'প্রচ্ছন্ন যুগল ভ্রূণাণুজাত হলেই শুধু জিনসত্তা বাহ্যসত্তায় প্রকাশিত হয়।' 'যুগল' এবং 'প্রচ্ছন্ন' — এই শব্দদুটি আপনারা ইতিমধ্যে জেনেছেন। এখন আমরা 'সমভ্রূণাণুজাত' ও 'অসমভ্রূণাণুজাত' শব্দদুটির অর্থ জানার চেষ্টা করি। 'সম' অর্থ সমান, 'অসম' অর্থ অসমান। ভ্রূণাণু শব্দটি প্রাথমিক কোষের (নিষিক্ত ডিম্বাণু) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা পুং ও স্ত্রী জননকোষের মিলনে উৎপন্ন এবং ভ্রূণের পূর্বপর্যায়। সুতরাং যুগলবন্দী জীবকে (বা কোষ) সমভ্রূণাণুজাত এবং অসম যুগলবন্দীকে অসমভ্রূণাণুজাত বলা হয়। যেমন, পূর্বোক্ত *AA* এবং *aa* এই উদ্ভিদদুটি সমভ্রূণাণুজাত, কিন্তু তাদের *Aa* সংকর সন্তানরা অসমভ্রূণাণুজাত। 'জিনসত্তা' ও 'বাহ্যসত্তা' শব্দদ্বয়ের প্রথমটি বংশানুসারী কণা বা উৎপাদকের (জিন) বিন্যাস এবং দ্বিতীয়টি বহিরঙ্গীয় চারিত্র্যসমূহের সমাহার।

দুর্বোধ্য বাক্যটির অর্থ এখন পরিষ্কার। কেন *Aa* উদ্ভিদের বহিরঙ্গে কুঞ্চিত বীজের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয় না, এতে এর যথাযথ ব্যাখ্যা নিহিত।

মেণ্ডেল নিজে যেভাবে তাঁর প্রথম নিয়মটি বুঝেছিলেন, ঠিক সেরূপ ব্যাখ্যার জন্য উপরোক্ত তথ্যাদিই যথেষ্ট। আমরা শুধু এটুকুই যোগ করব যে, প্রকটতা সর্বত্রই সুসম্পূর্ণ হয় না। সন্ধ্যামালতীর (*Mirabilis jalapa*) লাল ও সাদা ফুলের মধ্যে সংকরণ ঘটালে তাদের অসমভ্রূণাণুজাত সন্তানদের ফুল হয় গোলাপী। তথ্যটি মেণ্ডেলীয় নিয়মের প্রথম সূত্রের বিরোধী নয়। কারণ, প্রথম সংকর প্রজন্মের সকল সন্তানের সৌসাদৃশ্য সম্পর্কিত তাঁর বক্তব্যের এখানে কোন ব্যত্যয় ঘটে নি। সংকর সন্তানেরা সব সময়ই অবিকল পিতৃ বা মাতৃ প্রজন্মের অনুরূপ হয় না।

এখন তাঁর দ্বিতীয় নিয়মের দিকে ফেরা যাক। দ্বিতীয় সংকর প্রজন্মই এর আলোচ্য বিষয়। প্রথম প্রজন্মের অসমভ্রূণাণুজাত সংকররা স্বপরাগায়িত হলে কী ফল ফলে তাই দেখি। স্বপরাগায়ণে আলাদা পিতা-মাতার প্রসঙ্গ অবান্তর। কিন্তু স্মরণীয়, ভ্রূণ স্ত্রী ও পুং উপাদানের মিশ্রণ। এসব উদ্ভিদের সকল কোষই অসমভ্রূণাণুজাত (*Aa*)। সুতরাং এদের ভ্রূণে প্রতিটি পক্ষ থেকে *A* অথবা *a*-র যেকোন একটি সঞ্চারিত হবে। এর চার প্রকার সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করা যাক:

পিতৃজ A + মাতৃজ a = সন্ততি Aa
পিতৃজ A + মাতৃজ A = সন্ততি AA
পিতৃজ a + মাতৃজ a = সন্ততি aa
পিতৃজ a + মাতৃজ A = সন্ততি aA

এ সবক'টি সন্নিপাতের সম্ভাব্যতাই যে সমান তা দুর্লক্ষ্য নয়। এসঙ্গে আশা করা যায়, গড়ে প্রতি চারটি সন্তানের মধ্যে দুটি হবে অসমভ্রূণাণুজাত, একটি সমভ্রূণাণুজাত প্রকট, একটি সমভ্রূণাণুজাত প্রচ্ছন্ন চারিত্র্যের অধিকারী। অর্থাৎ ১:২:১ এই মেন্ডেলীয় পৃথকীভবন অনুপাত পরিলক্ষিত হবে। আর যেহেতু অসমভ্রূণাণুজাতদের ক্ষেত্রে প্রকট যুগলই অভিব্যক্ত সুতরাং তারা বাহ্যত (বাহ্যসত্তায়) পূর্ণ প্রকটদেরই সদৃশ। অতএব দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্যের পৃথকীভবনের অনুপাত হবে ৩:১, যথা, প্রতি তিনটি মসৃণ বীজের ক্ষেত্রে একটি কুঞ্চিত বীজ। মেন্ডেল তাঁর পরীক্ষায় ঠিক এই ফলাফলই লক্ষ্য করেছিলেন। প্রকটতা অসম্পূর্ণ হলেও পৃথকীভবনের ১:২:১ অনুপাতটি অপরিবর্তিত থাকে।

এবার মেন্ডেলের তৃতীয় নিয়ম। এটি একাধিক যুগলবৈশিষ্ট্যে পৃথক পিতা-মাতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পূর্বোক্ত মসৃণ হলুদ ও কুঞ্চিত সবুজ বীজের মটরশুঁটি সঙ্করণের দৃষ্টান্ত এখন পুনরুল্লিখিত হোক। যদি বীজপত্রের বর্ণোৎপাদক জিন B (হলুদ) প্রকট যুগল হিসেবে যথানিয়মে বড় অক্ষরে এবং প্রচ্ছন্ন যুগল (সবুজ) ছোট অক্ষর b দ্বারা চিহ্নিত হয় তাহলে পিতা-মাতার বংশাণুসূত্র হবে $AABB$ এবং $aabb$। যেহেতু এরা সমভ্রূণাণুজাত তাই সকল প্রকার জিন বহন সত্ত্বেও প্রথম সঙ্কর প্রজন্মের সব সন্তানই সদৃশ হবে। আপনারা এখন নিজেরাই সঙ্করদের বংশাণুসূত্র লিখতে পারবেন। তা হবে $AaBb$। যেহেতু কেবলমাত্র প্রকট যুগলই অভিব্যক্ত তাই বাহ্যত সকল সঙ্করই প্রথম প্রজন্মে সদৃশ এবং সব পরীক্ষায়ই এই সত্য পরিদৃষ্ট।

স্বপরাগায়ণের পর দ্বিতীয় সঙ্কর প্রজন্মে সঠিক কী ঘটবে তা বোঝা কিছুটা কঠিন। কী ধরনের যুগল ভ্রূণে সঞ্চারিত হবে প্রথমে তাই দেখা যাক। প্রতি পক্ষে এখানে চারটি সম্ভাব্য সংযোগ বর্তমান: AB, Ab, aB, ab এবং এদের ১৬টি বিভিন্ন বিন্যাস সম্ভবপর। মনে মনে অঙ্কটি কষা কঠিন। একটি ছক তৈরিই বরং সহজতর। এবার চারটি সংযোগ ছকের উপরে এবং পাশে লিখি। এদের প্রতিচ্ছেদ দ্বারাই সম্ভাব্য প্রকারসমূহ চিহ্নিত হবে।

তাদের বহুল সংখ্যা সত্ত্বেও যেহেতু প্রকট যুগলই প্রত্যক্ষ তাই দ্বিতীয় প্রজন্মে এদের প্রকার সংখ্যা হবে চার। ১৬টি বীজের প্রতি দলের চারিত্র্য হবে:

৯ মসৃণ হলুদ
৩ মসৃণ সবুজ
৩ কুঞ্চিত হলুদ
১ কুঞ্চিত সবুজ

অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রজন্মে পৃথকীভবনের সম্ভাব্য অনুপাত হবে ৯:৩:৩:১ এবং তা আমরা ইতিপূর্বেই জেনেছি। পরিশেষে বলা যায় পরিসংখ্যান নিয়মানুযায়ী পরীক্ষা দ্বারা ঠিক এ ফলাফলই নির্ণীত হয়েছিল, অবশ্য তা নির্দিষ্ট প্রকারণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

দেখুন, বংশানুসৃত বৈশিষ্ট্যাবলী জননকোষে অবস্থিত একক বস্তুগত উপাদানের (জিন) মাধ্যমেই প্রজন্মান্তরে সঞ্চারিত হয় — এ প্রত্যয় স্বীকার করে নিলে অতঃপর মেন্ডেলীয় নিয়মাবলী সহজেই ব্যাখ্যা সম্ভব। অবশ্য ১৮৬৫ সালে জিন ছিল প্রত্যয়মাত্র এবং মেন্ডেলীয় নিয়মাবলী পুনরাবিষ্কৃত হয়েছিল ১৯০০ সালে। বর্তমানে প্রকল্পটি বহুল তথ্যসমর্থিত আর জিন সম্পর্কেও এখন আমরা বিস্তর অবহিত।

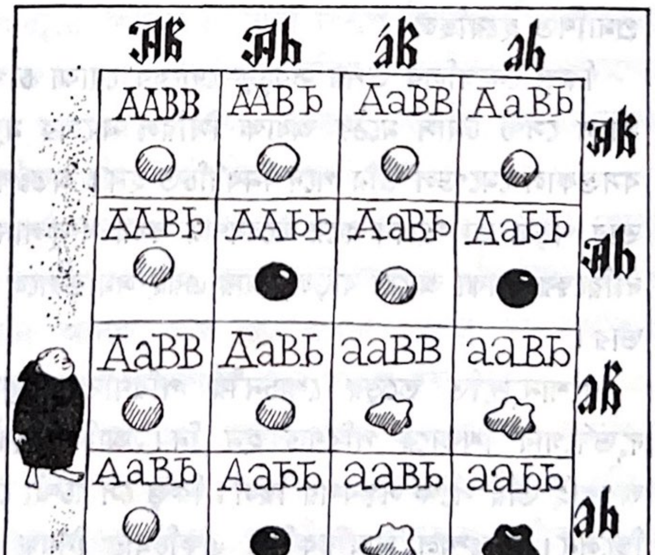

	AB	Ab	aB	ab
AB	AABB	AABb	AaBB	AaBb
Ab	AABb	AAbb	AaBb	Aabb
aB	AaBB	AaBb	aaBB	aaBb
ab	AaBb	Aabb	aaBb	aabb

নিজ আবিষ্কার প্রকাশের পূর্বে মেণ্ডেল দীর্ঘকাল দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। তিনি বার বার পরীক্ষাগুলো পুনরাবৃত্তি করেন আর একই ফল পান। শেষে মন স্থির করলেন। ১৮৬৫ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি ও ৮ই মার্চে ব্রিউনের নিসর্গী সমিতিতে তিনি তাঁর নিবন্ধ 'উদ্ভিদ সঙ্করণ সংক্রান্ত পরীক্ষাবলী' পাঠ করলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তিনি সমিতিটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। অদ্যাবধি সংরক্ষিত সভার কার্যবিবরণী থেকে দেখা যায় বক্তাকে কোন প্রশ্ন করা হয় নি। এর সরল মর্মার্থ: উপস্থিত কেউই এর বিন্দুবিসর্গও বোঝেন নি।

তাঁকে না বোঝায় বিস্ময়ের কিছু নেই। মেণ্ডেলের গবেষণা ছিল অভিনব। তিনি কালের রীতিবিরুদ্ধ ভাষায় বংশানুসৃতির প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করেছিলেন। তাছাড়া জীবতাত্ত্বিক গবেষণায় তিনি গণিতের যে ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিলেন তাও ছিল অশ্রুতপূর্ব। সুতরাং তাঁর বক্তৃতা এবং পরবর্তীকালে প্রকাশিত নিবন্ধের যাথার্থ্য অনুধাবন সমকালীনদের পক্ষে সহজসাধ্য হয় নি। এখানে আরো একটি বড় কথা উল্লেখ্য। মেণ্ডেলের কোন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠা ছিল না। তিনি ছিলেন অপেশাদার বিজ্ঞানী।

একটি মফঃস্বল শহরের নিসর্গী সমিতির সদস্যদের সম্পর্কে মেণ্ডেলের যে কোন মোহ ছিল না, আমরা তাঁর পত্রাবলী থেকে তা জানি। তিনি তাই প্রখ্যাত সঙ্করণ গবেষক অধ্যাপক নেগেলির দ্বারস্থ হন। কিন্তু এর ফলাফল কাহিনীর শুরু থেকেই আপনারা জানেন। তাঁর উপর মেণ্ডেলের অগাধ আস্থা ছিল বলেই নেগেলির উপদেশ পরবর্তী গবেষণার ক্ষেত্রে মারাত্মক ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছিল।

কিন্তু নেগেলির উপর সবটুকু দোষের বোঝা চাপানো সঙ্গত নয়। ১৮৬৭ সালে সেণ্ট টমাস মঠের অধ্যক্ষ সিরিল নাপের মৃত্যু হল। ১৮৬৮ সালের বসন্তকাল মেণ্ডেল তাঁর পদে নির্বাচিত হন। অতঃপর তাঁর উপর যে দায়িত্বের ভার পড়ল তা পালন করে গবেষণার সময় সঙ্কুলান তখন অসম্ভব হল। ক্রমে দায়িত্বের বোঝা আরো বাড়ল, আর এরই সমান্তরালে বাড়ল বয়সের, অস্বাস্থ্যের ভার।

বংশানুসৃতি তত্ত্বের শোচনীয় পরিণতি সত্ত্বেও স্বয়ং মেণ্ডেল কোন দুর্ভাগ্যের শিকারে পরিণত হন নি। আবিষ্কারের জন্য স্বীকৃতি আদায় অবশ্যই তাঁর পক্ষে সম্ভবপর ছিল। কিন্তু সে চেষ্টা থেকে তিনি সম্পূর্ণ বিরত ছিলেন। মফঃস্বল সাময়িকীতে একটিমাত্র নিবন্ধ প্রকাশ করেই তাঁর থেমে যাবার কোন প্রয়োজন ছিল না, বরং বহুল প্রচারিত অন্যান্য সাময়িকীতেও

তিনি লেখা পাঠাতে পারতেন। তাছাড়া আরো লক্ষণীয় যে, এতে ব্যর্থ হলেও নিজ পরীক্ষা ও তত্ত্ব সম্পর্কে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করা তাঁর অসাধ্য ছিল না। মেণ্ডেল ততদিনে বিত্তশালী ব্যক্তি। তাছাড়া অধ্যাপক নেগেলির মন্তব্য অগ্রাহ্য করে মেণ্ডেল সরকারী বিজ্ঞানের অন্যান্য প্রতিনিধিদের দৃষ্টিও আকর্ষণ করতেও পারতেন। কিন্তু তিনি কিছুই করেন নি।

এ ধারণা অবশ্যই অসঙ্গত যে, নিজ নির্ভুলতা সম্পর্কে তিনি সন্দিহান ছিলেন অথবা আবিষ্কারটির যথাযথ তাৎপর্য তিনি বুঝতে পারেন নি। তাঁর নিবন্ধ ও ততোধিক নেগেলির কাছে লিখিত চিঠি থেকে আমরা জানি যে মেণ্ডেল স্বীয় গবেষণা সম্পর্কে নিশ্চিত এবং তাঁর আবিষ্কারের গুরুত্ব সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ছিলেন। সম্ভবত কৃতিত্বের জন্য তিনি বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলেন না।

আমরা জানি বহুবিধ বিষয়ে তিনি কৌতূহলী ছিলেন। উদ্ভিদ সঙ্করণ অপেক্ষা মৌমাছি পালন এবং আবহতত্ত্বে তাঁর কিছুমাত্র কম উৎসাহ ছিল না। পূর্বোক্ত বিষয়ে যেখানে তাঁর প্রকাশিত নিবন্ধের সংখ্যা দুই সেখানে আবহতাত্ত্বিক প্রবন্ধের সংখ্যা পাঁচ (তাঁর বিখ্যাত নিবন্ধের পূর্বে ও পরে প্রকাশিত)। উদ্ভিদ সঙ্করণকেই তিনি জীবনের অনন্য উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করেন নি।

মেণ্ডেল পেশাদার বিজ্ঞানী ছিলেন না এবং নিজে অনুরূপ কোন ধারণাও পোষণ করতেন না। শিক্ষকতায় গভীর আকর্ষণের জন্য আজীবন এ থেকে আর বিচ্ছিন্ন হন নি। শুরুতে শিক্ষক ও শেষে বিশপ হিসেবে তিনি তখন শহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। বলা বাহুল্য, বিবিধ সামাজিক কর্মকাণ্ডে অতঃপর তাঁর অংশগ্রহণ অপরিহার্য ছিল: নিসর্গী সমিতি, মোরাভিয়ার বিধানসভা ইত্যাকার সংগঠনে তাঁর উপস্থিতিও অপরিহার্য।

নিজের গবেষণা সম্পর্কে সম্ভবত তিনি আরো এক ধাপ এগিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। স্বীয় নিয়মাবলীর সার্বিক প্রযোজ্যতা প্রমাণও তাঁর ইচ্ছা ছিল। হায়েরেশিয়াম নিয়ে তিনি অনেক কাজ করেছিলেন। কিন্তু তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। শেষ অবধি গবেষণাটি আর সমাপ্ত হয় নি।

এসব ছাড়াও মানুষ হিসেবে মেণ্ডেল ছিলেন সহজ এবং সার্বিক মানবিক গুণসম্পন্ন। তাঁর ঔদার্য উচ্ছ্রিত ছিল স্বজন ও স্বগ্রামবাসীদের প্রতি। তিনি মাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন এবং আজীবন সর্বক্ষণ তাঁকে মনে রেখেছিলেন। আর বোন থেরেসিয়া, যিনি পড়াশোনার জন্য তাঁকে নিজের

যৌতুকের একাংশ দিয়েছিলেন, তাঁর কাছেও তিনি আর ঋণী থাকেন নি। নিজের পায়ে দাঁড়িয়েই তাঁর তিন ছেলের দায়িত্ব গ্রহণ করে শিক্ষা সমাপ্তি পর্যন্ত তিনি তাদের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করেন। নিজের গ্রাম পুড়ে গেলে সেখানে দমকল স্টেশন স্থাপনে তাঁর বিপুল অর্থসাহায্যও প্রসঙ্গত উল্লেখ্য।

মেণ্ডেল প্রতিবেশী মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করেছিলেন। ১৮৮৪ সালের ৬ই জানুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়। এক দীর্ঘ শোভাযাত্রা তাঁর শবানুগমন করে। অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানে অতঃপর উচ্চারিত হয় অজস্র বর্ণাঢ্য শব্দ। কিন্তু বিজ্ঞানী মেণ্ডেলের কোন পরিচয় এতে ব্যক্ত হয় নি।

ষোল বছর পরে

সময় এগিয়ে চলল। ক্রমোন্নতির ফলে বংশানুসৃতি প্রত্যয় অনিবার্যভাবেই ক্রমে বিস্মৃত মেণ্ডেলীয় আবিষ্কারের সমীপবর্তী হল।

১৮৮৪ সালে অধ্যাপক নেগেলি বিবর্তন সম্পর্কে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করলেন। এর কোন কোন তথ্যের সঙ্গে গ্রন্থ প্রকাশের বছরে পরলোকগত তাঁর পূর্বতন পত্রপ্রেরকের মতের ঘনিষ্ঠতম সাদৃশ্য ছিল তবু কোথাও সেখানে মেণ্ডেলের নাম উল্লেখিত ছিল না। হয় নামটি নেগেলি বিস্মৃত হয়েছিলেন অথবা একে উল্লেখযোগ্য বিবেচনা করেন নি। বলা বাহুল্য, দুর্বোধ্য ও অস্পষ্টতাদুষ্ট নেগেলির বক্তব্যে মেণ্ডেলীয় তত্ত্বের স্বচ্ছতা ছিল না।

ইতিমধ্যে কৃষি ব্যবস্থার তাগিদেই পশুপ্রজনন ও চাষাবাদে সঙ্করণের ব্যাপকতর প্রয়োগ অপরিহার্য হয়ে উঠল। বিজ্ঞানীরাও স্বাভাবিকভাবেই এর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। ১৮৯৯ সালে রয়েল হর্টিকালচ্যারেল সোসাইটির উদ্যোগে লণ্ডনে সঙ্করণ সম্পর্কিত একটি সম্মেলন আহূত হল। বহুজনের উপস্থিতিধন্য এ সম্মেলনটি পরে বংশাণুবিদ্যার প্রথম আন্তর্জাতিক কংগ্রেস রূপে চিহ্নিত হয়েছিল। বহু প্রখ্যাত বিজ্ঞানী এতে যোগদান করেছিলেন। সেখানে সর্বাধিক আকর্ষণীয় তথ্য পরিবেশন করেন ইংরেজ জীববিজ্ঞানী বেট্‌সন। তাঁর বক্তব্য ছিল বংশানুসৃতির অনন্বিত অভিব্যক্তি, এবং মূলত এ-ই ছিল মেণ্ডেলবাদের তত্ত্বীয় ভিত্তি। কিন্তু সম্মেলনে মেণ্ডেলের নাম একবারও উচ্চারিত হয় নি।

১৯০০ সালের প্রভাতী আলোয় পুনরাবিষ্কৃত হল মেণ্ডেলের নিয়মাবলী, স্বীকৃতি পেল তাঁর অবদান। একই বর্ষক্রমে তিনটি বিজ্ঞানীর তিনটি নিবন্ধ

একই সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়। এদের বিষয়বস্তু ছিল মেণ্ডেলের ৩৫ বছর আগেকার বক্তব্যের কাছাকাছি। তিনজন লেখকেরই প্রতিপাদ্য ছিল বংশানুসৃতির মৌলিক মাত্রিক নিয়মাবলী।

১৯০০ সালের ১৪ই মার্চ 'জার্মান বোটানিকাল সমিতির বিবরণী' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে আমস্টারডাম থেকে একটি প্যাকেট এসে পেঁছিল। এর মধ্যে ছিল একটি নিবন্ধের পাণ্ডুলিপি, লেখক প্রখ্যাত ডাচ উদ্ভিদবিজ্ঞানী হুগো ডেভ্রিস, প্রবন্ধের নাম 'সঙ্কর পৃথকীভবনের নিয়মাবলী'। তাতে প্রবন্ধের নীচে প্রচলিত ছোট হরফে একটি পাদটীকায় মেণ্ডেলের রচনা সম্পর্কে লেখক লিখেছেন: 'এই গুরুত্বপূর্ণ রচনা এত কম উদ্ধৃত যে আমার অধিকাংশ পরীক্ষা শেষ করে স্বাধীনভাবে উপরোক্ত সিদ্ধান্তে পেঁছনোর আগে এ সম্পর্কে আমি কিছুই অবহিত ছিলাম না।' তখন ডেভ্রিসের বয়স ৫২ এবং বিজ্ঞানবিশ্বে তিনি সুপরিচিত।

কিন্তু ডেভ্রিসের নিবন্ধ প্রকাশিত হবার পূর্বে, হল্যাণ্ড থেকে প্যাকেট এসে পেঁছনোর মাসখানেক পরে সম্পাদকমণ্ডলী আরো একটি নতুন পাণ্ডুলিপি পেলেন। এর নাম একেবারে আলাদা: 'প্রজাতি সঙ্করের চারিত্র্য সম্পর্কিত মেণ্ডেলীয় নিয়মাবলী'। এর লেখক ৩৬ বৎসর বয়স্ক কার্ল করেন্স, জার্মানির টিউবিঙ্গেনে উদ্ভিদবিজ্ঞানের অধ্যাপক। তিনিও তাঁর সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ করেই মেণ্ডেলের তত্ত্ব সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর নিবন্ধে এর বিস্তৃততর বর্ণনা ছিল। মেণ্ডেলের আবিষ্কারের স্বীকৃতি আদায়ে করেন্সের চেষ্টা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। তিনিই নেগেলির কাছে লিখিত মেণ্ডেলের পত্রাবলীর প্রথম প্রকাশক।

এর কিছুকাল পরই সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে আরো একটি নিবন্ধ এল। এর নাম: 'পাইসাম সেভিটাম *(Pisum savitum)*-এর কৃত্রিম সঙ্করণ প্রসঙ্গে'। লেখক — এরিখ চেরমাক। অস্ট্রিয়ার এই নিবন্ধকার মেণ্ডেলের 'পুনরাবিষ্কারক'ত্রয়ীর মধ্যে তরুণতম। তাঁর বয়স তখন মাত্র ২৯ এবং তিনি সহকারী অধ্যাপক। তিনিও গবেষণা শেষেই মেণ্ডেলের নিবন্ধ পাঠ করেছিলেন।

ঘটনার এই সন্নিপাত অস্বাভাবিক হলেও তা নিয়মানুগ। মেণ্ডেল তাঁর যুগের বিজ্ঞান অপেক্ষা প্রাগ্রসর ছিলেন। সুতরাং এ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে বংশানুসৃতির নিয়মাবলী বস্তুত বহুলালোচিত প্রসঙ্গে পরিণত হয়। মেণ্ডেলীয় নিয়মাবলী পুনরাবিষ্কারের কৃতিত্ব কেবলমাত্র ডেভ্রিস, করেন্স, চেরমাকের উপর ন্যস্ত হলেও আসলে তা ন্যায্য নয়। তাদের উদ্ভিদ সঙ্করণ পরীক্ষার

সমকালে প্রাণীদের ক্ষেত্রেও একই পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। লণ্ডনে বেট্সন এবং ফ্রান্সে কেনো যথাক্রমে মোরগ ও ইঁদুর সঙ্করণে তখন নিবিষ্ট। উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তাঁরা সমসিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছিলেন। কিন্তু প্রাণীদের বংশানুসৃতির পরীক্ষায় যেহেতু দীর্ঘ সময় অপরিহার্য তাই তাঁদের গবেষণার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে অনেক বিলম্বে।

এই তিন-তিনজন 'পুনরাবিষ্কারকদের' সকলেই পরীক্ষাশেষে মেণ্ডেলের রচনা পাঠ করেছিলেন এমন ঘটনা কি সন্দেহজনক নয়? না, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। নিবন্ধ তৈরির সময় সংশ্লিষ্ট মুদ্রিত রচনাবলীর সন্ধানে তাঁরা প্রত্যেকে অবশ্যই ফোক রচিত 'উদ্ভিদ সঙ্কর' নামক বিশাল সংকলন পাঠ না করে পারেন নি এবং এতে মেণ্ডেলের নিবন্ধও ছিল।

এ থেকেই শুরু। বহু বিজ্ঞানী অজস্র প্রকার উপকরণ নিয়ে অতঃপর মেণ্ডেলীয় নিয়মাবলীর সত্যাখ্যানে রত হলেন এবং সকলেই তা সমস্বরে সমর্থন করলেন। কয়েক বছরের মধ্যেই মেণ্ডেলবাদ সম্পর্কে বৃহদাকার বহুখণ্ড গ্রন্থাবলীর প্রকাশ এবং ছাত্রদের উদ্দেশ্যে আনুষঙ্গিক বক্তৃতাদান শুরু হল।

মেণ্ডেলের কাহিনী শেষ করার আগে সঠিক তিনি কী আবিষ্কার করেছিলেন সে সম্পর্কে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন।

একাধিক বিজ্ঞানী মেণ্ডেলের আগেই যে 'মেণ্ডেলীয় নিয়মাবলী' আবিষ্কার করেছিলেন তা এখন পরিস্ফুটমান। নাইট ও গের্ট্নার, সাজ্রে ও নোদেনের গবেষণার পর বংশানুসৃতির কণিকানুসারী প্রকৃতি, প্রকটতা, বংশানুসৃতিতে স্ত্রী-পুরুষের সম-অবদান, প্রথম সঙ্কর প্রজন্মের সৌসাদৃশ্য এবং দ্বিতীয় প্রজন্মে তাদের পৃথকীভবন তখন আর অজ্ঞাত নেই। 'মেণ্ডেলীয় নিয়মাবলী'র যাকিছু মর্মসার বস্তুত তার সবকিছুই ততদিনে প্রকাশিত।

মেণ্ডেল বংশানুসৃতি নিয়মাবলীর আবিষ্কারক নন! কিন্তু তাঁর এই কৃতিত্ব খণ্ডন করেই আমরা তাঁর উপর অধিকতর সম্মান আরোপ করতে পারি। সত্যের একটি সরল বিবৃতিদান অপেক্ষা বহুগুণ গুরুত্বপূর্ণ দুটি আবিষ্কার মেণ্ডেল সম্পন্ন করেন।

তাঁর প্রথম অবদান, তিনি যে পরীক্ষা পরিচালনা করেন তা পূর্বসূরীদের অপেক্ষা ভিন্নতর পর্যায়ে পরিকল্পিত ছিল। সমগ্র 'চেহারার' বংশানুসৃতি অনুসন্ধান না করে পৃথক পৃথক বংশানুসারী বৈশিষ্ট্যের অনুসন্ধান তাঁর একক কৃতিত্ব। একটিমাত্র বৈশিষ্ট্যে পৃথক উদ্ভিদ নিয়েই তাঁর পরীক্ষার

শুরু এবং অতঃপর ক্রমবর্ধমান জটিলতায় সুস্থির অপসরণ। তাঁর পরীক্ষা সম্পর্কে তাই সন্দেহের অবকাশ ছিল না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তাঁর আগে আর কোন পরীক্ষাই এত নিখুঁত ও শুদ্ধতার সঙ্গে পরিচালিত হয় নি।

তাঁর দ্বিতীয় ও মূলতম অবদান জননকোষে বংশানুসৃতির দ্বিগুণ সংখ্যক বাস্তব উপাদানের অবস্থিতি এবং পিতৃ ও মাতৃ পক্ষ থেকে তা ভ্রূণে সঞ্চারণের প্রকল্প। সত্যিই তা 'উন্মদ প্রত্যয়' এবং কেবলমাত্র নিউটন ও আইনস্টাইনের তত্ত্বাবলীর সঙ্গেই তুলনীয়। তাই মেণ্ডেল স্বীকৃত প্রতিভা।

মেণ্ডেলবাদ আধুনিক বংশাণুবিদ্যার ভিত্তিস্বরূপ। টি. এইচ. মর্গান এ বিদ্যার প্রথম তলার ভাগ্যনির্দিষ্ট নির্মাতা। মর্গান লিখেছিলেন: 'মেণ্ডেল মঠোদ্যানে দশ বছর উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা করে যে সাফল্য অর্জন করেছিলেন জীববিজ্ঞানের বিগত ৫০০ বছরের ইতিহাসে তা শ্রেষ্ঠতম আবিষ্কার।'

মাছি আর হাতি

যেন এক চলচ্চিত্র

জীবন্ত কোষের উদ্ভবস্থল কোথায়? জীবনচক্রে তাদের কী কী পরিবর্তন ঘটে? বিষয়টি জানার সহজতর পন্থা কী? অণুবীক্ষণে তাকিয়ে দেখুন। সত্যকথা, একটি কোষের জীবনচক্রের অস্তিত্বকাল কয়েক ঘণ্টা কিংবা কয়েক দিন। কিন্তু যে ধীরগতি চলচ্চিত্রণের সাহায্যে কুঁড়ি থেকে ফুল ফুটানো কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা স্বচক্ষে দেখতে পারি তা কোষ নিরীক্ষণেও প্রযোজ্য।

আজকাল অবশ্য জ্যান্ত কোষের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আণুবীক্ষণিক সংস্থাসমূহ এবং এমন কি এর জীবনী চলচ্চিত্রণও সম্ভবপর। কিন্তু এটি প্রযুক্তিবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক সাফল্য। এক শতাব্দী আগে কোষ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান যখন শৈশব অতিক্রম করে নি, তখন আদিম অণুবীক্ষণই ছিল বিজ্ঞানীদের একমাত্র হাতিয়ার।

সাধারণ অনুবীক্ষণের সাহায্যে জীবন্ত কোষের ভেতরে তেমন কিছুই দেখা যায় না। দৃশ্যত তখন একে শূন্যগর্ভ মনে হয়, যেন একটি স্থলীমাত্র — ভেতরে কিছুই নেই। কিন্তু কেন?

আমাদের চারিদিকের জগৎ বর্ণাঢ্য ও বিচিত্র। বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন পর্যায়ের আলোক শোষণের মধ্যেই এর কারণ নিহিত। দৃশ্যমান সকল রশ্মিই কাচ অতিক্রম করে তাই সদ্যধৌত জানালার কাচ আমরা চোখে দেখি না। কিন্তু যথেষ্ট পরিষ্কার অবস্থায়ও রঙিন কাচ চোখে পড়ে, কারণ সকল প্রকার রশ্মির পক্ষেই তা ভেদ্য নয়।

কোষাভ্যন্তর আমাদের চোখে পড়ে না কারণ এর সকল অংশই সমস্বচ্ছ। তাহলে কী করণীয়? কাচের মতো সহজেই একেও আমরা রঙিন করতে পারি এবং তা সমগ্র কোষ অথবা প্রয়োজনমতো এর অংশ বিশেষকে।

কিছু কাল আগেও এছাড়া কোষাংশ নিরীক্ষণের অন্য উপায় ছিল না। এবং অণুবীক্ষণের জন্য এর প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি প্রক্রিয়াও যথেষ্ট জটিল ছিল।

জীবন্ত কোষ বাহ্যবস্তুর অনুপ্রবেশ প্রতিহত করে। সুতরাং এর জীবিতাবস্থার গঠন অটুট রেখে একে মেরে ফেলা চাই। সেজন্য বিবিধ বিরল পদার্থের মিশ্রণ ব্যবহার্য, কখনো কখনো যা মহার্ঘ। অস্মিক এসিডের দৃষ্টান্তই ধরা যাক, সোনার চেয়েও তা কয়েক গুণ দামী। কোষ হনন পদ্ধতির নাম স্থিরীকরণ বা ফিক্সেশন। এর পর স্থিরীকৃত প্রাণী বা উদ্ভিদের নমুনাকে একের পর এক দ্রবণে ক্রমপর্যায়ে নির্দিষ্ট সময় ধরে ডুবিয়ে রাখতে হয়। এবার প্রস্তুতকৃত নমুনাটিকে গলিত প্যারাফিন-মোমে ডুবিয়ে সম্পূর্ণ সম্পৃক্ত করলেই কাজটি সম্পন্ন হয়।

অতঃপর টুকরো কাটার সর্বাধিক দায়িত্বপূর্ণ কাজের পালা। নমুনাবন্দী মোমখণ্ডকে তখন পাতলা, সম্পূর্ণ সুসম, এক মিলিমিটারের কয়েক সহস্রভাগের এক ভাগ পুরু টুকরো করে কাটা হয়। হাত দিয়ে কাজটি করা অসম্ভব। কিন্তু টুকরো কাটার বিশেষ যন্ত্র মাইক্রোটম রয়েছে। অবশ্য ভাল টুকরো কাটার জন্য মাইক্রোটমই যথেষ্ট নয়। যদি নমুনা সঠিকভাবে মোমবন্দী না হয়, খুর ভোতা কিংবা মাইক্রোটম খারাপ থাকে তবে মোম ফেটে অথবা ভেঙ্গে যাবে এবং পরীক্ষা ব্যর্থ হবে।

অবশেষে টুকরো প্রস্তুত (অবশ্য অধিকাংশই অকেজো হয়) হলে এর রঙ করা প্রয়োজন হয়। রঞ্জক ব্যবহারের দুটি পদ্ধতি প্রচলিত। কোন রঙে কোষের যথানির্দিষ্ট অংশই শুধু রঙিন হয়, এতে রঙ ঢোকে, অন্য রঙ উপরিতলে ছড়িয়ে পড়ে। কাচের স্লাইডের উপর অতি সূক্ষ্ম ঐ টুকরোগুলো রেখেই রঙ করার নিয়ম। প্রথমত, বিশেষ পদ্ধতিতে মোম সরানো হয়, তারপর একটি রঙ ঢালা, কখনো বারকয়েক দ্রাবক পরিবর্তন এবং শেষে ব্যামিশ্রণ ও বিরঞ্জন... প্রতিবার এক-এক রকম তরল পদার্থ ব্যবহৃত হয় এবং তার যেকোনটিই কষ্টকৃত টুকরোটিকে সহজেই ভাসিয়ে দিতে পারে। শেষে রঙ করা টুকরোটি দুটি স্লাইডের মাঝখানে স্বচ্ছ রজনের একটি প্রলেপের মধ্যে আটকে রাখা হয়। রজন শুকালেই তবে নমুনাটি অণুবীক্ষণে দেখার উপযুক্ত হয়। সমগ্র প্রক্রিয়াটির জন্য প্রয়োজন কমপক্ষে কয়েক দিন কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে কয়েক সপ্তাহ।

অবশ্য অভিজ্ঞ কর্মীরা ভাল টুকরো কাটেন, কাজের সময় দ্রাবকে এটি হারিয়ে ফেলেন না। কিন্তু সেজন্য প্রয়োজন দীর্ঘ অভ্যাস।

মৃত কোষের বিবিধ টুকরো দিয়ে অল্পক্ষণে কোষের জীবনচিত্র দেখানো কী করে সম্ভব? চলচ্চিত্রেও কিন্তু সত্যিকার চলার কোন ব্যাপারই থাকে না।

ক্রমবিনস্ত পৃথক পৃথক স্থির চিত্র দ্রুত গতিতে পরস্পরকে অনুসরণ করলেই আমরা চলচ্চিত্রের অনুভূতি প্রত্যক্ষ করি। কোষতাত্ত্বিকেরা এই সেদিনও তাই করত। তারা কোষকে মেরে ফেলে, রঙ করে, আণুবীক্ষণিক স্লাইড তৈরি করে এবং অতঃপর কোষের জীবনচক্রের বিবিধ পর্যায় অনুসন্ধানের পর পারস্পরিক তুলনাক্রমে এদের একটি পারম্পর্য আবিষ্কার করে ছবিগুলি ক্রমবিন্যস্ত করে। কাজটি তেমন কিছু দুরূহ নয়।

ক্রমোসোমের নৃত্যকলা

বংশানুসৃতিতে ক্রমোসোমের ভূমিকা অনন্যসাধারণ। নিউক্লিয়াসস্থিত সূত্রাকার এই অবয়বসমূহ সহজেই নানা রঞ্জকে রঙ করা যায় (তাই এ নামকরণ)। এদের আবিষ্কারক কে? সর্বপ্রথম কে এদের গুরুত্ব নির্ণয় করেন? এর উত্তর সহজ নয়। উত্তর দেয়ার প্রয়োজন আছে কি?

ওয়াল্‌ডেয়ারই এদের ক্রমোসোম নামে চিহ্নিত করেন। কিন্তু তাঁর আগেই এরা আবিষ্কৃত হয়েছিল। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগেই হফ্‌মাইস্টারই সর্বাগ্রে কোষচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ের সঠিক পারম্পর্য নির্ণয় করেন। কিন্তু তিনি যথার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পরেন নি। জীবন্ত কোষ সম্পর্কিত আধুনিক তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাকাল গত শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশ এবং স্ট্রাস্‌বার্গার ও চিস্তিয়াকভ, ফ্লেমিং ও নাভাশিন, হের্ট্‌ভিগ, পেরেমেঝ্‌কো, ওয়াল্‌ডেয়ার, বিউচ্‌লি এবং অন্যান্যদের গবেষণাই এর উৎস। সার্বিক প্রক্রিয়াটির অংশবিশেষ তাঁদের গবেষণায় সম্যকভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। ক্রমে ঐ ভগ্নাংশ থেকেই অবয়ব পেয়েছে একটি সম্পূর্ণ মোজাইক। প্রসঙ্গত পুনরুল্লেখ্য, উক্ত কার্যাবলী মেণ্ডেল লিখিত বিখ্যাত ঐতিহাসিক নিবন্ধ রচনার পরবর্তীকালীন ঘটনা।

এখন কোষকে না মেরে জীবন্ত অবস্থায়ই এদের পর্যবেক্ষণ সম্ভবপর। ফেজ-কণ্ট্রাস্ট অণুবীক্ষণের সাহায্যে আমরা রঞ্জক ছাড়াই কোষাভ্যন্তর নিরীক্ষণ করতে পারি। তাছাড়া শ্লথ গতি ব্যবহার করে তা থেকে চলচ্চিত্র নির্মাণও সহজ। আজকাল এমন চলচ্চিত্র সুলভ।

আমাদের চোখের সামনে এখন প্রটোপ্লাজ্‌ম নামক আঠাল পদার্থপূর্ণ একটি স্থলী এবং এর ভেতর নানা আকারের বস্তুকণা ভাসমান। এদের প্রকৃতি আলাদা, কার্যকলাপ আলাদা। তন্মধ্যে দুই ধরনের কণিকার তাৎপর্য

সর্বাধিক: মাইটোকণ্ড্রিয়া ও মাইক্রোসোম। মাইটোকণ্ড্রিয়া আয়তাকার ও স্তরিত অবয়ববিশেষ। এরাই কোষের 'পাওয়ার হাউস'। এদের ভেতরেই 'জ্বালানি জ্বলে'। খাদ্যবস্তুর জারণ মাধ্যমে পাওয়া শক্তি ভবিষ্য উপাদানরূপে এখানেই সংরক্ষিত থাকে এবং এডিনোসিন্‌ট্রাইফসফরিক এসিডের (Ade*nosintriphosphoric acid)* অণু নির্মিত হয় (এগুলো রাসায়নিক শক্তি সঞ্চয়ের ব্যাটারিবিশেষ, কোষের যেখানে যখন প্রয়োজন সেখানেই তা থেকে শক্তি ক্ষরিত হয়)। মাইক্রোসোম আকারে ক্ষুদ্রতর। এগুলো প্রোটিন অণু তৈরির আণুবীক্ষণিক কারখানা। স্মরণীয়, প্রোটিন জীবনের অপরিহার্য মৌলিক অনুষঙ্গ।

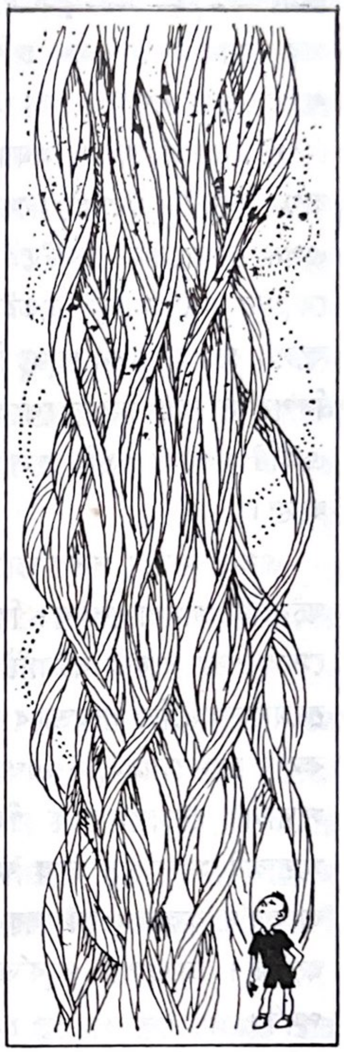

এখন আমাদের নজর আর প্রটোপ্লাজ্‌মিক কণিকার দিকে নয়। কোষের প্রায় কেন্দ্রস্থলে গোলাকার বেশ বড় আকারের যে অবয়বটি পরিদৃষ্ট তাই কোষ নিউক্লিয়াস। এটি ঝিল্লি-আবৃত এবং কোষের মতোই আঠাল পদার্থে পূর্ণ। আঠাল এই পদার্থটি কেরিওপ্লাজ্‌ম। নিউক্লিয়াসের ভেতরে ক্ষুদ্রতর গোলাকার একটি অবয়ব অবস্থিত। এর নাম নিউক্লিয়লাস। কিন্তু যে ক্রমোসোম সম্পর্কে মূলত আমরা উৎসাহী তারা কোথায়? তাদের এখনো দেখা যাচ্ছে না, তবে পর্দায় শীঘ্রই তাদের দেখা যাবে। কোষ এখন যে পর্যায়ে আছে ভুলক্রমে তাই বিরামাবস্থা হিসেবে চিহ্নিত। বস্তুত কোষের বিপাকক্রিয়ার পক্ষে এই-ই সক্রিয়তম কাল। ক্রমোসোমের আকৃতি তখন সূক্ষ্ম সূত্রবৎ এবং শুধু ইলেকট্রন অণুবীক্ষণেই দর্শনীয়।

কোষ বিভাগের পূর্বক্ষণে দীর্ঘ, সূক্ষ্ম ক্রমোসোমসমূহ দেহ গুটিয়ে খাটো ও স্ফীত হয়ে থাকে। তখন সাধারণ আলো-অণুবীক্ষণেও তাদের দেখা যায়। এখন পর্দায় তারা স্পষ্টতর। অস্পষ্ট সীমারেখা চিহ্নিত অজস্র সূত্রাকার

অবয়বসমূহে নিউক্লিয়াস এখন পরিপূর্ণ। দীর্ঘাকৃতি ক্রোমোসোমগুলি পরস্পরের সঙ্গে এমন জড়িয়ে আছে যে, কোথায় এদের শেষ আর কোথায় শুরু বোঝা দুষ্কর। এরা শ্লথগতি। ক্রমে এরা মোটা, খাটো এবং স্পষ্টতর হচ্ছে।

ক্রোমোসোম দেখার সময় আমরা কোষে সংঘটিত দুটি মৌলিক পরিবর্তন লক্ষ্য করি নি। এরই মধ্যে নিউক্লীয় ঝিল্লি ও নিউক্লিয়লাস অদৃশ্য হয়েছে। এখন ক্রোমোসোম স্পষ্টতই প্রটোপ্লাজ্মে বিক্ষিপ্ত। তারা যথেষ্ট খাটো এবং কোষের মাঝামাঝি একই তলে বিন্যস্ত, কোষতাত্ত্বিকরা যাকে বিষুবতল বলে। আমরা এখন শুধু বিষুবাঞ্চলই নয় মেরুদুটিও দেখতে পাচ্ছি। কোষের বিপরীত দুই বিন্দু থেকে উদ্ভূত সূত্রালী দ্বারা এখন তর্কুর আকৃতিবিশিষ্ট একটি সংস্থান তৈরি হল। সূত্রালীগুলি ক্রোমোসোমের নির্দিষ্ট বিন্দুর সঙ্গে যুক্ত।

এখন আমরা সতর্কভাবে অপেক্ষা করি। অল্পক্ষণের মধ্যেই সবচেয়ে সেরা ঘটনাটি আমরা দেখব। কিন্তু বাস্তব জীবনের চেয়ে অনেক দ্রুত, মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ঘটনাটি পর্দায় ঘটে যাবে। চেয়ে দেখুন, নিরন্ধ্র দণ্ডাকৃতি ক্রোমোসোমগুলি লম্বভাবে বিভক্ত হয়ে সংখ্যায় দ্বিগুণ হয়েছে। সমান্তরালস্থিত কন্যা ক্রোমোসোমদুটি এখনো একটি বিন্দুতে পরস্পরসংলগ্ন যেখানে তর্কুর সূত্রালী ক্রোমোসোমকে বিদ্ধ করেছিল। এখন তর্কু সক্রিয় হয়েছে। এর সূত্রালী সঙ্কুচিত হয়ে কন্যা ক্রোমোসোমদুটিকে দুই বিপরীত মেরুর দিকে আকর্ষণ করছে। কোষের দুই বিপরীত প্রান্তে দুই দল ক্রোমোসোমের উদ্ভব ঘটেছে। অতঃপর পূর্বতন বিষুবতলে দেখা দিচ্ছে কোষবিভাজক একটি পর্দা।

এর পরই মনে হয় চলচ্চিত্র যেন পেছনে চলতে শুরু করেছে। নিউক্লীয় ঝিল্লি ও নিউক্লিয়লাসের পুনরাবির্ভাব ঘটল, ক্রোমোসোম সর্পিল আকৃতি হারিয়ে ক্রমেই অদৃশ্য হল। আমাদের সামনে এখন দুটি কোষ, পূর্বতন কোষের অবিকল দোসর।

অর্ধ-বিভাজন প্রক্রিয়া

চলচ্চিত্রের দ্বিতীয় পর্বের আগে বিভাজনকালীন কয়েকটি কোষের আণুবীক্ষণিক আলোকচিত্র দেখা যাক।

প্রথমে আমরা একই ধরনের কোষ, যেমন মটরশুঁটি কোষের আলোকচিত্র

লক্ষ্য করি। আমরা জানি মেন্ডেল মটরশুঁটি থেকেই বংশানুসৃতির নিয়মাবলী আবিষ্কার করেছিলেন। যদিও কোষগুলি বিভিন্ন নমুনার বিভিন্ন অংশ থেকে সংগৃহীত তবু এদের প্রত্যেকেরই ক্রমোসোম সংখ্যা ১৪। আমরা যদি সতর্কতার সঙ্গে পরীক্ষা করি তবে দেখব এরা ৭টি বিভিন্ন দলে বিভক্ত অর্থাৎ এরা সজোড়। সকল মটরশুঁটির ক্ষেত্রেই এ বাস্তবতা অভিন্ন। এদের প্রত্যেকের সাত প্রকার ক্রমোসোমই নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, খাঁজের অবস্থান এবং গঠনের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যে সুচিহ্নিত।

এখন বিভিন্ন প্রজাতিতে ক্রমোসোমের সংখ্যা তুলনা করা যাক। এখানে পার্থক্যের পরিসর বহুবিস্তৃত। মানুষ, ভুট্টা, হেপ্লোপেপাস গ্রাসিলিস *(Haplopapus gracilis)*-এর কোষ প্রতি ক্রমোসোম সংখ্যা যথাক্রমে ৪৬, ১০ ও ২। প্রত্যেক প্রজাতিরই ক্রমোসোম সংখ্যা নির্দিষ্ট, যুগ্মসংখ্যক এবং সজোড় হিসেবে চিহ্নিত।

কোষবংশাণুবিদরা তাই বলেন যে, প্রতি প্রজাতির কোষে সজোড় ক্রমোসোমের সংখ্যা নির্দিষ্ট। কিন্তু যৌনকোষ নিয়মের ব্যতিক্রম।

পর্দায় এখন প্রথম পর্বের অনুরূপ একটি কোষ। কিন্তু এর বিভাগের ফলে জন্মাবে যৌনকোষ — শুক্রাণু বা ডিম্বাণু। আমাদের সামনে যে প্রক্রিয়া পরিস্ফুটমান তা পূর্বপ্রদর্শিতেরই অনুসারী। অবশ্য এখানে প্রারম্ভিক পর্যায় অনেক ধীরগতি যদিও ছবি উভয় ক্ষেত্রেই একই গতিতে গৃহীত। ক্রমোসোম এরই মধ্যে স্থূল ও খাটো হয়ে গেছে, এখনো তারা বিষুবতলে সারিবন্দী নয়।

এর বদলে তারা জোড়ায় জোড়ায় একত্রিত হচ্ছে। প্রত্যেক ক্রমোসোমই তার জুড়ি খুঁজছে, পরস্পরকে কাছে টেনে প্রায় মিশে যাচ্ছে। আমরা তাদের এখন একটি সত্তা রূপেই দেখতে পাচ্ছি। কিছুক্ষণ পরই তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করবে। কিন্তু তা সহজ হবে না। দেখুন তারা পরস্পরের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে আটকে আছে এবং বিচ্ছিন্ন হবার চেষ্টায় ফাঁস তৈরি করছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পরস্পরাবদ্ধ অবস্থায় সকল ক্রমোসোমই তাদের দেহাংশ বিনিময় করে। এভাবেই তারা পরস্পরের সঙ্গে 'মস্তক' ও 'পুচ্ছ' বদল করে নতুন হয়ে ওঠে।

যাঁরা আমাদের চলচ্চিত্রটি দেখছেন তাঁদের মধ্যে পদার্থবিজ্ঞানীরাও হয়ত আছেন। যেসব পদার্থবিজ্ঞানী জীববিদ্যায় উৎসাহী তাঁদের জন্য

কোষবিভাগ, বিশেষভাবে যৌনকোষের বিভাগ একটি অত্যাকর্ষী গবেষণার প্রকল্প হতে পারে। ক্রমোসোম ও তাদের অংশের মধ্যে সুচিহ্নিত মিথষ্ক্রিয়ার বহুবিধ শক্তি বিদ্যমান। এদের প্রকৃতি কী? আজও আমরা তা জানি না।

কোষবিভাগের পূর্ববর্তী প্রক্রিয়া অতি দীর্ঘস্থায়ী। এর পরপরই দু-দুটি কোষবিভাজন অবিচ্ছিন্নভাবে সংঘটিত হয় এবং ক্রমোসোমরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। এরই ফলে দুবার কোষবিভাগের মধ্যে ক্রমোসোম বিভাজন ঘটে মাত্র একবার। তাই নবজাত চারটি কোষে ক্রমোসোম সংখ্যা হবে সেই সাধারণ দেহকোষের ক্রমোসোম সংখ্যার অর্ধেক। সাধারণ কোষে প্রত্যেক ধরনের দুটি ক্রমোসোম থাকে (তথাকথিত পূর্ণ প্রস্ত) এবং পক্ক যৌনকোষের থাকে মাত্র একটি করে ক্রমোসোম (অর্ধ প্রস্ত)। তথ্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পক্ক যৌনকোষে ক্রমোসোম সংখ্যা অর্ধেক না হলে আমাদের গ্রহে জীব, বিশেষভাবে উন্নততর জীবের অস্তিত্ব অসম্ভব হত। কেন, এর কারণ শীঘ্রই জানা যাবে।

কোষরাজ্য ছেড়ে যাবার আগে নিষেক প্রক্রিয়ায় কী ঘটে তাই বারেক দেখা যাক।

ইয়োশেফ কোল্‌রয়টার দুই শতাব্দী আগে উদ্ভিদের ভ্রূণোৎপাদনে পরাগরেণুর অপরিহার্যতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত করেছিলেন। এর বছর বিশেক পরে ইতালীয় নিসর্গী লাজারো স্পালান্‌ৎসানি প্রাণীদের মধ্যেও প্রক্রিয়াটির অস্তিত্ব প্রমাণিত করেন। ভ্রূণসৃষ্টিতে সূত্রাকার শুক্রকোষ (শুক্রাণু) যে অপরিহার্য তিনি তা লক্ষ্য করেছিলেন। কিন্তু নিষেক প্রক্রিয়ায় এদের সুনির্দিষ্ট ভূমিকা তাঁর অজ্ঞাত ছিল। তখন এরূপ ধারণা প্রচলিত ছিল যে শুক্রাণু ডিম্বাণুকে শুধুমাত্র বিভাজনেই উদ্দীপ্ত করে। অবশেষে গত শতাব্দীর শেষ পাদে যথার্থ সত্য ঘটনা আবিষ্কৃত হয়।

ঘটনাটি এরূপ: একটি শুক্রাণু ডিম্বাণুকে বিদ্ধ করে এবং ঝিল্লি, স্কন্ধাংশ ও পুচ্ছ হারিয়ে কেবলমাত্র নিউক্লিয়াস নিয়ে এর ভেতরে প্রবিষ্ট হয়। শুক্রাণু ও ডিম্বাণু এই দুটি নিউক্লিয়াসযুক্ত একটি কোষের উদ্ভব ঘটে। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে, এদের প্রত্যেকের ক্রমোসোম সংখ্যা স্বাভাবিক দ্বিগুণ সংখ্যার অর্ধেক। অতঃপর নিউক্লিয়াসদুটি পরস্পরপিষ্ঠ হয়। এর ফলাফল সহজবোধ্য: দ্বিগুণসংখ্যক ক্রমোসোমধারী একটি স্বাভাবিক

নিউক্লিয়াসের উদ্ভব। নবজাত কোষ (একে ভ্রূণাণু বলা হয়) বহুবার বিভক্ত হয়, ভ্রূণ জন্মে এবং ক্রমে তার জীবদেহে রূপান্তরণ ঘটে।

এই তো কোষবংশাণুবিদ্যার মৌলিক তথ্যাবলী। এ বিজ্ঞান ব্যতীত আধুনিক বংশাণুবিদ্যার উদ্ভব কল্পনাতীত ছিল।

প্রকল্প থেকে তত্ত্ব

নিবিষ্টমনা পাঠকের মনে সম্ভবত এখন একটি সম্ভাবনাশীল চিন্তার ছায়া পড়েছে। আপনি হয়ত ভাবছেন, ইতিপূর্বে বিবৃত ক্রমোসোম কি মেণ্ডেলের ‘কল্পিত’ ‘উপাদান’ বা অধুনাখ্যাত জিনেরই সদৃশ সত্তা? বস্তুত কোষে এরা উভয়ই দ্বিগুণ সংখ্যায় বিদ্যমান। আর মেণ্ডেলীয় তত্ত্বানুসারে যেমন পিতৃ ও মাতৃ পক্ষ থেকে একটি করে এক-এক প্রকার জিন ভ্রূণে সঞ্চারিত হয় তেমনি এখানেও ভ্রূণাণু প্রত্যেক ‘পক্ষ’ থেকে একটি করে ক্রমোসোম লাভ করে। এই সাদৃশ্য এতই সুস্পষ্ট যে একে আপতিক বলা কঠিন।

স্বাভাবিক কোষ ও যৌনকোষের বিভাগ এবং নিষেক প্রক্রিয়ায় ক্রমোসোমের মৌলিক ভূমিকানির্ণয় যখন সুসম্পূর্ণ তখনও মেণ্ডেলের গবেষণা অজ্ঞাতই ছিল। তাঁর নিবন্ধ প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও এটি পড়ে দেখার অবকাশ কারো ছিল না।

অতঃপরই চূড়ান্ত নাটকীয় এক ঘটনার উদ্ভব। তীক্ষ্ণবুদ্ধি গবেষকরা মেণ্ডেলের প্রকল্প সম্পর্কে কিছু না জেনেও ক্রমোসোমের অদ্ভুত স্বভাব সম্পর্কে পর্যালোচনার প্রয়াস পান। ক্রমোসোমের বস্তুসম্ভার পুনর্বিন্যাসের জন্য জীবন্ত কোষের সূক্ষ্ম ও অতি নিখুঁত এই প্রক্রিয়াটি তাঁদের চোখে পড়েছিল। প্রতি কোষের ক্রমোসোম সংখ্যা অভিন্ন। সন্তানের ক্রমোসোম সংখ্যাও একই এবং এর অর্ধেক পিতৃপক্ষ এবং অর্ধেক মাতৃপক্ষ থেকে পাওয়া। প্রক্রিয়াটি কোনক্রমেই জুয়া খেলার ব্যাপার নয়, বাজীর মূল্য এখানে অত্যধিক। অবস্থা দেখে মনে হয় প্রক্রিয়াটি যেন অতি গুরুত্বপূর্ণ কোন কর্মকাণ্ডের অনুষঙ্গ। সুতরাং মেণ্ডেলের গবেষণা সম্পর্কে কিছু না জেনেই শতাব্দীর শেষ পাদে তাঁরা বংশানুসৃত চারিত্র্য পরিবহণে ক্রমোসোমের মুখ্য ভূমিকা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছিলেন।

উপরোক্ত প্রকল্পলগ্ন অন্যান্য সাক্ষ্যও ততদিনে সহজলভ্য। বিজ্ঞানপূর্ব কাল থেকেই আমরা বংশানুসৃতিতে পিতৃ ও মাতৃ পক্ষের সম-অবদান সম্পর্কে অবহিত। সন্তান সমপরিমাণে পিতা ও মাতার সদৃশ হতে পারে। কিন্তু ডিম্বাণু বৃহত্তম কোষ। বস্তুত মুর্গীর ডিম একটি ডিম্বাণু মাত্র। পক্ষান্তরে শুক্রাণু ক্ষুদ্রতম কোষ। স্ত্রীবীজকোষ (দৃষ্টান্তস্বরূপ, মানুষের ডিম্বাণু উল্লেখ্য) পুংবীজকোষ (শুক্রাণু) থেকে ৮০,০০০ গুণ বড়। পাখীদের মধ্যে পার্থক্যটি প্রকটতর। দৃষ্টান্ত হিসেবে পূর্বোক্ত মুর্গীর ডিম স্মরণীয়। এখানে স্ত্রীবীজকোষ পুংবীজকোষ থেকে অন্যূন এক লক্ষ কোটি গুণ বৃহৎ। বলা বাহুল্য পার্থক্যের পরিমাণ এখানে যথার্থই কল্পনাতীত। আর উটপাখীর সম্পর্কে? কোষের আয়তনগত এ পার্থক্যের সঙ্গে বংশানুসৃতিতে উভয় পক্ষের সম-অবদানের প্রত্যয়কে তো সঙ্গতিপূর্ণ মনেহয় না।

কিন্তু কোষাভ্যন্তর সম্পর্কে অধিকতর জানলেই দেখা যাবে কোষের আয়তন অপেক্ষা নিউক্লিয়াসের আয়তন স্বল্প পরিবর্তনীয়। আর প্রজাতিবিশেষের প্রত্যেক কোষেরই ক্রমোসোমগুলি সদৃশ। বংশানুসৃতি যে ক্রমোসোমভিত্তিক কিংবা এদেরই মধ্যে 'বংশানুসৃতির উপাদান' যে নিহিত এই বাস্তবতা আনুষঙ্গিক নজির হিসেবে কি নতুন নয়?

মেণ্ডেলের প্রকল্প না জেনেও এই ঘটনা এবং আরো কিছু তথ্যের ভিত্তিতে বহু বিজ্ঞানী দৃঢ়বিশ্বাসে বংশানুসৃতিতে ক্রমোসোমের অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা ঘোষণা করেন। সুতরাং মেণ্ডেলের নিয়মাবলী

পুনরাবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মেণ্ডেলের কাল্পনিক 'উপাদান' ও ক্রমোসোমের ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অবশ্য ক্রমোসোমের ভূমিকা ইতিপূর্বেই অনেকের মনে এরূপ 'আশঙ্কা' জাগিয়েছিল।

১৯০২ সালের মধ্যে আমেরিকার 'সায়েন্স' সাময়িকীতে 'বংশানুসৃতির মেণ্ডেলীয় নিয়মাবলী ও যৌনকোষের পরিপক্কতা' নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এর লেখক ই. বি. উইলসন। তাঁর প্রখ্যাত 'কোষের বিকাশ ও বংশানুসৃতি' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯০০ সালে। উইলসনই বিষয়টি সম্পর্কে চরম রায় দিলেন: জিনরা কোষ নিউক্লিয়াসের ক্রমোসোমেই অবস্থিত। যেহেতু ক্রমোসোমের ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য জিনবাহকের অনুরূপ সুতরাং তা মেণ্ডেলীয় প্রকল্পমুখী হওয়াই স্বাভাবিক এবং ফলত তা বিস্ময়করভাবে সত্যায়িত। মেণ্ডেলের 'উন্মদ প্রকল্প' অতঃপর তত্ত্বে পর্যবসিত হয় এবং দেখা দেয় বংশানুসৃতির ক্রমোসোম তত্ত্ব।

বংশানুসৃতির ক্রমোসোম তত্ত্বেই বংশাণুবিদ্যার বাস্তব ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং এ বিদ্যার অধিকতর উন্নয়নে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বংশানুসৃতির যেকোন নিয়মের পক্ষেই ক্রমোসোম সম্পর্কিত তথ্যাদির সংলগ্নতা অতঃপর অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াল। বিগত শতাব্দীর শেষ পর্যায়েও অব্যাহত তৎকালীন বংশানুসৃতির কাল্পনিক তত্ত্বাবলীর এখন অবসান ঘটল।

শুরুতে সবকিছুই স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে চলল। বিবিধ জীবজন্তু এবং নানা চারিত্র্যের উপর পরীক্ষাক্রমে মেণ্ডেলীয় নিয়মাবলী ও বংশানুসৃতির ক্রমোসোম তত্ত্ব অবিসংবাদিতভাবে সত্যাখ্যাত হল। কিন্তু সকল বিজ্ঞানীই এ সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন না। কেউ কেউ এমন আপত্তি উত্থাপন করলেন যার উত্তর দেয়া কঠিন ছিল। জিন যদি ক্রমোসোমেই অবস্থিত থাকে তবে ক্রমোসোমের সংখ্যা এত কম কেন? যাদের কোষে শতাধিক ক্রমোসোম আছে এমন জীব দুর্লভ ব্যতিক্রম মাত্র। সাধারণত কোষের ক্রমোসোম সংখ্যা বিশ অথবা ত্রিশ। এদের মাধ্যমে এত অসংখ্য চারিত্র্যের ব্যাখ্যা কীভাবে সম্ভব?

কিন্তু ক্রমেই ক্রমোসোম তত্ত্বের বিরোধী তথ্যাদির আবিষ্কার শুরু হল। কখনো এদের আবিষ্কারক ছিলেন মেণ্ডেলবাদের গোঁড়া সমর্থকরাও। মেণ্ডেলবাদের প্রথম প্রবক্তাদের মধ্যে বেট্‌সন অন্যতম। প্রাণিজগতে মেণ্ডেলীয় নিয়মাবলীর প্রযোজ্যতা প্রমাণ তাঁরই অবদান। তিনি উদ্ভিদ নিয়েও পরীক্ষা করেন। তাঁর নির্বাচিত উপকরণ ছিল সেই ক্লাসিক মটরশুঁটি। কিন্তু কী আশ্চর্য, সেই একই মটরশুঁটি নিয়ে পরীক্ষা করেও মেণ্ডেলীয় তৃতীয়

বিধির সুস্পষ্ট বত্যয় তাঁর চোখে পড়ল। তিনি 'বেগুনী ফুল' ও 'দীর্ঘ রেণুধর' মিষ্টি মটরশুঁটির সংকরণ ঘটিয়ে দ্বিতীয় সংকর প্রজন্মে স্বাধীন পৃথকীভবনের দৃষ্টান্ত খুঁজে পেলেন না। এসব সন্ততিদের কোনটিই একই সঙ্গে এই দুটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হল না। তিনি পিতৃ বা মাতৃ পক্ষের একজনের এই যুগ্ম চারিত্র্য নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন যে শুরুতে এরা পৃথকীভূত হয় না। দ্বিতীয় সংকর প্রজন্মে সাধারণ পৃথকীভবনের অনুপাত ছিল ১:৩, একটি 'বেগুনী ফুল' ও 'দীর্ঘ রেণুধর' এবং তিনটি সাধারণ। এক চিন্তনীয় ঘটনা, তাই না? মেণ্ডেলীয় নিয়মাবলী ও জিনের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ উদ্রেকের পক্ষে এ-ই যথেষ্ট ছিল। ফলত কেউ কেউ অত্যন্ত দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে উঠলেন।

সন্দেহবাদীদের অন্যতম ছিলেন কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যার অধ্যাপক টমাস হাণ্ট মর্গান। তাঁর বয়স তখন চল্লিশোর্ধ্ব। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ বয়সেই মেণ্ডেল তাঁর আবিষ্কার সম্পূর্ণ করেন। কিন্তু মেণ্ডেলের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। মর্গান বিজ্ঞানী হিসেবে তখন সুপ্রতিষ্ঠিত। অবশ্য সত্যকথা, বংশানুসৃতি নিয়ে তাঁর উদ্বেগের কোন কারণ ছিল না। তাঁর ক্ষেত্র নিরীক্ষামূলক ভ্রূণবিদ্যা। সোনাব্যাঙের ডিমের পরিস্ফুরণ সম্পর্কিত মনোগ্রাফের জন্য তিনি তখন বিশেষ বিখ্যাত। উদ্দীপ্ত তরুণ কর্মীদের মুখে জিনের উচ্ছ্রিত প্রশস্তি শুনতে শুনতে তিক্তবিরক্ত হয়ে শেষে তিনি নিজেই সমস্যাটির মোকাবিলায় এগিয়ে এলেন।

পরীক্ষার জন্য অধ্যাপক মর্গান ফলের মাছিকেই (ড্রসোফিলা) ল্যাবরেটরির উপকরণ হিসেবে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

ক্ষুদ্র একটি গবেষকদল নিয়েই মর্গান ড্রসোফিলার বংশানুসৃতির নিরীক্ষা শুরু করেন। প্রথম থেকেই তাঁর সহকারী ছিলেন কেল্‌ভিন বি. ব্রিজেস। অল্পদিন পরই তাঁদের দলে এলেন জি. এইচ. মুলার ও এ. এইচ. স্টার্ট্‌ভেণ্ট। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছোট একটি ঘরে তাঁরা একসঙ্গে কাজ করলেন।

ড্রসোফিলার নির্বাচন খুবই ফলপ্রসূ প্রমাণিত হল। মেণ্ডেলের তৃতীয় বিধির আওতাভ্রষ্ট যুগ্ম চারিত্র্যের বহুসংখ্যক নজির তাঁরা এতে খুঁজে পেলেন। গবেষণা এগিয়ে দ্রুত চলল এবং তথ্যাদিও পুঞ্জীভূত হল বহু। তৃতীয় বিধিকে নাকচ না করে তাঁরা একটি নতুন নিয়মানুবর্তী বিন্যাস সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত করলেন। ড্রসোফিলা নিয়ে কাজ করার প্রথম চিন্তা মর্গানের মনে আসে ১৯০৯ সালে এবং ১৯১১ সালের মধ্যেই বাস্তব ঘটনার

স্বরূপ উন্মোচন শুরু হয়: চারটি দলে বিভাজ্য ড্রসোফিলার সকল চারিত্র্য অতঃপর অন্বয়ী দল হিসেবে চিহ্নিত হল। দেখা গেল, বিভিন্ন দলের মধ্যে সংকরণ ঘটালে সবকিছুই যথাযথভাবে মেণ্ডেলের তৃতীয় বিধির অনুসারী হয়। কিন্তু স্বদলভুক্ত চারিত্র্যের ক্ষেত্রে নিয়মের অদ্ভুত ব্যতিক্রম ঘটে, ঠিক যা বেট্‌সন কৃত 'বেগুনী ফুল' ও 'দীর্ঘ রেণুধর' মটরশুঁটির পরীক্ষায় ঘটেছিল। কিন্তু এই ব্যতিক্রম ড্রসোফিলায় রীতিবিশেষে কিংবা বলা যায় নিয়মে পর্যবসিত হল। এখন তা বংশাণুবিদ্যার অন্বয়ী নিয়ম নামে খ্যাত।

কিন্তু ক্রমোসোম? অতঃপর আর তাদের হেয় প্রতিপন্ন করা অসম্ভব হল। ড্রসোফিলার অন্বয়ী চারিত্র্যদলের সংখ্যা চার, তিনটি দীর্ঘ, বৃহৎ এবং একটি ক্ষুদ্র। ড্রসোফিলা মেলানোগেস্টার *(Drosophila melanogastez)* নামক এর একটি প্রজাতিই এখানে আলোচিত। পরীক্ষাক্ষেত্রে এটি বহুলব্যবহৃত। (এর অন্যান্য প্রজাতির অন্বয়ী চারিত্র্যদলের সংখ্যা অধিক এবং সে অনুসারে ক্রমোসোম সংখ্যাও বিভিন্ন।) অণুবীক্ষণে প্রতিটি ড্রসোফিলা কোষে চার জোড়া ক্রমোসোম দেখা যায়। এদের তিন জোড়া আকারে বিশাল কিন্তু চতুর্থ জোড়া ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। বহুগুণ বিবর্ধনেও ক্রমোসোমের চতুর্থ জোড়াকে বিন্দুবৎ মনে হয়।

সুতরাং অন্বয়ী দল এবং সজোড় ক্রমোসোমের সংখ্যা স্পষ্টতই পরস্পরান্বিত। আর আসলে তাই হওয়া উচিত। যদি কয়েকটি জিন একটি ও একই ক্রমোসোমে অবস্থিত থাকে তবে বংশানুসৃতিতে তাদের অন্বিত সঞ্চারণই তো স্বাভাবিক। স্বাধীন পৃথকীভবন এখানে প্রত্যাশিত নয়। কাজেই ভ্রান্ত প্রমাণিত না হয়ে বংশানুসৃতির ক্রমোসোম তত্ত্ব যথাযথভাবেই সত্যায়িত হল। বলা বাহুল্য, অগ্রগতির ক্ষেত্রে ঘটনাটি অত্যুল্লেখ্য।

ড্রসোফিলা পরীক্ষায় বহু 'বিস্ময়' উন্মোচিত হল। পাওয়া গেল বিবিধ অভূতপূর্ব ফলাফল। প্রসঙ্গত স্বাভাবিক লালচোখ মাছির সঙ্গে সাদাচোখ মাছির সংকরণের কথাই ধরা যাক। যখন স্বাভাবিক স্ত্রীদের সঙ্গে সাদাচোখ পুরুষ মাছির সংকরণ ঘটানো হয় তখন সবকিছুই 'মেণ্ডেলের নিয়মানুসারী': প্রথম সংকর প্রজন্মের সকলেই সদৃশ এবং দৃশ্যত মাতৃবৎ অর্থাৎ 'লালচোখ' প্রকট এবং 'সাদাচোখ' প্রচ্ছন্ন। তবে সন্ততিদের পরস্পর সংকরণে ফলাফলটি কিন্তু একেবারেই অভাবিত। সত্যকথা, এতে পৃথকীভবনের অনুপাত ৩:১ অর্থাৎ ৩টি লালচোখ ও ১টি সাদাচোখ। কিন্তু সর্বাধিক উল্লেখ্য ঘটনা: এদের কোন স্ত্রী মাছিই সাদাচোখ নয় আর অর্ধেক পুরুষ

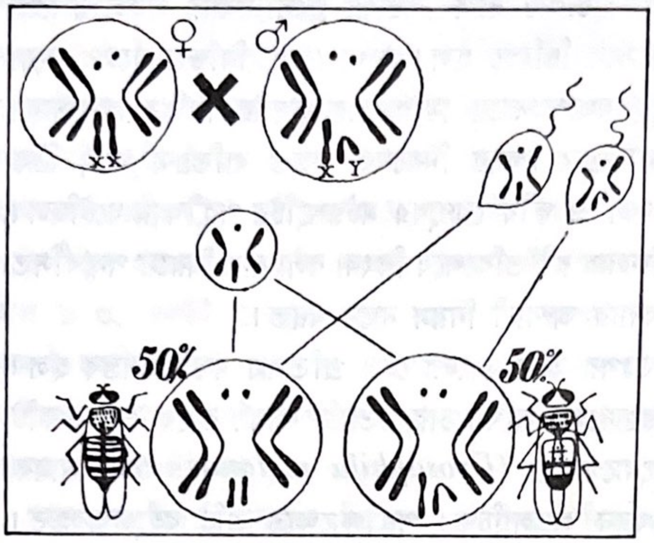

মাছিই লালচোখ, বাকীরা সাদা। সাদাচোখ স্ত্রী মাছির সঙ্গে লালচোখ পুরুষ মাছির সংকরণে অতঃপর আশ্চর্যতর ফল পাওয়া গেল। প্রথম প্রজন্মেই এতে সন্তানদের মধ্যে কোনই সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় নি এবং পৃথকীভবনের অনুপাতও হল অস্বাভাবিক — ১:১। এর অর্ধেক লালচোখ, অর্ধেক সাদাচোখ, এবং লালচোখ সবই স্ত্রী এবং সাদারা সবই পুরুষ।

চোখের রঙ নিয়ন্ত্রক জিনদের লিঙ্গলগ্নতার সিদ্ধান্তটি অতঃপর প্রায় অবধারিত। তাই এগুলো লিঙ্গান্বিত চারিত্র্য নামে চিহ্নিত। কীভাবে এদের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা সম্ভবপর? এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য আবার ড্রসোফিলার ক্রমোসোম নিরীক্ষণ প্রয়োজন। ড্রসোফিলার প্রতি কোষে (যৌনকোষ ব্যতিরেকে, কারণ সেখানে ক্রমোসোম সংখ্যা অর্ধেক) ক্রমোসোম সংখ্যা চার জোড়া, তিন জোড়া বৃহদাকার এবং এক জোড়া ক্ষুদ্রকায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্ত্রী এবং পুরুষের ক্রমোসোমে সামান্য পার্থক্য আছে। স্ত্রী মাছির প্রতি জোড়ার ক্রমোসোমদুটিই পরস্পর সদৃশ। কিন্তু পুরুষ মাছির তিন জোড়ায় নিয়মটি প্রযোজ্য হলেও চতুর্থ জোড়ায় (অথচ একে প্রথম জোড়াই বলা হয়) তার ব্যতিক্রম ঘটে। ওখানে ক্রমোসোমদুটি অসম। এদের একটি দণ্ডাকৃতি, অবিকল স্ত্রীদের ঐ ক্রমোসোমেরই মতো, কিন্তু অন্যটি অদ্ভুত ধরনের এবং ফণাকৃতি। ক্রমোসোমরা সংখ্যা দ্বারাই চিহ্নিত। কিন্তু প্রথম ক্রমোসোমজোড়ার তাছাড়াও আলাদা নিজস্ব নাম আছে। এদের দণ্ডাকৃতি ও ফণাকৃতি ক্রমোসোমদ্বয় যথাক্রমে *x* এবং *y* ক্রমোসোম নামে চিহ্নিত। এই ক্রমোসোমদুটি স্পষ্টতই

লিঙ্গনির্ধারক। ক্রমোসোমপুঞ্জে দুটি x থাকলে স্ত্রী এবং একটি x ও একটি y থাকলে পুরুষের জন্ম হয়।

কেন অধিকাংশ প্রজাতির সন্তানসংখ্যার অর্ধেক পুরুষ ও অর্ধেক স্ত্রী তার কারণ ব্যাখ্যা করা এখন সহজতর। ড্রসোফিলার সকল ডিম্বাণুই সদৃশ কিন্তু বিভিন্ন প্রকার ক্রমোসোম অন্তর্ভুক্তির ফলে শুক্রাণুগুলো পৃথক: এদের অর্ধেক x-এবং অর্ধেক y-ক্রমোসোমবাহী। সুতরাং কোন ধরনের শুক্রাণুতে ডিম্বাণু নিষিক্ত তার উপর স্ত্রী বা পুরুষ সন্তানের জন্ম নির্ভরশীল।

কিন্তু স্মরণীয়, সকল প্রজাতির লিঙ্গোদ্‌গম প্রক্রিয়া ড্রসোফিলার নিয়মাশ্রিত নয়। পাখীর ক্ষেত্রেই ঘটনাটি পুরো উল্টো। পক্ষিণীদের যৌনক্রমোসোম বিভিন্ন, তাদের ডিম দুই প্রকার। কিন্তু পুরুষদের যৌনক্রমোসোম অভিন্ন। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে লিঙ্গবিশেষের x-ক্রমোসোম দুটি কিন্তু বিপরীত লিঙ্গে একটি অথবা y-ক্রমোসোম অনুপস্থিত। তাছাড়া আরো জটিলতর অবস্থাও সম্ভবপর। মানুষের লিঙ্গোদ্‌গম প্রক্রিয়া ড্রসোফিলার অনুরূপ। সন্তানের লিঙ্গ পিতৃপক্ষেরই বংশানুসৃতি।

এবার আমরা লালচোখ আর সাদাচোখ মাছির প্রসঙ্গে ফিরছি। তাদের চোখের রঙ বহু জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং তারা নানা ক্রমোসোমে অবস্থিত। এদের একটি মাত্র জিনই এখন আলোচ্য। পরীক্ষা থেকে আমরা স্পষ্টতই জানি যে চোখের বর্ণনির্ধারক জিন x ক্রমোসোমে অবস্থিত, y ক্রমোসোমে নয়। লিঙ্গান্বিত বংশানুসৃতির গবেষণা লিঙ্গের চিরন্তন অনুপাতের রহস্য উন্মোচন করেছে তথা বংশানুসৃতির ক্রমোসোম তত্ত্বকে নতুন তথ্যে প্রামাণ্যতর করেছে। পৃথক ক্রমোসোমে অবস্থিত জিনের ক্ষেত্রেই শুধু মেন্ডেলীয় পৃথকীভবন রীতি বৈধ। স্বাধীন পৃথকীভবন রীতির ব্যতিক্রমগুলি আবিষ্কারের পরই সত্যটি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। মর্গান প্রতিষ্ঠিত অন্বয়ী বিধি একই ক্রমোসোমে অবস্থিত জিনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেসব জিন এই নিয়মাধীন নয় তাদের পরীক্ষা থেকে আমরা বংশানুসৃতির গভীরতর রহস্যের সন্ধান লাভ করি।

বংশানুসৃতির মানচিত্র

কল্পনায় ড্রসোফিলা নিয়ে আরো কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যাক। আমরা এমন মাছি নিই যা প্রাকৃতিক বন্য প্রকার থেকে দুটি বৈশিষ্ট্যে পৃথক:

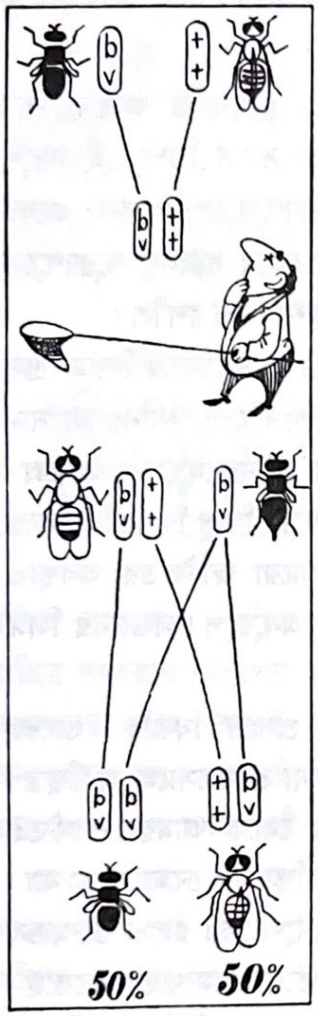

কালো দেহবর্ণ (আবলুস) ও অত্যধিক ক্ষীণপক্ষ (অবক্ষয়িত)। এদের সঙ্গে প্রাকৃতিক মাছিদের সংকরণ ঘটানো হল। চারিত্র্যদুটিই প্রচ্ছন্ন এবং আনুষঙ্গিক জিন দ্বিতীয় ক্রমোসোমে অবস্থিত। সুতরাং প্রথম প্রজন্মের সকল সন্ততিই স্বাভাবিক হবে কিন্তু অবগুপ্ত অবস্থায় (যখন অসমভ্রূণাণুজাত) প্রচ্ছন্ন জিন তাদের মধ্যে অবস্থান করবে।

এখন দ্বিতীয় সংকর প্রজন্মে আসা যাক। যখন সংকররা পরস্পরনিষিক্ত এবং উল্লিখিত জিনেরা অন্বয়ী তখন এর ফলে পৃথকীভবনের অনুপাত ৩:১ অর্থাৎ তিনটি প্রাকৃতিক মাছির স্থলে কেবল একটি জন্মাবে উভয় প্রচ্ছন্ন চারিত্র্য নিয়ে। বাস্তবেও তাই ঘটে। কিন্তু পরীক্ষাটি অন্যভাবেও সম্ভব। নিজেদের মধ্যে না ঘটিয়ে প্রচ্ছন্ন চারিত্র্যের পিতৃ না মাতৃ পক্ষের সঙ্গে এবার সংকরণ নিষ্পন্ন হল। একে পশ্চাদ্ নিষেক বা বিশ্লেষাত্মক নিষেক বলে। এর সুবিধা এতে সকল প্রচ্ছন্ন চারিত্র্যই প্রকাশিত হয়। ছবিতে সংকরণটি প্রদর্শিত এবং এতে ১:১ পৃথকীভবন চিহ্নিত অর্থাৎ সংকরোৎপন্ন ভিন্ন প্রকার যৌনকোষের অনুপাত যা তাই।

এভাবেই পৃথকীভবন সম্পন্ন হয়। আমরা যদি সংকর পুরুষদের সঙ্গে কালো ক্ষীণপক্ষ (অবক্ষয়িত) স্ত্রী মাছির সংকরণ ঘটাই তাহলে এই ফলাফলই অভিব্যক্ত হবে। কিন্তু যদি বিপরীতক্রমে সংকর স্ত্রীর সঙ্গে কালো ক্ষীণপক্ষ পুরুষ মাছির নিষেক নিষ্পন্ন হয় তবে নতুন এক প্রক্রিয়ার সন্ধান মিলবে। এবার প্রত্যেক প্রকার মাছির অনুপাত ৫০ শতাংশ না হয়ে ফলাফল হবে মোটামুটি এরূপ: স্বাভাবিক ৪১ শতাংশ (৫০ শতাংশের পরিবর্তে); কালো (আবলুস) ক্ষীণপক্ষ ৪১ শতাংশ (৫০ শতাংশের পরিবর্তে); কালো প্রশস্তপক্ষ ৯ শতাংশ, প্রকৃতিবর্ণ ক্ষীণপক্ষ ৯ শতাংশ।

সুতরাং আমরা যা আশা করেছিলাম তার সঙ্গে পেলাম 'ব্যতিক্রমী' কিছু মাছিও। আমাদের পরীক্ষায় তাদের সংখ্যা উল্লেখ্য: ১৮ শতাংশ।

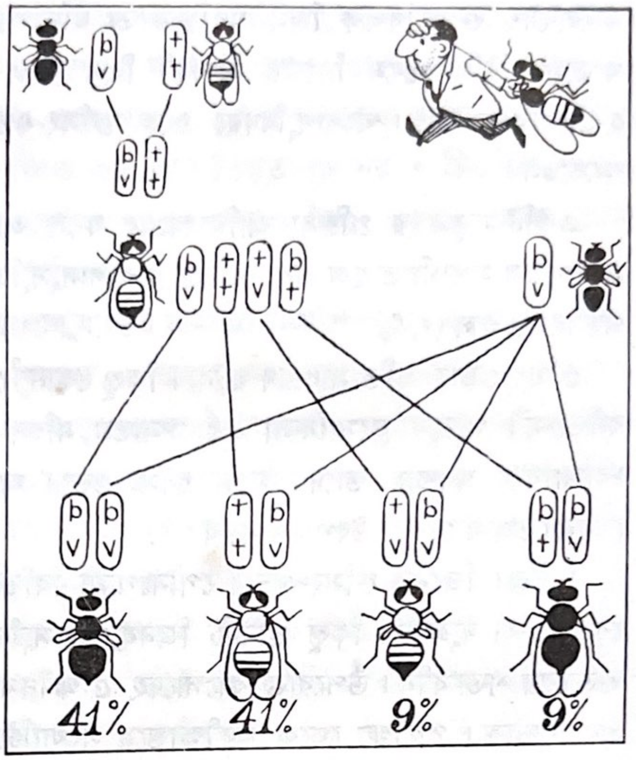

কেবলমাত্র কালো ক্ষীণপক্ষ মাছি নিয়ে পরীক্ষা করলেই এমন ফলাফল পাওয়া যায় না। স্ত্রী সংকর হলেই শুধু ‘ব্যতিক্রমী’দের সাক্ষাৎ মেলে: কখনো কম, কখনো বেশী। আমরা যদি হলুদদেহ আর সাদাচোখ চারিত্র্য নির্বাচন করি তবে ‘ব্যতিক্রমী’দের সংখ্যা হবে ১·৫ শতাংশ। কখনো এর অনুপাত নগণ্য, কখনো-বা তা ৫০ শতাংশ অবধি প্রকটিত। এতে মনে হয় অন্বয় এখানে সুসম্পূর্ণ নয়, কখনো দুর্বল, কখনো দৃঢ়বদ্ধ।

উক্ত ফলাফল থেকে ক্রমোসোম তত্ত্ব কি ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়? যদি দুটি জিন একই ক্রমোসোমে অবস্থিত থাকে তবে কি তাদের পুনর্বিন্যাস সম্ভব এবং যদি তাই হয় তবে কীভাবে? দেখা গেল, তা সম্ভবপর। এই অদ্ভুত প্রক্রিয়া আবিষ্কারের পূর্বেই এধরনের সম্ভাব্য পুনর্বিন্যাস সম্পর্কে মন্তব্যাদি প্রকাশিত হয়েছিল। মর্গান এবং তাঁর সহযোগীরা তাঁদের পরীক্ষায় পূর্বোক্ত ‘ব্যতিক্রমী’দের সনাক্ত করার আগেই যথাক্রমে ডাচ ও রুশ উদ্ভিদবিজ্ঞানী ডেভ্রিস এবং কল্‌ৎসোভ নিজ নিজ ছাত্রদের তা বলেছিলেন।

পরিপক্কতাকালীন যৌনকোষ বিভাজনের সময় কী ঘটে তা আবার স্মরণ করা যাক। সমগণীয় ক্রমোসোমদুটি (একটি পিতৃজ অন্যটি মাতৃজ) পরস্পরাভিমুখী ও পরস্পরলগ্ন হয় এবং অংশবিনিময় করে। সুতরাং যেখানে

কালোদেহ ও ক্ষীণপক্ষ জিন অবস্থিত তা যদি স্বাভাবিক ক্রমোসোমের সঙ্গে খণ্ডাংশ বিনিময়ক্রমে নিজের অন্বয়ী জিন বদল করে তবে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বংশাণুবিদরা একে 'ক্রসিং-ওভার' প্রক্রিয়া নামে চিহ্নিত করেছেন।

একটি নতুনতর প্রক্রিয়া আবিষ্কারের ফলে আর একবার ক্রমোসোম তত্ত্ব নবপর্যায়ে সত্যায়িত হল এবং চারিত্র্যের বংশানুসৃতি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানও গভীরতর হল।

ক্রসিং-ওভার অতি সাধারণ ঘটনা। কিন্তু কোন্ কোন্ প্রজাতি এই নিয়মের ব্যতিক্রম। পুরুষ ড্রসোফিলা এর অন্যতম নজির এখন আমরা তা জানি। স্বাভাবিক অবস্থায় তাদের মধ্যে ক্রসিং-ওভার ঘটে না। কিন্তু কৃত্রিমভাবে, যেমন তেজাঘাতে তা উৎপাদন সম্ভব।

বিভিন্ন জিনের ক্রসিং-ওভার পৌনঃপুন্য বিভিন্ন। কোথাও এটি বহুতর, কোথাও-বা দুর্লভ। কিন্তু প্রতিটি জিনযুগল সুনির্দিষ্ট পৌনঃপুন্যে ক্রসিং ওভারের শর্তাধীন। উপরোক্ত কালোদেহ ও ক্ষীণপক্ষ ১৮ শতাংশ 'ব্যতিক্রমী' এর দৃষ্টান্ত। পরীক্ষা থেকে পরীক্ষান্তরে সংখ্যাটির সামান্য পরিবর্তন ঘটে। অবশ্য এ পরিসংখ্যানের নিয়মসিদ্ধ। অধিকসংখ্যক মাছির পরীক্ষায় ফলাফলের অঙ্ক প্রায় অপরিবর্তিত থাকে।

কিছু কাল পরে বংশাণুবিদরা ক্রসিং-ওভারকে একটি কার্যকরী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। ক্রসিং-ওভার রীতির মূল্যায়নের সময় মর্গানের সহকর্মীদের সামনে একটি উজ্জ্বল সম্ভাবনা হঠাৎ প্রকটিত হয়। এর উদ্ভব অনেকাংশে আপতিক। দৃষ্ট ফলাফলের তারতম্য এবং অন্য কিছু তথ্যের আনুকূল্যেই ব্যাখ্যাটির উদ্ভব। দেখা গেল, দুটি জিনের দূরত্ব যত বেশী ক্রসিং-ওভারের ফলে তাদের পৃথকীভূত হবার সম্ভাবনাও তত অধিক কিংবা এর বিপরীত। ঘটনাটি সত্য হলে ক্রসিং-ওভারের সাহায্যে অবশ্যই দুটি জিনের মধ্যবর্তী আপেক্ষিক দূরত্ব নির্ণয় সম্ভবপর। এ চিন্তাটি নিঃসন্দেহে আজগবি কিন্তু অত্যাকর্ষী। যা হোক তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োজন।

পরীক্ষার ফলে প্রকল্পটির যাথার্থ্য নির্ণীত হল। অঙ্কও ঠিক ঠিক মিলে গেল। যেমন, যদি জিন A এবং B-র ক্রসিং-ওভার ২ শতাংশ এবং B এবং C-র ক্ষেত্রে তা ৩ শতাংশ হয় তবে দেখা যায় A এবং C-র ক্রসিং-ওভার ৫ শতাংশ ক্রমোসোমেই ঘটে থাকে। বহুসংখ্যক পরীক্ষার ফলে অন্বয়ী দলের

(অর্থাৎ প্রতিটি ক্রমোসোমের) জিনসমূহ একটি শৃঙখলে আবদ্ধ হয়ে যায়। ক্রমোসোমকে সুতোয় গাঁথা জিনের মালা হিসেবে চিহ্নিত করার ধারণা তা থেকেই উদ্ভূত। ক্রমোসোমের সঙ্গে মালার তুলনা জনবোধ্য সাহিত্যে দীর্ঘদিন থেকেই প্রচলিত। এখন যদিও এর সংযুতিগত গঠনের খুঁটিনাটির অনেক কিছুই আমরা জানি তবু সেই অনুমান আজও বৈধ। আসলে ক্রমোসোমের জিনবিন্যাস সত্যি সত্যিই রৈখিক।

উক্ত গবেষণা থেকেই 'বংশাণুধৃতির মানচিত্র' নির্মাণ শুরু। নকশার ভিত্তিতে জিনসমূহের পারস্পরিক বিন্যাস ও আপেক্ষিক দূরত্ব নির্দেশই এর লক্ষ্য। যেহেতু ড্রসোফিলা কাজটির অত্যুপোযোগী উপকরণ, তাই এখানেই গবেষণা এগিয়েছে দ্রুত গতিতে। ১৯১৫ সাল থেকেই এই মাছির প্রতিটি ক্রমোসোমের বিস্তৃত মানচিত্র নির্মাণ সম্পূর্ণ ও প্রকাশিত হয়। অতঃপর অন্যান্য প্রজাতি যথা ভূট্টা, মটর, হাঁসমুর্গী, গবাদি পশু নিয়ে অনুরূপ গবেষণা শুরু হয়। উপকরণ হিসেবে এরা তেমন অনুকূল না হলেও তাদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব সমধিক। মানুষের বংশাণুধৃতির মানচিত্র নির্মাণের জন্যও অতঃপর তথ্যাদি সংগ্রহ শুরু হয়, যদিও অনেক ধীর গতিতে।

যা হোক, জিন এখনো একটি বিমূর্ত প্রত্যয়। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় কোনদিন জিন না দেখে বা এর রাসায়নিক সংযুতির বিন্দুমাত্র না জেনেও বিজ্ঞানীরা নিখুঁতভাবে এদের অবস্থান নির্ণয়ের কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন।

একটা জিন দেখান তো

বিগত শতাব্দির শেষে ইতালীয় কোষতত্ত্ববিদ বাল্‌বিয়নি বাগান মাছির শূক অণুবীক্ষণে পর্যবেক্ষণ করেন। এদের লালাগ্রন্থিতে তিনি অদ্ভুত কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলেন। স্বাভাবিক কোষ অপেক্ষা বহুগুণ বড় কোষে এগুলো গঠিত। আর এসব কোষের মধ্যে নিউক্লিয়াস সদৃশ অবয়বও দৃশ্যমান ছিল যদিও তা বিশাল এবং অস্বাভাবিক গড়নের। অণুবীক্ষণে এগুলোকে পার্শ্বিক ডোরাকাটা একটুকরো মোটা দড়ির মতো দেখাচ্ছিল। বিস্মিত বাল্‌বিয়ানি শুধু দৃষ্ট ছবির বর্ণনা লিখেই ক্ষান্ত হলেন। অতঃপর দীর্ঘকাল এই অদ্ভুত অবয়ব সম্পর্কে আর কেউ কোন উৎসাহ প্রকাশ করেন নি।

১৯৩৩ সাল থেকেই আবার এরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শুরু করে। বাল্‌বিয়ানি বর্ণিত অবয়বসমূহের প্রকৃতি অবশেষে নির্ণীত হয়। জার্মানিতে হাইট্‌স আর বাউয়ের এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেইণ্টার একই সঙ্গে এবং সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে কাজটি সম্পন্ন করলেন। আনুষঙ্গিক স্লাইড তৈরির এক নতুন কৌশলে তাঁরা সবিশেষ উপকৃত হন।

প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে লালাগ্রন্থিকে মোমবন্দী করে মাইক্রোটমে কাটা হলে এই বিস্ময়কর অবয়বসমূহের গঠন পর্যবেক্ষণ সম্ভবপর হত না। এই গবেষকরা তাই ভিন্ন পন্থা অনুসরণ করলেন। তাঁরা ড্রসোফিলার শূক (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাল্‌বিয়ানি বর্ণিত চিত্রটি অন্যান্য মাছি ও মশার ক্ষেত্রেও লক্ষণীয়) থেকে লালাগ্রন্থি পৃথক করে এসেটিক এসিডে গলানো কার্মিনে তা রঙ করলেন। এই গ্রন্থি একটি স্লাইডে রেখে তার উপর আরো একটি স্লাইড বসিয়ে অতঃপর চাপ দেয়া হল। নিউক্লীয় ঝিল্লি বিদীর্ণ হয়ে সেই রহস্যময় অবয়বগুলো গাঁট খুলে ছড়িয়ে পড়ল বাহিরে। উন্মোচিত হল এক আশ্চর্য ছবি: শিথিল, স্বল্প রঙিন কেন্দ্র থেকে উদ্‌গত দীর্ঘ ফিতা এবং তাদের গায়ে বিবর্ণ অঞ্চলের সঙ্গে একান্তর বিন্যস্ত উজ্জ্বল রঙের নানা প্রস্থের পার্শ্বিক ডোরা কাটা দাগ।

ফিতাগুলো কী? ওগুলো তো ঠিক ক্রমোসোমের মতো নয়। বলা বাহুল্য যে, এগুলো দেখতে ওদের চেয়ে কয়েক শো গুণ লম্বা আর অনেক মোটা। তাছাড়া এদের সংখ্যা পাঁচ। ড্রসোফিলার ক্রমোসোম সংখ্যা আট: ছ'টি বড় আর দুটি খুব ছোট। ঘনিষ্ঠতর অনুসন্ধানে ষষ্টটিও দেখা গেল। এটি অন্যগুলোর

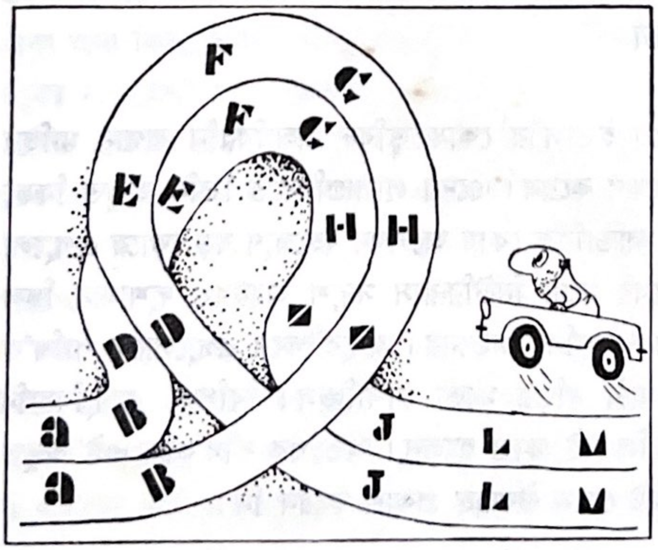

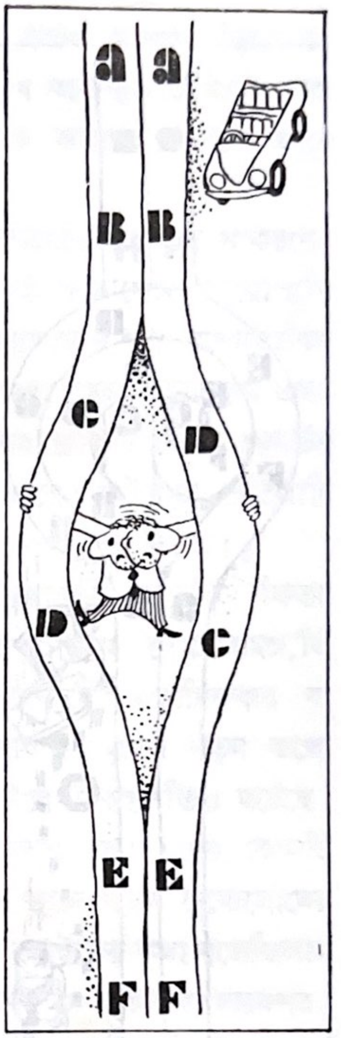

মতোই চওড়া চ্যাপটা কিন্তু এত খাটো যে মনে হয় যেন কেন্দ্রের সঙ্গে মিশে আছে। কিন্তু তাও একটা, দুটো নয়। ফিতাগুলো কি সজোড় ক্রমোসোম? কিন্তু ড্রসোফিলার ক্রমোসোম তো চার জোড়া।

এই ছয়টি অদ্ভুত অবয়বের উৎস কোথায়? আরে দেখুন! নিশ্চয়ই এগুলো একপ্রস্থ ক্রমোসোমপুঞ্জের 'বাহু'। প্রতিটি ক্রমোসোমের একটি নির্দিষ্ট বিন্দু আছে, বিভাজনকালে যেখানে তর্কুর সূত্রালী যুক্ত থাকে। বিন্দুটি ক্রমোসোম দেহের মধ্যস্থলবর্তী হলে ক্রমোসোম দ্বিবাহু এবং প্রান্তিক হলে তা একবাহু হয়। ড্রসোফিলার x ক্রমোসোম (যা প্রথম) একবাহু, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দ্বিবাহু এবং চতুর্থটি বিন্দুবৎ।

অদ্ভুত এই অবয়বগুলোর উৎস ক্রমে সুপরিস্ফুট হল। মনে পড়ল বহু অসম্পূর্ণ কোষবিভাজনের নজির। এরূপ ঘটনা সম্ভব যে ক্রমোসোম ও নিউক্লিয়াস বিভক্ত হল কিন্তু কোষ অটুট থাকল এবং ফলত উৎপন্ন হল 'দ্বিনিউক্লীয় কিংবা বহুনিউক্লীয় কোষ। অথবা ক্রমোসোম বিভক্ত হল কিন্তু অটুট থাকল নিউক্লিয়াস। ফলত উৎপন্ন হল দ্বিগুণ ক্রমোসোমধর কোষ। সুতরাং বিভক্তির পর অপৃথকীভূত ক্রমোসোমের অস্তিত্বও নিশ্চয়ই সম্ভবপর। এভাবেই মক্ষীকুলীয় *(Diptera)* মহাক্রমোসোম উদ্ভবের সঠিক ব্যাখ্যা সম্ভব। যৌনকোষ বিভাজনের মতো এখানেও পিতৃ ও মাতৃ পক্ষীয় পরস্পরঘনিষ্ঠ সমগণীয় ক্রমোসোম সম্পূর্ণ শিথিল অবস্থায় বহুবার বিভক্ত হয়েছে এবং তাই এ বিপুল দৈর্ঘ্য।

কিন্তু পার্শ্বিক ডোরাগুলো কী? সহজেই তার ব্যাখ্যা মিলল। বিশেষ উপযোগী উপকরণে ইতিপূর্বেও বিজ্ঞানীরা শিথিল ক্রমোসোম পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। এগুলো অতি সূক্ষ্ম সূত্রবৎ (ক্রমোনেমা নামাঙ্কিত) এবং এতে

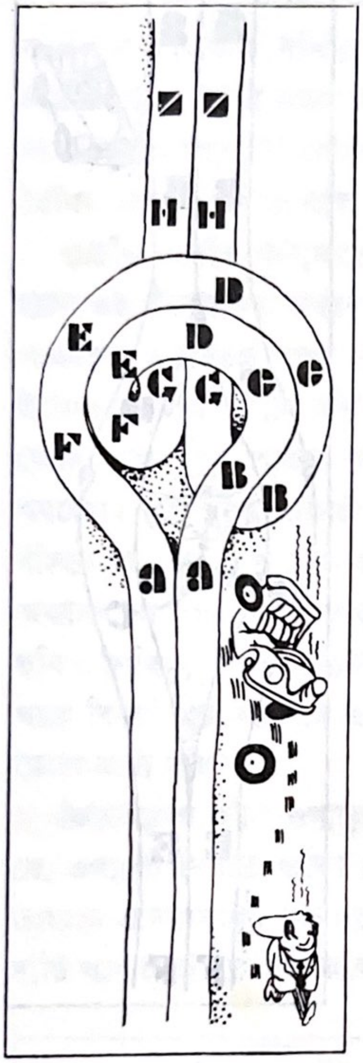

বহু ক্ষুদ্র কণিকা (ক্রোমোমিয়ার) বিন্যস্ত। ঐ কণিকাগুলি নিউক্লীয় রঞ্জকগ্রাহী। মহাক্রোমোসোমে অবস্থিত পার্শ্বিক ডোরাগুলো পাশাপাশি অবস্থিত বহুসংখ্যক ক্রোমোমিয়ার ছাড়া আর কিছু নয়।

বক্তব্যগুলি পূর্বোক্ত প্রকল্পের অনুকূল এবং অন্যতর কোন পন্থায় মহাক্রোমোসোম উদ্ভবের ব্যাখ্যা অসম্ভব। কিন্তু বিজ্ঞানীরা নতুন তথ্য সংগ্রহে নিরলস। এবং ফলও ফলল অচিরেই।

বেশ কিছুকাল আগেই ক্রোমোসোম মিউটেশন আবিষ্কৃত হয়েছিল। ক্রোমোসোম জিনের রৈখিক বিন্যাসের বংশানুসৃত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিভাষাটি ব্যবহৃত হত। উৎক্রম সাধারণ ক্রোমোসোম মিউটেশনের একটি দৃষ্টান্ত। আমরা যদি কোন ক্রোমোসোমের জিন বিন্যাস বর্ণমালা দিয়ে চিহ্নিত করি এবং A B C D E F G H I J K L M যদি জিনের স্বাভাবিক বিন্যাসের প্রতীক হয় তবে এর উৎক্রম A B C I J H G F E D K L M আকারে প্রকটিত হবে। এর মধ্যমাংশ D থেকে I পর্যন্ত কল্পিত স্বাভাবিক বিন্যাসের তুলনায় ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গেছে।

যদি স্বাভাবিক মাছির সঙ্গে উৎক্রম সংক্রমিত মাছির সংকরণ ঘটানো হয় তবে ফলাফল কী হবে? সাধারণত আমরা পার্শ্বিক চাকতিগুলোকে (অথবা ডোরা) ঘনবদ্ধ সদৃশ ক্রোমোমিয়ারের সারি হিসেবেই জানি। এধরনের সংকরণের ফলে বিভিন্ন প্রকার ক্রোমোমিয়ার পরস্পরের মুখোমুখি হবে। যদি প্রকল্পটি সত্য হয়, তবে নতুন কোন প্রক্রিয়া আশা করা যেতে পারে। কিন্তু সেজন্য স্বাভাবিক মাছির সঙ্গে ক্রোমোসোম মিউটেশনগ্রস্ত মাছির সংকরণ প্রয়োজন।

মর্গান ও তাঁর সহযোগীরা আবিষ্কার করলেন যে স্বল্প উৎক্রমের ক্ষেত্রে বংশানুসৃতির পূর্বাভাসমতো যেখানে উৎক্রম অকুস্থল চিহ্নিত ছিল

ক্রমোসোমের সেই নির্দিষ্ট স্থানে একটি লম্বালম্বি ফাটল সুস্পষ্ট ছিল। যে সকল স্থানে বিভিন্ন ক্রমোমিয়ার পরস্পর মুখোমুখি অবস্থিত সেখানে তারা মিশ্রণে অসমর্থ কিংবা 'মাতৃ' ও 'পিতৃ' ক্রমোমিয়ার আলাদা আলাদা ভাবে একীভূত এবং সর্বস্পর্শী মিলন ব্যাহত।

কিন্তু বৃহদাকার উৎক্রম সংক্রমিত মাছির সঙ্গে স্বাভাবিক মাছির সঙ্করণের ক্ষেত্রে ক্রমোসোম সম্পূর্ণ ফাটলবিহীন এবং সর্বত্রই ক্রমোসোম পুরোপুরি একীভূত। কীভাবে তা সম্ভব? কিন্তু এখানেও ক্রমোসোম দৃশ্যত অস্বাভাবিক এবং এদের কেউ কেউ বৃহদাকার ফাঁসে চিহ্নিত। দেখা গেল ক্রমোসোম এমন অদ্ভুতভাবে এখানে কুণ্ডলিত যে, একটি ক্রমোসোমের প্রতিটি বিন্দু অন্যটির সমসংস্থ বিন্দুর বিপরীতে যথাযথভাবে বিন্যস্ত আছে। কীভাবে প্রক্রিয়াটি ঘটল তার বর্ণনা অত্যন্ত জটিল কিন্তু ছবিতে দেখানো খুবই সহজ।

এর অনুসিদ্ধান্ত: লালাগ্রন্থির কোষ নিউক্লিয়াসের প্রতিটি 'ফিতা' ঘনসন্নিবদ্ধ 'পিতৃ' ও 'মাতৃ' ক্রমোসোমের সমাহার এবং ক্রমোসোমগুলি যথাযথভাবে সমসংস্থ বিন্দুতে পরস্পরাবদ্ধ। ইতিপূর্বে একাধিকবার যা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি সেই সত্য এখানেও পুনরাবৃত্ত। এসব নতুন তথ্যে পূর্বতন প্রতিপাদ্যই শুধু সত্যায়িত হয় নি, এর উল্লেখ্য অগ্রগতিও ঘটেছে।

মহাক্রমোসোমস্থ পার্শ্বিক চাকতিসমূহ দৃশ্যত সদৃশ নয়। এদের কোনটি প্রশস্ত, কোনটি-বা সঙ্কীর্ণ, অন্যেরা দ্বিগুণিত এবং স্থানে স্থানে ক্রমোসোমের অংশবিশেষ স্থূলতর। সুতরাং ইতিপূর্বে আমরা যে স্লাইডের কথা বলেছিলাম সেখানে কোন উৎক্রমের কোথায় শুরু আর কোথায় শেষ তা ঠিক করা সম্ভবপর। অভিজ্ঞ কোষবংশাণুবিদ একটি চাকতির মধ্যেই তাদের অবস্থান নির্ণয় করতে পারেন।

অতঃপর ড্রসোফিলার মহাক্রমোসোমসমূহের কোষতাত্ত্বিক মানচিত্র সঙ্কলিত হল। এদের সকল পার্শ্বিক চাকতি অঙ্কন, বিভিন্ন অংশে বিভক্ত এদের সংখ্যা গণন এবং প্রতিটি অবস্থানবিন্দু *(locus)* অক্ষর ও সংখ্যা দ্বারা একটি করে রীতিবদ্ধ নামে চিহ্নিত করা হয়। এই চার্ট দেখে এর উৎক্রমের অবস্থান নির্ণয়ে আর কোন অসুবিধা রইল না। এর পরই সেরা রোমাঞ্চকর গবেষণার শুরু! বংশানুসৃতি মানচিত্রের (ক্রসিং-ওভার পরীক্ষাভিত্তিক) সঙ্গে কোষতাত্ত্বিক মানচিত্রের (ক্রমোসোমের আণুবীক্ষণিক পরীক্ষাভিত্তিক) তুলনা। ড্রসোফিলার যথাযথ অন্বয়ানুসৃত কোন্ কোন্ নির্দিষ্ট জিন আর কোন্ কোন্ চাকতি 'উৎক্রমিত' তা যথাক্রমে বংশানুসৃতি পরীক্ষা ও কোষবংশানুসৃতি পরীক্ষা দ্বারা

নির্ধারণ করা এখন সম্ভব। এদের তুলনাক্রমেই অণুবীক্ষণে দৃষ্ট কোন্ ক্রমোসোমের কোন্ অংশে একটি নির্দিষ্ট জিন অবস্থিত তা আমরা বলতে পারি। এমন কি ক্ষেত্রবিশেষে কোন্ নির্দিষ্ট চাকতিতে একটি বিশেষ জিন অবস্থিত তাও বলা সম্ভবপর।

অথচ আমাদের কাছে আজও জিনের প্রকৃতি অজ্ঞাত। জিন ক্রমোসোমের একটি রঙিন চাকতি, না এর বর্ণহীন অংশ এবং একটি চাকতিতে ক'টি জিন অবস্থিত আমরা তা জানি না। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট জিন যে ক্রমোসোমের একটি নির্দিষ্ট অংশের সঙ্গে যুক্ত সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। বলা বাহুল্য এ এক উল্লেখ্য সাফল্য।

মহাক্রমোসোমের প্রয়োজনীয়তার কারণ কী? কোষমধ্যস্থ জিনসমূহ 'সদাকার্যরত'। এরা কোষের সার্বিক কার্যনিয়ন্ত্রক উপাদানসমূহের উৎপাদক। বিভিন্ন জিনের সক্রিয়তা কখনো আত্যন্তিক কখনো-বা মন্থর এবং কখনো-বা সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ। কিন্তু যখন কোষের কাজের পরিমাণ অত্যধিক, তখন? স্বাভাবিক কোষে প্রত্যেক প্রকার জিনের সংখ্যা মাত্র দুই, তাই সেক্ষেত্রে এই পরিমাণ কম সঙ্কুলানে তাদের ব্যর্থতা অনেক সময় অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

সহযোগী কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি, বহুনিউক্লীয় কোষ উৎপাদন, বর্ধিতসংখ্যক ক্রমোসোমধর কোষ, ইত্যাকার পন্থায় প্রকৃতিতে এর বিধেয় আবিষ্কৃত... মক্ষীকুলের (মাছি ও মশা) বিবর্তন বহুসূত্রী *(polytene)* ক্রমোসোমের অনুসারী। লক্ষণীয় যে, এই সকল পতঙ্গে কেবলমাত্র লালাগ্রন্থিতেই নয়, এদের অন্য প্রত্যঙ্গেও মহাক্রমোসোম বিদ্যমান। অবশ্য, সেখানে বহুসূত্রতার মাত্রা অনেকাংশে সীমিত এবং ক্রমোসোমও এত বড় নয়।

শূক জীবনের শেষ পর্যায়ে লালাগ্রন্থির ক্রমোসোমরাই বিশেষভাবে কেন এত বড় তা অনুমান করা কঠিন নয়। তখন শূকের প্রধান কাজ ভাবী পুত্তলির জন্য গুটি তৈরি করা। অতি অল্পকালের মধ্যেই লালাগ্রন্থির নিঃসরণে গুটি তৈরি সম্পূর্ণ হয়। লালাগ্রন্থির স্লাইডে দেখা যায় যে এদের ক্রমোসোমগুলি অত্যধিক স্ফীত। গুটি তৈরির উপাদাননিয়ন্ত্রক জিনগুলো সম্ভবত এখানেই থাকে। কয়েক বছর আগে এই সম্ভাবনার অনুকূল তথ্যাদি আমাদের হস্তগত হয়েছে। অবশ্য এর প্রাথমিক তথ্য ড্রসোফিলা থেকে পাওয়া নয়, সিয়ারা *(Sciara)* গণভুক্ত একটি ছত্রাক-ডাঁশই এর উৎস। ডাঁশটির শূকের ক্রমপরিণতির বিভিন্ন পর্যায় পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা এদের মহাক্রমোসোমের বিভিন্ন স্ফীতাঞ্চলের উদ্ভব, বিকাশ ও বিলুপ্তির তথ্যনির্ণয়ে সফল হন। দেখা

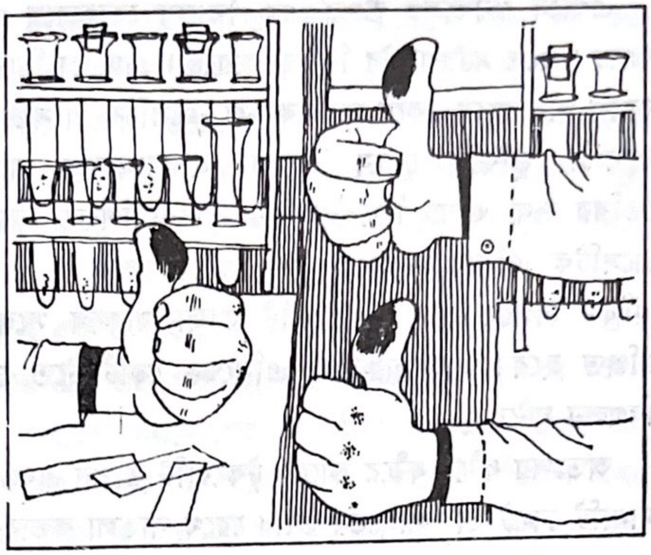

যায়, স্ফীতাঞ্চলের উদ্ভব ঘটে গুটি তৈরির পূর্বমুহূর্তেই আর পরে তা অদৃশ্য হয়। বংশানুসৃতির ক্রমোসোম তত্ত্ব (কখনো মর্গানবাদ নামেও তা পরিচিত) ড্রসোফিলাকে কেন্দ্র করেই ক্রমোন্নত হয়েছে — যে জীব ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে একেবারেই মূল্যহীন। কিন্তু বংশানুসৃতির যে নিয়ম আবিষ্কারে ড্রসোফিলা আমাদের সাহায্য করেছে তা শুধু ওর ক্ষেত্রেই নয়, গম, গবাদি পশু ও মানুষসহ সকল জীবিতেই বৈধ। বংশানুসৃতির ক্রমোসোম তত্ত্বের মৌল নীতিসমূহ অজস্র প্রজাতিতে পরীক্ষিত হয়েছে এবং সত্যটি এখন দিবালোকের মতোই সুস্পষ্ট যে, মাছি আর হাতি বংশানুসৃতির একই নিয়মাধীন জীব।

কীভাবে এমনটি ঘটে?

ক্রমোসোম গবেষণায় টুকরো কাটার জটিল পদ্ধতি আজকাল প্রায় অপ্রচলিত। আমরা আরো জানি যে জীবন্ত কোষ দেখা ও তা থেকে মাইক্রোফিল্ম তৈরি করা এখন সহজ। কিন্তু সেজন্য প্রয়োজন আধুনিকতম যন্ত্রপাতি এবং ল্যাবরেটরির দৈনন্দিন কাজে তা সর্বত্র সহজলভ্য নয়। তবে ক্রমোসোম নিরীক্ষার সর্বাধুনিক সহজতম পন্থা কী? পদ্ধতিটি জানার জন্য ক্রমোসোম সংক্রান্ত কোন ল্যাবরেটরিতে গেলেই হয়।

এখানে টেবিলের উপর এক বিশেষ হোল্ডারে অনেকগুলো টেস্ট-টিউব আছে। এতে মটরশুঁটির শিকড় রয়েছে। এবং তা নিয়েই পরীক্ষা। দুই সপ্তাহ আগে গাছ থেকে কেটে আলকোহল, এসেটিক এসিড আর ক্লরোফর্মের মিশ্রণে দু'ঘণ্টা ডুবিয়ে শেষে এদের আলকোহলে রাখা হয়েছে। উপকরণ তৈরির জন্য ওয়াচ ক্রিস্টেলে একটুকরো শিকড় রেখে তার উপর লঘুকৃত এসেটিক এসিডে গলানো দশ ফোঁটা রঞ্জক ও এক ফোঁটা হাইড্রোক্লরিক এসিড ঢালতে হবে। পদার্থটি তাজা থাকলে সঙ্গে সঙ্গে তা সংবন্দী ও রঞ্জিত হবে। হাইড্রোক্লরিক এসিডের ফোঁটাটিতে কোষবন্ধনকারী পদার্থের বিগলন ঘটবে।

অতঃপর ধীরে ধীরে কাচের টুকরোটি তাপন এবং কিছুক্ষণ পরে শিকড়ের মাথাটি কেটে তা স্লাইডের উপর রেখে পাতলা কভার-গ্লাসে ঢেকে ডান হাতের বুড়ো আঙুলে আস্তে আস্তে চাপ দেওয়া প্রয়োজন। ফলে দুই স্লাইডের মধ্যবর্তী তরল পদার্থে রঙিন কোষগুলি সমানভাবে ছড়িয়ে যাবে এবং প্রস্তুতিপর্ব শেষ হবে। সহজ, তাই না? কিন্তু পদ্ধতিটি উন্নয়নে ব্যয়িত হয়েছে দীর্ঘ সময়।

এখন আপনি অণুবীক্ষণে তাকিয়ে বিবর্ণ কোষের উজ্জ্বল রঙিন নিউক্লিয়াস দেখতে পাবেন। আরো খুঁটিয়ে দেখলে লক্ষ্য করবেন এদের সবক'টি একই রকম নয়। এদের অধিকাংশই গোলাকার ও প্রায় সমান রঙিন। নিউক্লিয়াসে ঈষৎ বিবর্ণ মধ্যমাংশই নিউক্লিয়লাস। কিন্তু বহু কোষই পুরোপুরি আলাদা। তারা অনেকটা সরু মোটা নানা প্রস্থের সুতোর গুটির মতো, কোনটায় নিউক্লিয়লাস নেই, কোনটার নিউক্লিয়াসের জায়গায় কয়েকটি উজ্জ্বল রঙিন দন্ড। এগুলিই ক্রমোসোম।

কিন্তু বিজ্ঞানীদের উৎসাহ কেবল মটরশুঁটিতেই থেমে যায় নি। অজস্র উদ্ভিদ ও প্রাণী তাঁদের গবেষণাভুক্ত। গুরুত্বের বিচারে মানুষই সেরা উপকরণ। আমরা মানুষের উপর মটরশুঁটির মতো পরীক্ষা চালাতে পারি না। কিন্তু তাদের কোষ নিয়ে অবশ্য তা সম্ভব। কিছুদিন আগেও তা অবাস্তব স্বপ্ন ছিল। কিন্তু ইদানীং ব্যাপারটি সহজ। অস্ত্রোপচারের সময় কেটে ফেলা একটুকরো মাংসকে বিশেষ খাদ্যমাধ্যমে রেখে দেয়া হয়েছিল। অনেক বছর হল নরদেহের বাইরে কোষগুলি আজও সজীব এবং তারা সংখ্যাবৃদ্ধি করছে। দেখুন, রক্তাভ তরল পদার্থের শিশিতে ছোট ছোট স্লাইড রাখা আছে। ওখানে নরকোষ বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রয়োজনমতো একটি স্লাইড বের করে

আলকোহল ও এসেটিক এসিডের মিশ্রণে তা সংবন্দী করে পরে রঙ করা হয়। অতঃপর অণুবীক্ষণে কোষপরীক্ষা।

কোষবিশেষের ক্রমোসোমে কী ঘটছে শুধু তা দেখাই নয়, এতদ্দ্বারা কীভাবে কোষের ভবিষ্যৎ প্রভাবিত হচ্ছে, এর বিভাজনক্ষমতা কি অটুট থাকছে, এ কি স্বাভাবিক কন্যা কোষের জন্মদান করছে, ইত্যাদি জানাও বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্য।

প্রশস্ততল কৌণিক ফ্লাস্কে রক্তাভ তরল পদার্থটি রয়েছে। ফ্লাস্কটি নিন এবং যথাসম্ভব অন্ধকার প্রেক্ষিতে এর তল পরীক্ষা করুন। আপনি সাদাটে বিন্দু ও চিহ্ন দেখতে পাবেন। ওগুলো নরকোষের কলোনি। পক্ষকাল আগে এই বকযন্ত্রে প্রায় শতাধিক পৃথক নরকোষের বীজ 'বপন' করা হয়েছিল। এখন তারা প্রত্যেকে যে কলোনি গঠন করেছে তা অণুবীক্ষণ ছাড়াই দেখা যাচ্ছে। একক কোষ থেকে কলোনি তৈরির এই পদ্ধতি সাম্প্রতিক আবিষ্কার।

বংশাণুবিদরা গম ও মানুষ, মাছি আর হাতি — এমনি বিবিধ উপকরণ নিয়ে কাজ করেন, কিন্তু বংশানুসৃতির সাধারণ নিয়ম অধ্যয়নের সেরা উপকরণ ড্রসোফিলা। অবশ্য হাতি নিয়েও এই একই গবেষণা সম্ভব। কিন্তু হাতির আয়ুষ্কাল আর স্বল্প প্রজননক্ষমতার প্রেক্ষিতে এজন্য ব্যয়িত সময় ও মূল্যের পরিমাণ সহজেই অনুমেয়।

একজোড়া ড্রসোফিলা কয়েক শো প্রজন্মের জন্মদানে সক্ষম আর প্রতি প্রজন্মের সাবালকত্ব লাভের জন্য প্রয়োজন মাত্র দু'সপ্তাহের। এক বছরে ড্রসোফিলা থেকে যে ফল পাওয়া যায় হাতি থেকে তা পেতে হলে প্রয়োজন কয়েক শতাব্দীর। সুতরাং হাতি ও মাছি থেকে একই ফল পাওয়া গেলে হাতি অপেক্ষা যে মাছিই অধিকতর বাঞ্চনীয় তা সহজবোধ্য। একই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য দ্রুত প্রজননশীল উপকরণই ব্যবহার্য।

গবেষণার বহুবিধ পদ্ধতি ও পর্যাপ্ত উপকরণে আধুনিক বংশাণুবিদ্যার ভাণ্ডার আজ পূর্ণ। এর প্রতিটি গবেষণাক্ষেত্রে আজ এমন পথ বেছে নেয়া হচ্ছে যেখানে দ্রুত ও নির্ভুল লক্ষ্যসাধনের নিশ্চয়তা নিহিত।

প্রকার উৎপত্তির নিয়ম

একটি আত্মহত্যার কাহিনী

আহৃত চারিত্র্যের বংশান্তরণ সম্পর্কে বহু শতাব্দী কেউ কিছু চিন্তা করেন নি। এর অবশ্যম্ভাবিতা সম্পর্কে সকলেই তখন নিঃসন্দেহ। সেকালে এসব ধারণাভিত্তিক উপকথা ও বিশ্বাসের কোন সীমাসংখ্যা ছিল না। কিন্তু প্রশ্নটি দীর্ঘকাল কোন বৈজ্ঞানিক সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হয় নি। জীবদ্দশায় জীববিশেষে উদ্ভূত প্রকারণের বংশানুসৃতি যে বিবর্তনের মৌল উপাদান, সে সম্পর্কে প্রখ্যাত নিসর্গী লামার্ক ও ডারউইন উভয়ই নিঃসন্দেহ ছিলেন।

গত শতাব্দীর শেষে ফ্রাইবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যার অধ্যাপক আউগুস্ট ভাইস্‌মান জটিল ও দুর্বোধ্য এক জননপ্লাজ্‌ম তত্ত্বের প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। প্রামাণ্য তথ্যের অভাব এবং অজস্র স্ববিরোধ সত্ত্বেও এর কোন কোন উপাদান নির্ভুল ছিল যা আধুনিক বিজ্ঞানে এখন আত্মীকৃত। কিন্তু বড় কথা হল এই, আহৃত চারিত্র্য যে বংশান্তরণবিমুখ, ভাইস্‌মানের এই প্রতিপাদ্যটি তাঁর কালের সমর্থন লাভ করে নি, তাই তা প্রমাণ করা জরুরী ছিল। ইঁদুরের লেজ কেটেই তিনি তাঁর প্রতিপাদ্য চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করার

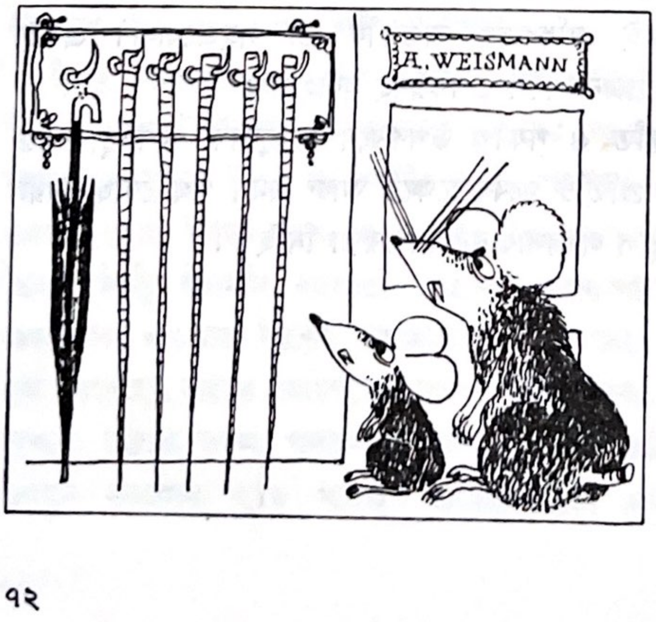

সিদ্ধান্ত নেন। লেজকাটা পিতা-মাতার সন্তান খাটো লেজ নিয়ে জন্মায় কি না তা দেখার জন্য তিনি প্রজন্মপরম্পরায় নেংটিদের লেজ কাটতে শুরু করলেন। কিন্তু অনুমানাতীত কোন ফল ফলল না। দেখা গেল পরীক্ষা শুরু করার আগে লেজের দৈর্ঘ্য যা ছিল ২২ প্রজন্ম পরেও তার কোন পরিবর্তন ঘটে নি।

বলা বাহুল্য তা সত্ত্বেও খুব কম লোকই তাতে আস্থা স্থাপন করেছিলেন। বহু বিজ্ঞানীর মতে উপরোক্ত পরীক্ষায় যা ঘটানো হয়েছে তা বিকৃতি, দৈহিক ক্ষতি মাত্র এবং তাই তা বংশানুসৃতব্য নয়; কিন্তু লেজের দৈর্ঘ্য জৈব অস্তিত্বের অনুষঙ্গ হলে তবে ফলাফল ভিন্নতর হবে এবং সন্ততিতে তার সঞ্চারণের সম্ভাবনা থাকবে। আমরা জানি যে শীতপালিত প্রাণীদের দেহত্বক্ স্থূলতর এবং লেজ, কান ও পা নাতিদীর্ঘ তাই এরূপ মনে করা স্বাভাবিক যে, কয়েক প্রজন্ম অবধি প্রাণীদের নিম্ন তাপে রাখলে 'খাটো লেজ' তাদের বংশানুসৃত চারিত্র্য হয়ে উঠবে। বিকলাঙ্গতা সম্পর্কে ভাইসম্যানের পরীক্ষা তেমন নতুন নয়। পশুপ্রজনকরা যুগ যুগ ধরে পরীক্ষাটি করছেন। মেষপালকরা ম্যারিনো মেষের লেজ কাটছেন বহু বছর ধরে। অশ্বপ্রজনকরা ঘোড়ার লেজ ছাটছেন, কুকুরপ্রেমীরা বহুজাতের কুকুরের লেজ আর কান কাটছেন, কিন্তু এদের সন্তানেরা তাদের সুদূর পূর্বপুরুষদের মতো অক্ষত চেহারা নিয়েই জন্মাচ্ছে।

ভাইসম্যানকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করার জন্য পরীক্ষা শুরু হল। সাম্‌নার চূড়ান্ত তাপমাত্রায় নেংটি প্রজননে তৎপর হলেন। তিনি এদের দুই দলকে যথাক্রমে ৬ এবং ৩০ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রায় রাখলেন। এসব বয়স্ক 'উষ্ণ' ও 'শীতল' নেংটিদের লেজ দৈর্ঘ্যের সর্বাধিক পার্থক্য ছিল ৩০ শতাংশ। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের সন্তন্তিদের মধ্যে কোন বৈসাদৃশ্য দেখা গেল না। প্‌জিব্রাম তাপমাত্রার ব্যাপকতর ব্যবধানে ইঁদুর নিয়ে পরীক্ষা করলেন এবং একই ফল পেলেন...

সকলের কাছেই ব্যাপারটি অদ্ভুত মনে হল। এ ছিল পরীক্ষাকারী বিজ্ঞানীসহ সর্বজনীন ধারণার বিরোধী। ভাইসম্যানভক্তরা উল্লসিত হলেন। প্রাচীনপন্থীরা পরীক্ষাগুলিতে ত্রুটির অস্তিত্ব কল্পনা করে নিশ্চিন্ত রইলেন। ক্রমে নানা উপকরণ নিয়ে, বিবিধ পরিবেশে বহু পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হল। অচিরে তা এক গুরুত্বপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করল। বিশ্বের জীববিজ্ঞানীরা দুই দলে বিভক্ত হলেন: কেউ আহৃত চারিত্র্যের বংশানুসৃতির সপক্ষে, কেউ এর বিপক্ষ দলে যোগ দিলেন।

আহৃত চারিত্র্যের অবংশানুসৃতি সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞান আজ

নিঃসন্দেহ। আমরা জিনের রাসায়নিক প্রকৃতি এবং বংশানুসৃতির সূক্ষ্মতম প্রক্রিয়া সম্পর্কে এখন অবহিত। কিন্তু এই শতাব্দীর শুরুতে বহু বিজ্ঞানীই আহৃত চারিত্র্যের বংশানুসৃতি সম্পর্কে অস্বচ্ছ ও উদ্ভট ধারণার বশবর্তী ছিলেন। সুতরাং তাঁদের কাছে বিষয়টি অবিশ্বাস্য মনে হয় নি।

সেকালে সমস্যাটির মোটামুটি ধারণা: তাপমাত্রা শারীরবৃত্তকে প্রভাবিত করে লেজদৈর্ঘ্যের পরিবর্তন তথা প্রাণীর বংশানুসৃতির রূপান্তর ঘটায় (বংশানুসৃতি কী, তখনো তা সুস্পষ্ট হয় নি) এবং সন্ততিরা অতঃপর পরিবর্তিত লেজ নিয়ে জন্মে। বিজ্ঞানীদের পরিভাষায় এই কাল্পনিক প্রক্রিয়ার নাম দৈহিক উপপাদন।

অন্যদের যুক্তি ছিল: তাপমাত্রার প্রভাবে কোষপরিবর্তন ঘটে, তাই লেজদৈর্ঘ্য খর্বিত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু তাপমাত্রা তো শুধু লেজকেই নয়, বীজকোষকেও প্রভাবিত করে এবং সেখানেও একই পরিবর্তন সঞ্চারিত হয়। সুতরাং সন্ততিরা পরিবর্তিত লেজ নিয়ে জন্মগ্রহণ করবে, অতঃপর এমন আশাই স্বাভাবিক। এই প্রক্রিয়াও কাল্পনিক এবং এর নাম সমান্তরাল উপপাদন।

সুতরাং আহৃত বংশানুসৃতির সমর্থকদের ভাণ্ডারে প্রয়োজনীয় 'তাত্ত্বিক মালমশলার' ঘাটতি ছিল না। বস্তুত লামার্কের বংশানুসৃত রূপান্তরণের কারণসমূহ পুনরুজ্জীবিত করে তাঁরা নিজেদের 'নবলামার্কবাদী' বলে ঘোষণা করলেন।

এঁদের প্রতিপক্ষ ভাইসম্যান তত্ত্বের অনুসারী ছিলেন এবং তাঁরা নিজেদের 'নবডারউইনবাদী' নামে চিহ্নিত করেন। তা সত্ত্বেও উভয় দলের মতামতই সম্পূর্ণ মন গড়া ছিল। এখানে নিখুঁত পরীক্ষা মাধ্যমে সত্যাসত্য নির্ণয়ই একমাত্র পন্থা বিধায় পরীক্ষা অব্যাহত রইল। প্রসঙ্গত, অস্ট্রীয় প্রাণীবিদ

পাউল কামেরারের নাম উল্লেখ্য। তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত নবলামার্কবাদী, তাঁর পরীক্ষাগুলি বিজ্ঞানী মহলের বাইরেও দূরপরিব্যাপ্ত ছিল।

তিলকিত স্যালামেণ্ডার নিয়ে কামেরার পরীক্ষা করেন। এসব জন্তুর শরীর ছিল কালো ও হলুদ দাগে আচ্ছন্ন। বন্য স্যালামেণ্ডারদের শরীরে এই দাগের সংখ্যা ও আকৃতির যথেষ্ট তারতম্য লক্ষিত হত। কামেরার কালো ও হলুদ রঙের প্রেক্ষিতে তাদের পালন করলেন। কালো প্রেক্ষিতে পালিতদের দেহে অধিকতর সংখ্যায় কালো দাগ দেখা দিল এবং এক অবস্থায় শুধুমাত্র পিঠের দু'সার পাংশু বিন্দু ছাড়া তাদের সারা দেহ পুরোপুরি কালো হয়ে উঠল। আর হলুদ প্রেক্ষিতে পালিত জন্তুরা হল আরো হলুদ।

ফলাফলটি অপ্রত্যাশিত ছিল না। প্রাণীবিদমাত্রেই জানেন যে, বহু প্রাণী প্রতিবেশ অনুসারী বর্ণবিন্যাসে অভ্যস্ত এবং উভচর ও সরীসৃপে এই চারিত্র্য সহজদৃষ্ট। রক্তচোষার কথাই মনে করুন। চোখের সামনেই তো সে তার বর্ণ পরিবর্তন করে।

কামেরারের পোষা বহুবর্ণ প্রাণীরা অতঃপর বংশবৃদ্ধি করল। এদের বাচ্চাদেরও রাখা হল একই প্রতিবেশে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা গেল, কালোদের বাচ্চারা হলুদ রঙ স্যালামেণ্ডারের বাচ্চাদের চেয়ে গাঢ় রঙের। এর বিরুদ্ধে কী বলা যায়?

কিন্তু তবু প্রতিপক্ষ থেকে আপত্তি উঠল। জার্মানির হার্বস্ট শুধু কথায় নয়, কাজেও তাঁর প্রতিবাদ করলেন। তিনিও স্যালামেণ্ডার নিয়ে পরীক্ষায় নামলেন। কামেরারের মতো বয়স্ক স্যালামেণ্ডার না নিয়ে তিনি এদের শূকগুলোকে বিভিন্ন রঙের মাটিতে লালন করলেন। এখানে প্রাণীদেহের পরিবর্তন ঘটল কামেরারকৃত পরীক্ষা অপেক্ষা অনেক তাড়াতাড়ি। কিন্তু দেখা গেল, বয়স্ক অবস্থায়ও স্যালামেণ্ডার এই রঙিন মাটিতে থাকলে তাদের বর্ণগত পার্থক্য না বেড়ে বরং তা কমতে শুরু করে।

এর অর্থ কি এই যে কামেরারের কোথায় কোন ভুল হয়েছিল? অথবা এর চেয়েও খারাপ কিছু?.. তিনি প্রায় অপদস্থ হলেন। অতঃপর ক. ফ্রিশ তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এলেন। তিনি যথেষ্ট কষ্ট সহকারে কামেরার ও হার্বস্টের পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করলেন, অবশ্য সংক্ষিপ্ত পরিসরে। উভয়ের ফলাফলই সত্যায়িত এবং গবেষণার প্রামাণ্যতর উপকরণস্বরূপ কেবলমাত্র বয়স্ক স্যালামেণ্ডার ব্যবহারের পক্ষেই মত দেওয়া হল। ফ্রিশ, শ্লাইপ ও প্‌জিব্রাম দ্বারা সমর্থিত হলেন। মনে হল যেন একটা মীমাংসা আবিষ্কৃত হয়েছে।

কিন্তু হার্বস্ট নবপর্যায়ে তাঁর গবেষণার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করলেন। কাজেই কামেরারের ফলাফল, তাঁর পরীক্ষাকৃত সিদ্ধান্ত সবই বাতিল প্রমাণিত হল। অবশ্য তাঁর তত্ত্বগুলি তখনো অটুট থাকল (এর উল্টো হওয়াও সম্ভব ছিল)। কামেরার অপমানিত হলেন। কিন্তু তাঁর সমর্থকরা বললেন যে কামেরার ও হার্বস্ট দুই জাতের তিলকিত স্যালামেণ্ডার নিয়ে কাজ করেছেন, তাই উপকরণের বিভিন্নতার জন্যই ফলাফলের এই অবশ্যম্ভাবী তারতম্য। আবার সবকিছুই সুস্থির। কিন্তু এই স্যালামেণ্ডার কাহিনীর শুদ্ধাশুদ্ধতার প্রশ্নটি অমীমাংসিতই রয়ে গেল।

কামেরার নতুন পরীক্ষা শুরু করলেন। এবার নিলেন তথাকথিত ধাত্রীব্যাঙ। প্রাণীটি অদ্ভুত প্রজনন বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত। তার স্বজাতির মতো জলে ডিম না পেড়ে সে ডিম পাড়ে ডাঙায়। পুরুষ ব্যাঙ তার দেহে ডিমের ছড়া জড়িয়ে রাখে এবং আঠাল পদার্থে জড়ানো ডিম ওখানেই কিছুকাল বৃদ্ধি পায়। ডিম ফোটার সময় হলেই পুরুষ ব্যাঙ জলে নামে আর ওখানেই বেঙাচিরা জন্মে, বড় হয়।

কিন্তু এদের সবসময় জলে রাখলে? কামেরার বাতাসের তাপমাত্রা বাড়ালেন এবং ব্যাঙরা প্রজনপর্বের আগেই জলে নামল। পুরুষ ব্যাঙরা পূর্বানুবৃত্তির চেষ্টায় ব্যর্থ হল: আঠাল পদার্থ শরীর থেকে ধুয়ে মুছে গেল আর ডিম ডুবল জলের তলায়। কয়েকবার ব্যর্থ হবার পর পুরুষরা এই অপচেষ্টা ত্যাগ করল। তাদের বংশানুসৃত সহজাত প্রবৃত্তির পরিবর্তন ঘটল। তাছাড়া তাদের বাহ্য চারিত্র্যেও এল কিছু কিছু পরিবর্তন: সামনের পা বলিষ্ঠতর হয়ে উঠল আর জলে প্রজনন-অভ্যস্ত সোনাব্যাঙ ও কুনোব্যাঙের মতো তাদের বুড়ো আঙুলের চামড়াও হল স্থূল। সন্দেহ নেই, তথ্যগুলি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক, কিন্তু বংশানুসৃতি পরিবর্তনের সঙ্গে এরা অসম্পর্কিত। কামেরার অতঃপর তাঁর রূপান্তরিত ব্যাঙের সঙ্গে ধাত্রীব্যাঙের সঙ্করণ ঘটালেন। সন্ততিরা মেণ্ডেলীয় অনুপাতে পৃথকীভূত হল। সঙ্করণজাত সন্ততিচারিত্র্যের এই মেণ্ডেলীয় পৃথকীভবনের ফলে এদের বংশানুসৃতি সম্পর্কে কামেরারের সিদ্ধান্ত সত্যাখ্যাত হয়েছিল।

কিন্তু ১৯২৬ সালের ৭ই আগস্টে প্রকাশিত বিখ্যাত ব্রিটিশ সাময়িকী ‘নেচার’এ জি. কে. নোব্‌লের এক নিবন্ধ প্রকাশিত হল। ভিয়েনার জীববিজ্ঞান ইনস্টিটিউটে কামেরারের পরীক্ষিত প্রাণীর নমুনাগুলো ছিল। নোব্‌ল সেখানে এসে ওগুলো অনুবীক্ষণে পরীক্ষা করে ঘোষণা করলেন যে, পূর্বপ্রচারিত

ব্যাঙের মাথার নবোদ্ভিন্ন গড়ুলগুলি আসলে ইন্ডিয়ান ইঙ্ক ইনজেকশনেরই কারসাজি। জাল, জুয়াচুরি! ইতিপূর্বে কামেরারের বহু প্রতিপক্ষ ইঙ্গিত করেই নীরব ছিলেন। নোব্‌ল তাই সাক্ষ্যপ্রমাণ তথা পুরো ঢোলা-শোহরতে জনসমক্ষে উদ্‌ঘাটিত করলেন।

বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন যুক্তিও কামেরারের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হল। হতাশায় বিপর্যস্ত কামেরার ১৯২৬ সালের সেপ্টেম্বরে আত্মহত্যা করলেন। শেষ চিঠিতে এই প্রবঞ্চনায় নিজের ভূমিকা তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছিলেন।

কাহিনীটি সর্বসাধারণের গোচরীভূত হল। এ নিয়ে সংবাদপত্রে হৈচৈ। 'স্যালামেণ্ডার' নামে চলচ্চিত্র নির্মিত হল। কামেরার সমস্যা নিয়ে তদাবধি কোন মীমাংসায় পৌঁছানো গেল না। কেউ কেউ কামেরারকে জোচ্চোর বলেন, কেউ-বা তাঁকে দিলেন নির্ভীক, নিষ্কলঙ্ক বীরের সম্মান। তাঁদের মতে যেটুকু প্রবঞ্চনা ঘটেছে সেজন্য দায়ী কামেরার নন, তাঁর জনৈক সমর্থক। অন্যদের মতে কাজটি বিজ্ঞানীর শত্রুপক্ষের।

যা হোক এ সর্বকিছুই স্বয়ং কামেরারের জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু তাঁর তত্ত্ব? বলা বাহুল্য, প্রচেষ্টাটি ভ্রান্তিদুষ্ট ছিল। আহৃত চারিত্র্য যে বংশানুসৃত হয় না এই প্রত্যয়কে পরখ করার জন্য অসংখ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সেই একই সিদ্ধান্তের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে: পিতা-মাতার আহৃত চারিত্র্য সন্তানে সঞ্চারমান নয়।

বিজ্ঞানীর প্রতি ইঞ্জিনিয়রের চ্যালেঞ্জ

চার্লস ডারউইনের গ্রন্থ 'প্রজাতির উদ্ভব' প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তা সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বের হল একের পর এক নতুন সংস্করণ। গ্রন্থটি অনূদিত হল অন্যান্য ভাষায়ও। আর এর পাঠকবর্গ ছিল সর্বসাধারণ।

ডারউইনের গ্রন্থটি সম্পর্কে কেউই উদাসীন ছিল না। কিন্তু প্রখ্যাত নিসর্গীর গ্রন্থটি সকলের প্রশংসা লাভ করে নি। বই সম্পর্কে বহু বিতর্ক, অস্বীকৃতি ও অভিযোগ উচ্চারিত হয়েছে। ডারউইনবাদের জন্মলগ্নেই এর বিরোধী তত্ত্বের শুরু।

এখন ডারউইনবাদের বিরোধীদের রচনা পাঠের সময় তাদের যুক্তির হাস্যকর সারল্য ও অসংলগ্নতা সহজেই চোখে পড়ে। ডারউইন যেহেতু তত্ত্বগ্রন্থনায়

বহু বৎসর ব্যয় করেন এবং পূর্বাহ্নেই এর সকল হেরফের যথাযথভাবে পরিমাপ করেছিলেন, তাই প্রতিপক্ষকে তর্কাতীত যুক্তির আঘাতে পর্যুদস্ত করতে তাঁর কোনই অসুবিধা হয় নি।

কিন্তু ১৮৬৭ সালে ডারউইন এমন একটি প্রশ্নের মুখোমুখি হলেন যার উত্তর দেয়া বাকী জীবনে তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। এবং ডারউইনের মৃত্যুর পরও বহু বৎসর তাঁর অনুগামীরা এ সম্পর্কে নীরব ছিলেন। এই প্রশ্নকর্তা কোন জীববিজ্ঞানী নন, এমন কি তিনি বিজ্ঞানীও নন। তিনি এক ইঞ্জিনিয়র। তাঁর নাম ফ্লেমিং জেঙ্কিন। তিনিও ডারউইনের 'প্রজাতির উদ্ভব' পড়েছিলেন। তারপর তিনি কিছু অঙ্ক কষলেন এবং শেষে এ থেকে বেরিয়ে এল স্বনামখ্যাত 'জেঙ্কিন কুটাভাস'। ডারউইন তাঁর তত্ত্বের বিরুদ্ধে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি হিসেবে একে স্বীকৃতি দিলেন ও এর প্রভাবে ভ্রান্ত দৃষ্টিকোণ থেকে স্বীয় প্রত্যয় পুনর্বিবেচনার প্রয়াস পেলেন...

বিজ্ঞানীরা অনেকসময় এমন কাজের জন্য প্রশংসিত হন যাতে তাঁদের কোন দাবী থাকে না কিংবা যা তাঁরা কখনই করেন নি। সঙ্কর প্রজন্মে বংশানুসৃতির নিয়মাবলী আবিষ্কারের জন্য মেণ্ডেল প্রশংসিত অথচ এর সাধারণ রূপরেখা তাঁর আগেও অজ্ঞাত ছিল না। বস্তুত মেণ্ডেল যে কণিকাভিত্তিক বংশানুসৃতির প্রথম প্রবক্তা সেকথা দৈবাৎ উচ্চারিত হয়। ডারউইনের ক্ষেত্রেও তারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। জনবোধ্য বিজ্ঞান সাহিত্যে ডারউইন বিবর্তনবাদের প্রবক্তা রূপে আখ্যায়িত এবং বিবর্তন তত্ত্ব প্রায়ই ডারউইনবাদ নামে পরিচিত। কিন্তু বিবর্তনবাদের ধারণা ডারউইনের আগেও অনেকেই উপস্থাপিত করেছিলেন। ডারউইনের পূর্বসূরী এক বিজ্ঞানী বিবর্তনের সুগ্রথিত ও বিস্তৃত একটি তত্ত্বের গ্রন্থনা সম্পূর্ণ করেন। এর প্রকাশকাল ডারউইনের জন্মবর্ষ — ১৮০৯ সালে। দুই খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থটির নাম 'প্রাণীবিদ্যা দর্শন' এবং এর লেখক প্রখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী জাঁ বাপতিস্ত লামার্ক।

ডারউইনের মতোই এবং তাঁর আগে লামার্ক বিবর্তন সম্পর্কে বলেছিলেন যে, পূর্বতন জীবের ক্রমাগত পরিবর্তনক্রমে নতুনের এবং সরল জীব থেকে উন্নততর জীবের উদ্ভব ঘটে। কিন্তু বিবর্তনের চালিকাশক্তি সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে মৌলিক মতপার্থক্য ছিল। প্রজাতির বিবর্তনের সঠিক চালিকাশক্তি আবিষ্কারই ডারউইনের মহত্তর অবদান।

প্রতিবেশের প্রত্যক্ষ প্রভাবেই জীবের পরিবর্তন ঘটে — এই ছিল ল্যামার্কের ধারণা। তাঁর মতে বিবর্তনের কারণ 'প্রত্যঙ্গের ব্যবহার ও অব্যবহার' এবং 'উন্নতিমুখী অন্তর্লীন প্রবণতা'।

ডারউইনই প্রথম বিজ্ঞানী, যিনি জীবজগতের সাধারণ নিয়ম রূপে প্রাকৃতিক নির্বাচনের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। ইহাই জীববিজ্ঞানে আবিষ্কৃত প্রথম সর্বব্যাপ্ত সাধারণ নিয়ম এবং এর তাৎপর্য পদার্থবিজ্ঞানে নিউটনের নিয়মাবলীর সঙ্গে তুলনীয়। এখানে ডারউইনের কোন পূর্বসূরী নেই এবং প্রজাতির বিবর্তন তত্ত্ব অপেক্ষা এর তাৎপর্য অধিকতর। তাই ডারউইন বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী।

বিবর্তন তত্ত্বে দুটি পর্যায় চিহ্নিতব্য: বিবর্তনের উপকরণ সংক্রান্ত তত্ত্ব এবং এর উপাদান ও চালিকাশক্তির তত্ত্ব। ডারউইনের গবেষণায় বিবর্তনের চালিকাশক্তি প্রশ্নটির চমৎকার ব্যাখ্যা উপস্থিত। প্রাকৃতিক নির্বাচনই যে বিবর্তনের চালিকাশক্তি, বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ তথ্যাদিতে এর নতুন নতুন প্রমাণ পরিস্ফুট হচ্ছে। বিবর্তনের উপকরণ সংক্রান্ত তথ্যাদি উপস্থাপনায় ডারউইনের আংশিক দৈন্যে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কারণ, বংশাণুবিদ্যার কোন অস্তিত্ব তখন ছিল না: প্রাকৃতিক নির্বাচনের কার্যকারিতার জন্য নির্বাচনের উপকরণবিশেষ একান্ত অপরিহার্য, এজন্য বংশানুসৃত প্রকারণের অস্তিত্ব জরুরী। বিজ্ঞানী হিসেবে নিরন্ধ্র প্রতিভার অধিকারী বলেই বিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রাথমিক উপকরণ সংক্রান্ত সমস্যাবলীর প্রায় সঠিক উত্তরদানে তিনি প্রথম সমর্থ হন। এই উপকরণ যে বংশানুসৃত প্রকারণের আপতিক উদ্ভবসঞ্জাত, সে সম্পর্কে তিনি নিঃসন্দেহ ছিলেন।

এখন 'জেঙ্কিন কুটাভাসে' আসা যাক। জেঙ্কিনের যুক্তিবিন্যাস এরূপ: ধরা যাক কোন জীবসত্তার বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটল যা তার পক্ষে উপকারী। তার সন্তানদের তাহলে কি হবে? এই প্রয়োজনীয় প্রকারণ প্রথম ও দ্বিতীয় প্রজন্মে যথাক্রমে অর্ধেক ও এক-চতুর্থাংশে খর্বিত হয়ে কয়েক প্রজন্মের পর বংশধরদের মধ্যে সম্পূর্ণ দ্রবীভূত ও বিলুপ্ত হবে। সুতরাং বিবর্তনে অতঃপর এর আর কী গুরুত্ব থাকা সম্ভব?

'অবাধ সঙ্করণের বিশোষণ ক্ষমতার প্রভাব'ই 'জেঙ্কিন কুটাভাসের' মর্মার্থ। এধরনের প্রতিবাদ উত্থাপন কোন জটিল বিষয় নয়। ডারউইনের অন্যতম প্রধান প্রতিপক্ষ প্রখ্যাত রুশ জীববিজ্ঞানী নিকোলাই দানিলেভ্স্কিও একই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যার উত্তর দেয়াই বরং কঠিনতর ছিল।

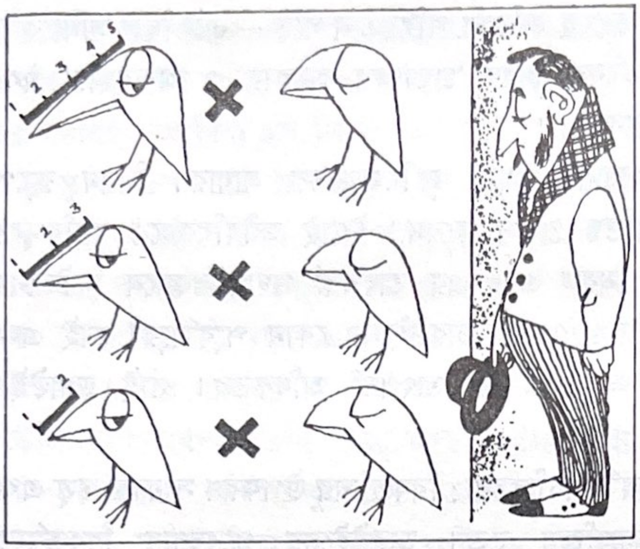

ডারইউন নিজেই এর তাৎপর্য স্বীকার করেছিলেন। অতঃপর তিনি একক আপতিক প্রকারণ অপেক্ষা গণব্যত্যয়ের ভূমিকার উপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করতে শুরু করেন। কিন্তু গণব্যত্যয় কী? কেবলমাত্র প্রতিবেশ নিয়ন্ত্রিত প্রভাবেই যেসব ব্যত্যয় সংঘটিত হয় সেগুলিই এই নামে চিহ্নিত। জীবনের শেষ পর্যায়ে বিবর্তনের প্রাথমিক উপরণের প্রশ্নে ডারউইন লামার্কীয় চিন্তার সান্নিধ্যে উপনীত হন।

ডারউইনের কালে আহৃত চারিত্র্যের বংশানুসৃতি সম্পর্কে স্বচ্ছ দৃষ্টির অভাব ছিল। কণিকাভিত্তিক বংশাণুবিদ্যা তখনো অজ্ঞাত। সুতরাং বংশানুসৃত পরিবর্তনের কারণ হিসেবে পরিবেশজাত প্রভাবের উপর গুরুত্ব আরোপ এবং অবাধ সংকরণের বিশোষক প্রভাবের বিরোধিতায় ব্যর্থতা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল।

এই সমস্যাদ্বয়ের সমাধানে কেবল বংশাণুবিদ্যাই সক্ষম ছিল। এই নতুন বিজ্ঞানের উদ্ভব দেখে অধিকাংশ ডারউইনবাদীই কেন যে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন আজ তা বিস্ময়কর মনে হতে পারে। তাঁরা যেহেতু বংশাণুবিদ ছিলেন না তাই ডারউইনবাদের একক পরিপূরক হিসেবে বংশাণুবিদ্যার ব্যবহার তো দূরে থাক, এর ভূমিকার যথাযথ মূল্যায়নেও ডারউইনবাদীরা ব্যর্থ হয়েছিলেন। আর বংশাণুবিদদের বিক্ষিপ্ত অপর্যাপ্ত তথ্যসম্বলিত গবেষণার ফলে বিবর্তনবাদ ও বংশাণুবিদ্যার সংযোগ বিধানের সম্ভাব্য প্রত্যয় শুধু পর্যুদস্তই হয়েছে, অন্য কোন লাভ হয় নি। সুতরাং প্রবীণতর বিবর্তনবাদীরা এমন প্রয়াসকে

মেণ্ডেলবাদের সাহায্যে ডারউইনবাদ প্রতিস্থাপনের ষড়্‌যন্ত্র রূপেই সন্দেহ করেছিলেন। যে সকল বিবর্তনবাদীরা ডারউইনবাদের উন্নয়নে সচেষ্ট ছিলেন তাঁরা অতঃপর নবডারউইনবাদী নামে পরিচিত হন। ডারউইনের প্রতিপক্ষে থেকেও সহজবোধ্য কারণেই তাঁরা ডারউইনবাদকে লামার্কীয় বন্ধনী থেকে মুক্ত করে তার ভারসাম্য পুনরুদ্ধারের প্রয়াস পেয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ডারউইনবাদের প্রখ্যাত প্রবক্তা রুশ বিজ্ঞানী ক্লিমেন্তি তিমিরিয়াজেভও এই ভ্রান্তি পরিহারে সক্ষম হন নি।

বিস্মৃতির অতল থেকে ফিরে পাওয়া নতুন

১৯০০ সালে মেণ্ডেলীয় বিধিগুলি পুনরাবিষ্কৃত হল। পরিত্যক্ত হল ‘মিশ্ররক্তের’ পুরানো প্রত্যয়। এমন কি গত শতাব্দীতেও সংকরণ মিশ্রণের নামান্তর রূপেই চিহ্নিত ছিল। ‘মিশ্ররক্ত’ প্রায়ই আক্ষরিক অর্থে এক রক্তের সঙ্গে অন্য রক্ত মিশ্রণের প্রক্রিয়া রূপে উল্লেখিত হত। এখন সত্যটি সুস্পষ্ট যে, বংশানুসৃতি অবিভাজ্য, অবিমিশ্র মেণ্ডেলীয় উপাদান বা জিনের উপর নির্ভরশীল। এই নতুন প্রত্যয়ের প্রভাবে স্বাভাবিকভাবেই বিবর্তনতাত্ত্বিক সমস্যাবলীর ক্ষেত্রেও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সূচিত হয়। কিন্তু বিজ্ঞানীরা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এর বিশ্লেষণের প্রয়াস পেলেন।

আউগুস্ট ভাইস্‌মান বিবর্তন তত্ত্বের ক্ষেত্রে অতঃপর ব্যাপক এক সংশয় সৃষ্টি করলেন। ভ্রান্তি সত্ত্বেও ভাইস্‌মানই সর্বপ্রথম ডারউইনবাদকে লামার্কীয় প্রত্যয়ের বন্ধন থেকে মুক্ত করলেন। তিনি বীজগমনপথ তত্ত্বেরও উদ্ভাবক এবং তদনুসারে প্রজন্মান্তরে জীবের চারিত্র্য সংক্রমণ কিছুসংখ্যক বীজকোষের উপর নির্ভরশীল। বিবর্তন তত্ত্বে প্রযুক্ত এর তাৎপর্য অনুধাবনের প্রথম দাবীদার ভাইস্‌মান। যেসকল পরিবর্তন বীজকোষে সংক্রমিত, বিবর্তনের পক্ষে শুধুমাত্র তারাই গুরুত্বপূর্ণ। ভাইস্‌মান ‘বীজকোষ নির্বাচন’ প্রত্যয়েরও প্রবক্তা এবং এই নির্বাচন যৌনকোষ পর্যায়ে সীমিত।

অতঃপরই নবডারউইনবাদ কথাটির উদ্ভব। প্রতিবেশ প্রভাবিত বংশানুসৃত পরিবর্তনের প্রত্যয়মুক্ত ডারউইনবাদের অর্থেই পরিভাষাটি প্রযুক্ত।

বংশানুসৃত প্রকারণসমূহ নিজেরা অবশ্য আপতিক। কেবলমাত্র প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমেই যে বংশানুসৃত প্রকারণের উপর জীবনশর্তের প্রত্যক্ষ

প্রভাব প্রযুক্ত হয় তা সন্দেহাতীত সত্য। কিন্তু উল্লেখ্য যে, প্রতিবেশের প্রভাবের ফলে জীবনশর্তের সর্বাধিক অনুকূল চারিত্র্যাবলীই শুধু নির্বাচিত হতে পারে। নবডারউইনবাদ কার্যত প্রজাতির উদ্ভব সম্পর্কিত ডারউইনের পূর্বতন প্রত্যয়েরই পুনঃপ্রতিষ্ঠা — যা জেঙ্কিন কুটাভাসের প্রভাবে পরবর্তীকালে অংশত পরিবর্তিত হয়েছিল।

মেণ্ডেলীয় বিধি পুনরাবিষ্কারের আগেই ভাইস্‌মান তাঁর তত্ত্ব গ্রন্থনা সম্পূর্ণ করেন। বিবর্তন তত্ত্ব সম্পর্কিত পরবর্তীকালীন আলোচনার বহুলাংশই মেণ্ডেলবাদের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল না। গত শতাব্দীর শেষ পাদের সমস্যা ছিল নবডারউইনবাদ বনাম নবলামার্কবাদ, কিংবা, বলা যায়, জীবদ্দশায় আহৃত জীববিশেষের চারিত্র্যগুলি বংশানুসৃত কি না এ সম্পর্কে মন স্থির করা।

বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় লিপ্ত ছিলেন। এই রোমাঞ্চকর প্রশ্নের মীমাংসার চেষ্টায় অনেকেই প্রকৃতির নিরীক্ষায় নিবিষ্ট হন। অনেকেই আবার গ্রন্থাগার ও মহাফেজখানা খুঁজে খুঁজে আনুষঙ্গিক বহু আকর্ষণীয় রচনাবলী আবিষ্কার করেন। দেখা গেল, আহৃত চারিত্র্যের অবংশানুসৃতি এই প্রত্যয়ে কিছুমাত্র নূতনত্ব নেই। ১৮৩৪ সালে প্রকাশিত ‘প্রকৃতির চিরন্তন নিয়ম’ নামক এক সংকলন গ্রন্থে লিখিত ছিল: ‘প্রজননের ক্ষেত্রে লেজ ও কান কাটা পশুর মতো পা ব্যবচ্ছিন্ন ব্যক্তিও সুসম্পূর্ণ জীব, কারণ পূর্ববর্তীদের সন্তানেরা যেমন খাটো লেজ-কান নিয়ে জন্মায় না, তেমনি পরবর্তীর সন্তানেরাও একপেয়ে হয় না ... যদি গাই আর ষাঁড়ের শিং কেটে ফেলা হয় তবু তাদের বাচ্চাদের শিং গজানো বন্ধ হয় না। কিন্তু অন্তর্লীন কারণেই শিংহীন (অঞ্চলবিশেষে এদের হঠাৎ দেখা যায়) গাভীর সঙ্গে যদি একই ধরনের একটি ষাঁড়ের নিষেক ঘটানো হয় তবে তাদের সন্তানও শিংহীন হয়ে থাকে।’

এই বাক্যাবলীর লেখক আকাদমিশিয়ন কার্ল বের। জীববিজ্ঞানের উন্নয়নে তাঁর অবদান গুরুত্বপূর্ণ। বের জন্মসূত্রে এস্তোনীয় এবং সেখানেই শিক্ষাপ্রাপ্ত। তিনি ডাক্তার হতে চেয়েছিলেন। দেপ্‌র্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হবার পর তিনি বিদেশে অধ্যয়ন করেন। সেখানে জীববিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হয়েই তিনি শেষ অবধি নিসর্গী হলেন। প্রথমে তিনি কনিগ্‌স্‌বার্গে কাজ করেন। ১৮৩৪ সালে তিনি রুশ বিজ্ঞান আকাদমির সদস্য নির্বাচিত হন।

বেরের সর্বাধিক উল্লেখ্য অবদান ভ্রূণবিদ্যায়। বস্তুত তিনিই এই বিজ্ঞানশাখার প্রতিষ্ঠাতা। যদিও তাঁর আগেই হার্ভে মুর্গীর ডিমের ক্রমপরিণতির নিরীক্ষা সম্পূর্ণ করেছিলেন তবু বেরই ভ্রূণবিকাশের সূক্ষ্ম

প্রক্রিয়াবলীর প্রথম ব্যাখ্যাতা। জীববংশাণুবিদ্যার নিয়মের আবিষ্কারক হিসেবে তিনি মিউলার ও হেকেলের পূর্বসূরী। এই নিয়মানুসারে জীববিশেষের ভ্রূণের ক্রমপরিণতির মধ্যেই তার প্রজাতিবিশেষের বিবর্তন ইতিহাস বিধৃত। বের ছিলেন পুরোগামী বিবর্তনবিদ। আহৃত চারিত্র্য যে বংশানুসৃত নয়, বেরই এ তথ্যের প্রথম আবিষ্কারক।

কিন্তু যাই হোক, পরীক্ষাই সত্যের যথার্থ নির্ণায়ক। পিতা-মাতার আহৃত চারিত্র্য সন্তানে সংক্রামিত হয় কি না এই পরীক্ষায় বিভিন্ন দেশের বহু বিজ্ঞানী অনেকদিন থেকেই নিবিষ্ট ছিলেন। পরীক্ষার ফলে এই বিকল্পদ্বয়ের একটিই শুধু প্রমাণিত হল। তাঁরা হয় এই সম্পর্কে না-বোধক ফলাফল পেলেন কিংবা পুনরাবৃত্ত হল কামেরারের কাহিনী: প্রথমে এতে আহৃত চারিত্র্যের বংশানুক্রম সমর্থিত হলেও পরক্ষণেই একটি ভুল আবিষ্কারে ফলাফল ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। এজন্য অনুষ্ঠিত শত শত পরীক্ষার মধ্যে কোনটিই শেষ অবধি প্রামাণ্য বিবেচিত হয় নি।

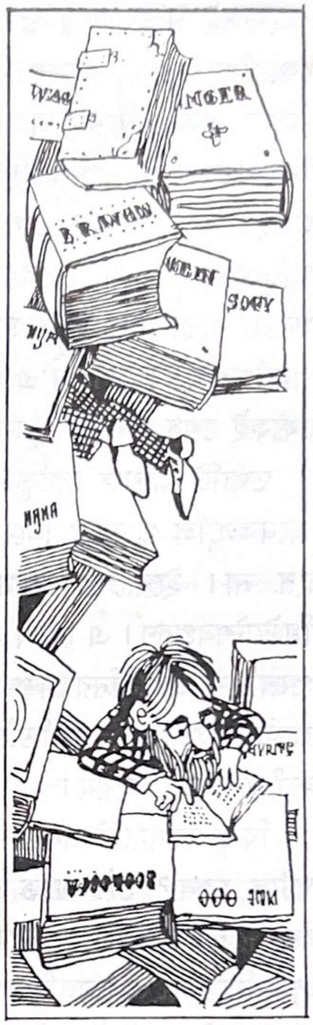

বংশাণুবিদদের কাজ শুরু

নিরীক্ষামূলক জীববিজ্ঞানীর পক্ষে কোন একক উপকরণের প্রতি আত্যন্তিক আসক্তি স্বাভাবিক। মেণ্ডেলের প্রিয়তম উপকরণ ছিল মটরশুঁটি আর মর্গানের ফলের মাছি — ড্রসোফিলা। মেণ্ডেলের পুনরাবিষ্কারকত্রয়ীর অন্যতম অধ্যাপক হুগো ডেভ্রিসের নজর ছিল ইনোথেরা *(Oenothera)* তথা ইভিনিং প্রিম্‌রোজের দিকে। এটি প্রায় এক মিটার উঁচু আর এর বড় বড় হলুদ ফুল ফোটে রাতের বেলায়। ১৮৮০ সাল থেকেই তিনি এদের প্রতি আকৃষ্ট হন। প্রথমে এদের বুনো পরিবেশেই লক্ষ্য করতেন। শেষে যে বাগানে তিনি

পছন্দসই গাছপালার প্রজনন, সংকরণ পরীক্ষা চালাতেন সেখানেই কয়েকটি কেয়ারিতে এদের জায়গা দিলেন। ইনোথেরা পরীক্ষা করে এদের মধ্যে তিনি অদ্ভুত এক প্রক্রিয়া লক্ষ্য করলেন। দেখা গেল, যদিও দৈবাৎ তবু প্রায় নিয়মিতভাবেই এদের সুসদৃশ সন্ততিদের মধ্যে নতুন নতুন প্রকারের জন্ম হচ্ছে। এদের কোন কোনটি মাতৃপ্রজন্ম থেকে এতই আলাদা যে, বুনো পরিবেশে যেকোন উদ্ভিদবিজ্ঞানীর পক্ষেও স্বতন্ত্র প্রজাতি হিসেবে এদের সনাক্ত করা সম্ভব। স্বভাবতই এই নতুনেরা বংশানুসৃত প্রকার হিসেবেই প্রমাণিত হয়। ডেভ্রিস এদের 'মিউটেশন' রূপে চিহ্নিত করলেন এবং এই সূত্র থেকেই শেষ অবধি পুনরাবিষ্কৃত হল মেণ্ডেলীয় নিয়মাবলী।

তথ্যটি অত্যন্ত কৌতুকপ্রদ যে ইনোথেরার সকল প্রজাতি (ডেভ্রিস এদের অনেকগুলি প্রজাতি নিয়েই পরীক্ষা করেছিলেন) থেকেই 'মিউটেশন' উৎপন্ন হয় না। ইনোথেরা লামার্কিয়ানা *(Oenothera lamarckiana)* বিশেষ মিউটেশনপ্রবণ। এ দেখে ডেভ্রিস যুগপৎ বিস্মিত ও পুলকিত: এ কি নতুন প্রজাতির জন্ম নিরীক্ষণ নয়? এখান থেকেই তাঁর মিউটেশন তত্ত্বের গ্রন্থনা শুরু। বিষয়টি নিয়ে তিনি বহু বৎসর কাজ করেন এবং দীর্ঘদিন প্রতিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করেন।

কিন্তু ব্যাপারটি অন্য প্রজাতিতে না ঘটে কেবলমাত্র ইনোথেরা লামার্কিয়ানারই ঘটছে কেন? তাঁর মতে এর কারণ: সম্ভবত আমাদের কালে উদ্ভিদের অন্য শ্রেণীতে প্রজাতি উদ্ভবের সম্ভাবনা অবলুপ্ত হয়েছে, কিন্তু ইনোথেরা লামার্কিয়ানা এখনো মিউটেশন পর্ব অতিক্রম করে নি।

তদবধি সবই ঠিক ছিল। মনে হল যেন বংশানুসৃত পরিবর্তনের পথরেখাই আবিষ্কৃত হয়েছে। ডেভ্রিসের জয়যাত্রা অতঃপর কুসুমিত পথেই অগ্রসর হয়েছিল। রাতারাতি নতুন প্রজাতি জন্মাল। পুরানো প্রজাতি থেকে তারা বেরিয়ে এল একেবারে 'রেডিমেড' হয়েই। প্রজাতি 'রেডিমেড' হয়ে জন্মালে প্রাকৃতিক নির্বাচনের আর প্রয়োজন কি? বলা যায় নির্বাচনের সক্রিয়তা বড় জোর প্রতিবেশে অনভিযোজিতদের উৎসাধন অবধি কার্যকরী। এর বেশী নয়।

ডেভ্রিস নিজের তত্ত্বকে আরো বিকশিত করলেন। তাঁর ধারণানুযায়ী প্রত্যেক প্রজাতির ইতিহাসই দুটি পর্যায়ে বিভক্ত: একটি মিউটেশন-পূর্ব পর্ব — আশু পরিবর্তনের প্রস্তুতির সময়, অন্যটি মিউটেশন-উত্তর পর্ব — যখন নতুন প্রজাতিরা উদ্ভূত হয় এবং তা একলাফে। এসব কালক্রম বাহ্য প্রতিবেশের সঙ্গে

কোথায় যুক্ত? মনে হয় কোথাও নয়। বিবর্তন অন্তর্লীন কোন কারণের শর্তেই সক্রিয়।

মিউটেশন পর্বে প্রজাতির সংখ্যা এত কম কেন? ডেভ্রিস ভাবলেন: মিউটেশন হার সর্বকালে সমমাত্রিক থাকে নি। আজকের তুলনায় অতীতে মিউটেশন হার অধিকতর ছিল। বিবর্তন প্রক্রিয়া এখন মন্দীভূত — শেষে এমন এক সিদ্ধান্তেই তিনি মন স্থির করলেন।

এই গণের (ইনোথেরা লামার্কিয়ানা সহ) কোন কোন প্রজাতির বংশানুসৃতি যে অস্বাভাবিক ছিল এই তথ্যটি অবশ্য বহু বছর পরে জানা গিয়েছিল। কোষ বিভাগকালে এদের ক্রমোসোম সংখ্যার ব্যাপক রদবদল ঘটে, এরা বৃহদাকার যৌগ সৃষ্টি করে পরস্পরের সঙ্গে শৃঙ্খল বা অঙ্গুরীবৎ যুক্ত থাকে। এই যৌগাবলী পরস্পর থেকে পৃথক না হয়ে এভাবেই প্রজন্ম প্রজন্মান্তরে সঞ্চারিত হয়। এর কোন কোন বন্য প্রকার আত্যন্তিক অসমভ্রূণাণুজাত। এই অস্বাভাবিকতার জন্যই তাদের পৃথকীভবন ঘটে না এবং এদের বিশুদ্ধ প্রজাতির অনুরূপ মনে হয়। ক্রসিং-ওভারের ফলে দৈবাৎ এদের এই যৌগ পুনর্বিন্যস্ত হয় এবং তখনই ডেভ্রিস কথিত মিউটেশনের উদ্ভব ঘটে।

বংশাণুবিদদের ভাষায় এখনও একক জিনের বংশানুসৃত পরিবর্তনই মিউটেশন। মর্গান ও তাঁর সহকর্মীরা ড্রসোফিলার যে সকল রূপান্তরিত চারিত্র্য (পরিবর্তিত চক্ষু কিংবা দেহবর্ণ, পক্ষশিরার বিন্যাস, কূর্চের অবস্থান...) লক্ষ্য করেছিলেন আজকাল তা মিউটেশন রূপেই চিহ্নিত। এরা যে সত্যিই বিবর্তনের প্রাথমিক উপকরণ এই তথ্যটি আমরা অল্পক্ষণ পরেই

জানতে পারব। ডেভ্রিসের এই সাফল্য সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাঁর সমকালেই রুশ উদ্ভিদবিজ্ঞানী সের্গেই কর্জিন্স্কি বিবর্তনে বংশানুসৃতির আকস্মিক পরিবর্তন বা উল্লম্ফনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে তাঁর বিসম উৎপত্তির তত্ত্ব সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

এক অর্থে ডেভ্রিসের মিউটেশন আসলে নতুন কোন পরিবর্তন নয়। ইনোথেরা চারিত্র্যের এই কোষবংশানুসৃতির পক্ষে দীর্ঘকাল সংগুপ্ত অবস্থায় অদৃশ্য থাকা সম্ভবপর ছিল। অন্যপক্ষে এগুলো প্রাথমিক প্রকারণ (যথার্থ মিউটেশনের মতো) নয়, পরিবর্তনের এক জটিল যৌগ। তাছাড়া সত্যিকার এক-একটি প্রকার হলেও এরা আসলে নতুন কিছু নয়। ইনোথেরা মিউটেশনের অস্বাভাবিক চারিত্র্য ডেভ্রিসকে সমগ্র বিবর্তন প্রক্রিয়া সম্পর্কে এক ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে প্রভাবিত করেছিল।

ডেভ্রিস চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলেন। তাঁর অন্যতম প্রতিবাদী ছিলেন তাঁরই স্বদেশবাসী অধ্যাপক জে. পি. লট্সি। কয়েক প্রকার বাহারী উদ্ভিদ, অ্যাণ্টিরিনাম ও কার্নেশনের আন্তঃপ্রাজাতিক সংকরণের জন্য তিনি স্বনামখ্যাত। মেণ্ডেল যে অর্থে এক বা দুই বৈশিষ্ট্যে পৃথক প্রকারসমূহের মধ্যে সতর্কতা ও আত্যন্তিক অধ্যবসায়ের সঙ্গে সংকরণ ঘটিয়েছিলেন তা লট্সির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত নয়। বহু বৈশিষ্ট্যে পৃথক প্রজাতি সংকরণে সন্ততিদের মধ্যে যে অসংখ্য প্রকারের উদ্ভব ঘটে তাদের বাছাই করা দুঃসাধ্য। এ জাতীয় সংকরণ প্রচেষ্টার শরিক ছিলেন গের্ট্নার, নোদেন এবং মেণ্ডেলের অন্যান্য পূর্বসূরীরা।

অন্তঃপ্রাজাতিক সংকরণের ফলে মেণ্ডেল অগ্রগামীর ভূমিকা পালন করেছিলেন। কিন্তু লট্সির পথ ছিল পশ্চাৎমুখীন। আন্তঃপ্রাজাতিক সংকরণজাত অজস্র প্রকার দেখে বিমুগ্ধ লট্সি সংকরণকেই বিবর্তনের একমাত্র কারণ রূপে চিহ্নিত করলেন। অ্যাণ্টিরিনামের সন্ততিদের মধ্যে এত অসংখ্য 'নতুন প্রজাতি' দেখলে বেচারী আর কিই-বা করতে পারতেন।

আহৃত চারিত্র্যের তথাকথিত রূপান্তরসমূহ যে বংশানুসৃত নয় এবং এজন্যই যে বিবর্তনে এদের ভূমিকা শূন্য, সে সম্পর্কে লট্সির মনে কোন সন্দেহ ছিল না। তাহলে এর বিকল্প ডেভ্রিসের মিউটেশন? বংশানুসৃত পরিবর্তন হিসেবে এদের গ্রহণ করতে লট্সি অস্বীকৃত হলেন। প্রজাতি উদ্ভবে সংকরণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রবক্তারূপে লট্সি ডেভ্রিসের মিউটেশনকেও সংকরণের ফল হিসেবেই চিহ্নিত করলেন।

এবং যদি তাই হয়, তবে সংকরণই তো বিবর্তন প্রক্রিয়ার একমাত্র পন্থা। লট্‌সির মতে প্রজাতিরা বংশানুসৃত সমসত্ত্ব সংস্থা। যদি তাই হয়, তবে সংকরণের ফলে যা আছে এবং যা চিরকাল ছিল শুধু তার পুনর্বিন্যাস ছাড়া আর কী ঘটা সম্ভবপর। তিনি 'বিবর্তনে প্রজাতির স্থায়িত্ব' নামে এক তত্ত্ব উপস্থাপন করলেন। এঁর বক্তব্য: প্রজাতি যেহেতু স্থায়ী সত্তা, তাই সামান্য বংশানুসৃত প্রকারণের নির্বাচনে বিবর্তনও সম্ভবপর নয়। এর অর্থ ডারউইন ভ্রান্ত এবং তাই ছিল লট্‌সির সিদ্ধান্ত।

সকল প্রকার বংশানুসৃত পরিবর্তনের মধ্যে কেবলমাত্র বিনষ্ট জিনের সম্ভাব্যতাকেই লট্‌সি স্বীকার করেছিলেন। এই মতানুসারে প্রজাতির ক্রমোন্নয়নের ইতিহাস তার 'জিন ভাণ্ডারের' পুনর্বিন্যাস ও জিনক্ষয়জনিত প্রত্যাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

তাহলে আজকের এত প্রকার জীবজন্তুর উৎস কী? এর ব্যাখ্যায় লট্‌সি এক সাধারণ পূর্বপুরুষজাত জীবজগৎ উদ্ভবের তত্ত্বটি প্রত্যাখ্যান করে এর বিকল্প হিসেবে প্রাথমিক পর্বে বহু প্রকার জীবের স্বতন্ত্র, স্বয়ম্ভু উদ্ভবকে সমর্থন করলেন। তিনি জীব ও জড় প্রকৃতির মধ্যে উপমা অংকণের প্রয়াস পান: তাঁর মতে জিন যেন রাসায়নিক পদার্থ এবং এগুলির বিবিধ সমাবন্ধনই যেন প্রকার উদ্ভবের প্রক্রিয়া। সুতরাং লট্‌সি ডারউইনবাদ থেকে যাত্রারম্ভ করলেও শেষ অবধি ডারউইনবাদের চূড়ান্ত বিরোধিতায়ই নির্ধারিত হল তাঁর পরিণতি।

প্রখ্যাত ডাচ বংশাণুবিদ ভিলেম ইয়োহান্‌সেন প্রকার উদ্ভবে নির্বাচনের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত ও সুনির্দিষ্ট গবেষণা করেছিলেন। নির্ভুলতা ও নির্ভরতার জন্য তাঁর পরীক্ষা আদর্শস্বরূপ। মেণ্ডেলের মতো তিনিও পরীক্ষার উপকরণ নির্ণয়ে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন এবং তাঁরই অনুরূপ স্বপরাগী উদ্ভিদ নিয়ে পরীক্ষা করেন। তাঁর পরীক্ষার উপকরণ ছিল 'প্রিন্সেস্' জাতীয় কিডনি শিম।

ইয়োহান্‌সেন শিম চাষ করতেন, ফসল তুলতেন, বীজের আয়তন মাপতেন। প্রতি গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করে আলাদাভাবে তাঁকে এদের মাপজোখ নিতে হত। অতঃপর গ্রাফ তৈরি করে মোট ফসলের এবং প্রতিটি গাছের বীজের আকারগত তারতম্যের বিন্যাস তিনি চিহ্নিত করতেন। কেবল গাছ থেকে গাছেই নয়, সাধারণভাবে বীজের আকারগত পার্থক্যেরও কোন কমতি ছিল না। একই গাছের বীজেরা সবসময়ই ছোট-বড় হত।

অতঃপর ইয়োহান্‌সেন বীজ বাছাই করতে শুরু করলেন। এখানে তিনি

তাঁর পূর্বসূরীদেরই অনুসরণ করলেন। তিনি মোট ফসল থেকে সবচেয়ে বড় আর সবচেয়ে ছোট বীজ আলাদা করে তাদের বপন করলেন। এদের সন্ততিদের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি পুনরাবৃত্ত হল। অন্যদের মতো তিনিও উল্লেখ্য ফলাফল পেলেন। এক ক্ষেত্রে বীজের গড় মাপ বাড়ল, অন্যত্র আবার তা কমল। কিন্তু ইয়োহান্‌সেন থামলেন না।

তিনি এই সঙ্গে ‘বিশুদ্ধ ধারা’ নির্বাচন শুরু করলেন অর্থাৎ একই গাছের সন্তানদের মধ্যে নির্বাচন অব্যাহত রাখলেন। তাই তাঁর পরীক্ষায় স্বপরাগায়ণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়েছিল। এভাবে উৎপন্ন সন্ততিরা বংশানুসৃতি বৈশিষ্ট্যে সমসত্ত্ব ছিল। বিশুদ্ধ ধারার সীমানায় বীজের আয়তনে যথেষ্ট তারতম্য ঘটলেও নির্বাচন নিষ্ক্রিয় প্রমাণিত হল। দেখা গেল, যত দীর্ঘকালই প্রক্রিয়াটি অব্যাহত রাখা হোক না কেন, শিমবীজের গড় আয়তনের কোনই পরিবর্তন ঘটে না এবং প্রকারণের মাত্রাও অপরিবর্তিত থাকে।

বিশুদ্ধ ধারায় নির্বাচন অপ্রয়োজনীয় — তাঁর নিখুঁত পরীক্ষা থেকে ইয়োহান্‌সেন এই মীমাংসায় উপনীত হলেন। সিদ্ধান্তটি ছিল অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ। একপক্ষে স্পষ্টতই প্রমাণিত হল — বিশুদ্ধ ধারায় প্রকারবিশেষের ক্রমপরিণতিতে যে পরিবর্তন ঘটে বিবর্তনের উপকরণ হিসেবে তাদের ভূমিকা শূন্যের কোঠায়। অন্যপক্ষে, নির্বাচন যে কেবলমাত্র বিসম বংশানুসৃত জীবকুলেই সক্রিয় এই পরীক্ষায় তা নির্ণীত হল।

ইয়োহান্‌সেন যখন পরীক্ষা শুরু করেন মিউটেশন তখনো অজ্ঞাতপ্রায়। সম্ভবত সেজন্য তিনি তখনই পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন নি এবং বংশানুসৃতির নতুন নতুন পরিবর্তনের বিবর্তনগত তাৎপর্য নির্ধারণে ব্যর্থ হয়েছিলেন। বিবর্তন তত্ত্ব গ্রন্থনায় বংশাণুবিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার যাথার্থ্য সম্পর্কে শুরুতে তিনি সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে যেসব বিবর্তনবিদ বংশাণুবিদ্যার সমস্যা সম্পর্কে সর্বাধিক সক্রিয় ও সফল গবেষণা করেছিলেন তিনি তাঁদের অন্যতম রূপে পরিগণিত হন।

স্মরণীয় যে ইয়োহান্‌সেনই ‘জিন’ শব্দটির উদ্ভাবক।

ডেভ্রিসের মিউটেশন তত্ত্ব, বিবর্তন প্রক্রিয়ায় প্রজাতির স্থায়িত্ব তত্ত্ব, ইয়োহান্‌সেনের বিশুদ্ধ ধারা সম্পর্কে পরীক্ষা এই শতকের শুরুর দিকের ঘটনা, যখন মেণ্ডেলের নিয়মাবলী পুনরাবিষ্কৃত, বংশানুসৃতির ক্রমোসোম তত্ত্ব পরিস্ফুটমান এবং বংশাণুবিদ্যাকে উন্নততর পর্যায়ে সংস্থাপনকারী মর্গান দলের বিস্ময়কর ড্রসোফিলা গবেষণার আরম্ভকাল অদূরবর্তী। নব নব

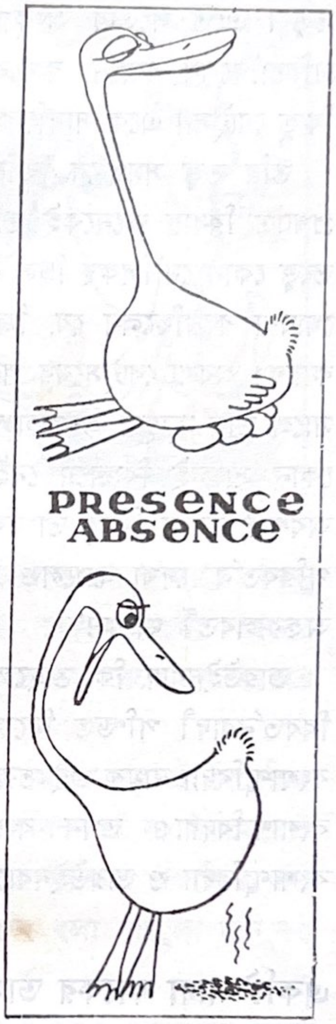

বংশানুসৃত চারিত্র্য উদ্ভবের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে স্বচ্ছ দৃষ্টির অভাবকেই বিবর্তনানুগ বংশাণুবিদ্যার প্রাথমিক তত্ত্বাবলীর মৌলিক দুর্বলতা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তারা যেখানে নেই ডেভ্রিস সেখানেই তাদের দেখতে পেলেন আর লট্‌সিতে অস্বীকৃত হল তাদের সর্বৈব অস্তিত্ব।

যা হোক, কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে মর্গানের গবেষণাগারে ড্রসোফিলা নিয়ে কাজ শুরুর পরই বংশানুসৃতির পরিবর্তন সংক্রান্ত ঘটনাবলীর সত্যতা নবপর্যায়ে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হল। সেই অক্লান্তশ্রমী গবেষকরা মিউটেশন বা নতুনভাবে পরিবর্তিত বংশানুসৃতির শত শত দৃষ্টান্ত আবিষ্কার করলেন। এখানেই বিবর্তন প্রক্রিয়ার প্রাথমিক উপকরণের খোঁজ মিলল।

অথচ তখনকার অবস্থা একেবারে আলাদা। মিউটেশনের অস্তিত্ব তর্কাতীতভাবে প্রমাণিত হলেও এদের প্রকৃতির মূল্যায়ন এবং বিবর্তনে এদের ভূমিকানির্ণয় সম্পূর্ণ আলাদা প্রসঙ্গ।

দৃষ্টান্ত হিসেবে ইংলন্ডের বিখ্যাত প্রাণীবিজ্ঞানী ও বংশাণুবিদ উইলিয়াম বেট্‌সন স্মর্তব্য। মেণ্ডেলবাদের ক্রমোন্নয়ন ও ডারউইনবাদ থেকে লামার্কীয় প্রত্যয় পরিমার্জনায় তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মিউটেশনের প্রকৃতি সম্পর্কে বহু চিন্তাভাবনার পর তাঁর মনে এক কুশলী ধারণার যদিও যথেষ্ট মৌলিক নয়) উন্মেষ ঘটল। তিনি দেখলেন, সকল বংশানুসৃত পরিবর্তনকেই চারিত্র্যবিশেষের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির নিরিখে চিহ্নিত করা যায়। তাছাড়া সেই জীবের কোষমধ্যে অপরিহার্য বিশেষ জিনের (যেটি এই চারিত্র্য গঠনের নিয়ন্ত্রক) উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির নজির দেখিয়ে এর ব্যাখ্যাও সম্ভবপর। সুতরাং বেট্‌সন বংশানুসৃত সকল পার্থক্যকেই জিনবিশেষের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির সূত্র থেকে ব্যাখ্যা করতে শুরু করলেন। তদনুসারে তাঁর তত্ত্বের নামকরণ হল 'উপস্থিতি — অনুপস্থিতি

তত্ত্ব'। এতে সত্যের অংকুর ছিল। এখন আমরা নিশ্চিতভাবেই জানি যে, চারিত্র্যবিশেষ কখনো কখনো জিনবিশেষের অনুপস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কিত, কিন্তু বেট্‌সন একে সামগ্রিক সত্য বলে ভুল করেছিলেন।

তাঁর তত্ত্ব সমর্থনে তিনি অটল থাকলেন। বিরাট বিশেষজ্ঞ ও তৎকালে প্রখ্যাত বিধায় অনেকেই তাঁর মতে আস্থা স্থাপন করলেন। কিন্তু বেট্‌সনের তত্ত্বে কোন মৌলিকত্ব ছিল না। বিখ্যাত ডারউইনবিরোধী লট্‌সি ইতিপূর্বেই ঘোষণা করেছিলেন যে, জিন-অপসৃতিই বংশানুসৃত নতুন চারিত্র্য উদ্ভবের কারণ। অবশ্য বেট্‌সনের পক্ষে এই সমসিদ্ধান্তে উত্তরণও যুক্তিগ্রাহ্য। ১৯২৬ সালে তাঁর মৃত্যুর অল্পকাল আগে তিনি প্রচার শুরু করলেন যে, বিবর্তনের কোন সাক্ষ্যই বিজ্ঞানে নেই। তাঁর ধারণানুসারে পৃথিবীতে নতুন প্রজাতি অবশ্যই জন্মে কিন্তু তা বিশ্বাস মাত্র। তিনি বললেন, 'প্রকারভেদ ইত্যাকার পরিবর্তন দেখা গেলেও প্রজাতির উৎপত্তি চিরদিনই আমাদের দৃষ্টির অন্তরালবর্তী থাকে।'

ডারউইনবাদ কি তাহলে কানাগলিতেই অবরুদ্ধ হল? মোটেই না। বহু বিবর্তনবাদী পন্ডিত নিজেদের গবেষণা নিয়েই তখন ব্যস্ত। বিবর্তন তত্ত্বে বংশাণুবিদ্যা নামক এই তরুণ বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশের তাঁরা বিরোধী ছিলেন। বংশাণুবিদরাও তখন বংশানুসৃতির ক্রমোসোম তত্ত্ব গ্রন্থনায় নিবিষ্ট। বংশাণুবিদ্যা ও ডারউইনবাদের পারস্পরিক মৈত্রীবন্ধনের তখনো অনেক দেরি।

একটি সাদা কাকের ভাগ্য

আবার 'জেঙ্কিন কুটাভাসে' ফেরা যাক। এর সমাধান ব্যতীত ডারউইনবাদের অগ্রগতি সম্ভবপর ছিল না। কেবলমাত্র বংশাণুবিদ্যায়ই নিহিত ছিল এর উত্তর। কাজটি শুরু হতে পারত কেবল ডারউইনবাদ ও বংশাণুবিদ্যার সংযোগ থেকেই।

কেউ কেউ ঠিক ওখান থেকেই কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা না ছিলেন বংশাণুবিদ, না ডারউইনবাদী। 'জেঙ্কিন কুটাভাসের' প্রবক্তার মতো এর সমাধানকারীও জীববিজ্ঞানী ছিলেন না।

ধরা যাক, বহু হাজার কালো কাকের মধ্যে জন্ম নিল একটি সাদা কাক। কিন্তু তার মৃত্যুর পর? কী হবে তখন? সাদা রঙ বংশানুসৃত চারিত্র্য এবং সাদা কাক না হোক তার সন্তানদের জন্য এটি একটি প্রচ্ছন্ন চারিত্র্য। সাদা

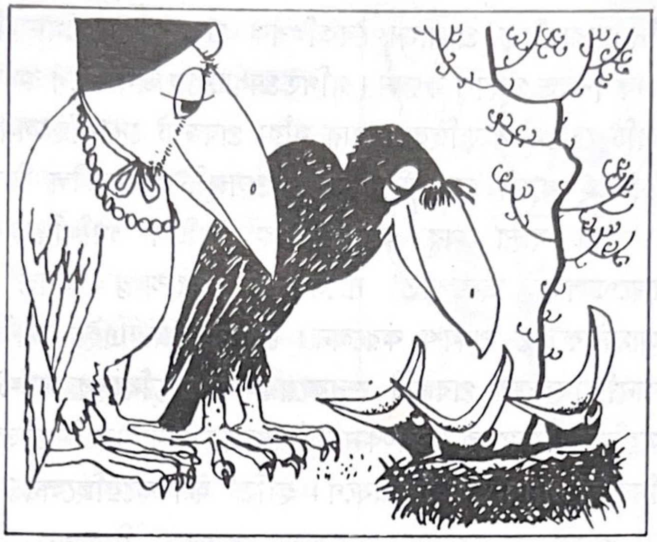

কাকটি কালো কাকের সঙ্গে মিলিত হয়ে কালো রঙের সন্তান জন্মাবে। কিন্তু তারা কেবল বাহিরেই কালো। প্রত্যেকেই এরা প্রকট কালো জিনের সঙ্গে সাদা রঙের প্রচ্ছন্ন মিউটেশনেরও বাহক। কিন্তু প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে এসব জিনের পরিণতি কী হবে?

ডারউইন ও জেঙ্কিনের কালে বংশানুসৃতি 'রক্ত মিশ্রণ' রূপেই বিবেচিত হত। সেখানে এই সাদা রঙ অবশ্যই সমুদ্রে কালিবিন্দুবৎ যা ইতিমধ্যেই বিপুল জলরাশিতে বিলুপ্ত। এমতাবস্থায় পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রজাতির এত প্রাণী ও উদ্ভিদের অস্তিত্ব এক বিস্ময়কর ঘটনা এবং বলা বাহুল্য মানুষও তার ব্যতিক্রম নয়।

মেণ্ডেল প্রমাণ করেন যে, বংশানুসৃতির উপাদান তরল পদার্থের বিন্দু নয়, এরা অনেকাংশে অবিভাজ্য কণাবৎ। এখন এদের জিনই বলা যাক। সাদা রঙের জিন তুলনা হিসেবে সাগরে ঢালা কালিবিন্দু অপেক্ষা খড়গাদায় হারানো সূচেরই ঘনিষ্ঠতর উপমা: খুঁজে পেতে কষ্ট হলেও তা সেখানে আছেই। তাতে কী? যদি বংশানুসৃতির কণিকাবৎ প্রকৃতিকে আমরা স্বীকারও করি তবু বিবর্তনে এই একক আপতিক পরিবর্তনের ভূমিকা কী, তার সঠিক উত্তর সহজ নয়। নির্ভুল বিচারবিশ্লেষণ এজন্য অপরিহার্য।

বিশ শতকের শুরুর দিকে মেণ্ডেলীয় নিয়মাবলী পুনরাবিষ্কারের পরপরই প্রাকৃতিক জীবগোষ্ঠীতে প্রাণীবর্গের বংশানুসৃতি পরিবর্তনের সমস্যা বিখ্যাত ব্রিটিশ গণিতবিদ কার্ল পিয়ারসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯০৪ সালে 'দর্শন সমিতির কার্যবিবরণী'তে তিনি 'বিশেষভাবে মেণ্ডেলীয়

নিয়মাবলীতে প্রযোজ্য বৈকল্পিক প্রকারণের সামান্যীকৃত তত্ত্ব প্রসঙ্গ' নামে এক নিবন্ধ প্রকাশ করেন। গণিতপ্রাধান্যের জন্য খুব কমসংখ্যক জীববিজ্ঞানীরই এটি চোখে পড়েছিল। আর যাঁরা প্রবন্ধটি দেখেছিলেন তাঁরাও এর মাথামুণ্ডু কিছুই খুঁজে পান নি। অথচ প্রসঙ্গটি মননশীল ছিল।

চার বছর পর আরো এক ব্রিটিশ গাণিতিক 'মিশ্র জীবগোষ্ঠীতে মেন্ডেলীয় অনুপাত' নামে এক সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ আমেরিকার 'সায়েন্স' সাময়িকীতে প্রকাশ করলেন। লেখক জি. এইচ. হার্ডি। সরল ভাষার জন্য অনতিবিলম্বে প্রবন্ধটি জনকয়েক বংশাণুবিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধেই 'জেঙ্কিন কুটাভাসের' সমাধান নির্ণীত হয়েছিল এবং সম্পূর্ণ নির্ভুল গাণিতিক বিশ্লেষণে। হার্ডি কী করেছিলেন?

অবাধ সংকরণের ভারসাম্য সংক্রান্ত নিয়মের তিনি আবিষ্কারক ও প্রমাণকারী। এখন এটি 'হার্ডি সূত্র' নামে বিশ্বখ্যাত। অবাধ সঙ্করণে যে শর্তে সম- ও অসমভ্রূণাণুজাতদের অনুপাত অপরিবর্তিত থাকে, নিয়মটিতে তাই নির্দেশিত হয়েছিল। সাদা ও কালো কাকের সন্ততিদের সম্পর্কে এর বক্তব্য: কালো কাকসম্প্রদায়ের মধ্যে ধবল জিনটি অনির্দিষ্ট কাল সজীব থাকবে এবং এই প্রচ্ছন্ন ধবল জিনবাহীদের সংখ্যারও পরিবর্তন ঘটবে না।

তাছাড়াও হার্ডির নিবন্ধে পিয়ারসনের সিদ্ধান্তসমূহ পুনরাবৃত্ত হয়েছিল। হার্ডি একেই সহজতরভাবে প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় নিয়মটি এখন পিয়ারসন সূত্র নামেই খ্যাত এবং হার্ডি সূত্র স্পষ্টতই এতদ্দ্বারা প্রভাবিত। ইহাই সুস্থিত সঙ্করণের নিয়ম। পিয়ারসনের নিয়মানুসারে অবাধ সঙ্করণের ফলে যেকোন জীবগোষ্ঠীর মধ্যে প্রথম সঙ্করণের পরই একটি ভারসাম্য সৃষ্টি হয়, যা প্রারম্ভিক সম- ও অসমভ্রূণাণুজাতদের অনুপাতে প্রভাবিত হয় না।

পিয়ারসন ও হার্ডির উল্লিখিত ফলাফলে আংশিক অসঙ্গতি থাকলেও এর যাথার্থ্য প্রশ্নাতীত ছিল। এগুলো মেন্ডেলীয় বিধির প্রত্যক্ষ গাণিতিক সম্প্রসারণ মাত্র আর মেন্ডেলীয় নিয়মাবলীর শুদ্ধতা তো প্রমাণিত।

হার্ডি জীববিজ্ঞানে আর কোন কাজ করেন নি। তিনি অবাধ সঙ্করণ-প্রবৃত্ত অতি বৃহৎ, মিউটেশনবিহীন প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রভাববহির্ভূত এক 'আদর্শ' জীবগোষ্ঠী সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। তিনি যদি সব উপাদান বিবেচনা করতেন তবে বংশাণুবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে বিবর্তন তত্ত্বের ব্যাখ্যা সম্ভবপর হত। কাজটি হার্ডির আয়ত্তাধীন ছিল না। তিনি যে

জীববিজ্ঞানী নন, শুধু তাই এর একমাত্র কারণ নয়। বস্তুত মিউটেশন উদ্ভবের সমস্যা এবং তাদের প্রকৃতি তখনো অমীমাংসিত ছিল।

বিশের দশকের মধ্যভাগের আগে অবধি সমস্যাটি সম্পর্কে কোন স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটে নি। মিউটেশন যে সকল জীবে সর্বত্রগামী, অতঃপর এতে আর সন্দেহ ছিল না। তথ্যটি প্রমাণের জন্য ড্রসোফিলার গবেষণাই পর্যাপ্ত ছিল। এই মাছির অবিমিশ্র চাষ থেকে পাওয়া মিউটেশনের সংখ্যা তখনই প্রায় চার শো। ওদের প্রত্যেকেরই সার্বিক অনুসন্ধান ততদিনে সুসম্পূর্ণ এবং এর ফলশ্রুতিস্বরূপ পরিবর্তিত বংশানুসৃতির নিদর্শনও প্রমাণিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন্ বিশেষ ক্রমোসোম এবং এর কোন্ অংশবিশেষ মিউটেশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাও নির্ণীত হয়েছিল।

কেবলমাত্র ড্রসোফিলার মধ্যেই পরীক্ষাটি সীমিত ছিল না। গৃহপালিত প্রাণী, ফসলী উদ্ভিদ সহ পরীক্ষাসাধ্য বহু প্রজাতির মধ্যেও মিউটেশন চিহ্নিত হয়েছিল।

তবু মিউটেশন প্রক্রিয়াটির প্রকৃতি অনুদ্ঘাটিত রইল। সেকালে জীববিজ্ঞানী ও বংশাণুবিদদের সাধারণ বিশ্বাস ছিল, মিউটেশন গৃহপালন অথবা গবেষণাগারের প্রভাবেরই ফল। যা গবেষণাগারে ঘটছে স্বভাবতই তা প্রকৃতির রাজ্যে ঘটছে না — এই প্রত্যয় অপনোদন কঠিন। কোন প্রাণীর বংশানুসৃতি বিশ্লেষণ গবেষণাগার ব্যতীত অসম্ভব।

ধরা যাক, প্রকৃতিজাত মিউটেশনের নজির দেখানো সম্ভব। কিন্তু কীভাবে? এরা যে সত্যিকার অর্থেই মিউটেশন এবং লট্সি অভিযুক্ত পূর্বতন জিনের নতুন বিন্যাস নয়, তার প্রমাণ কী?

কিন্তু যদি আমরা প্রমাণও করি যে বংশানুসৃতির স্বাভাবিক পরিবর্তন পুনর্বিন্যাসের ফল নয় এবং তা বিশেষ ক্রমোসোমের বিশেষ লোকাসের পরিবর্তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তবু তখনো বেট্সনের 'উপস্থিতি — অনুপস্থিতি'

তত্ত্বের প্রতিকূলতা থেকে রেহাই মেলা কঠিন। কী করে আমরা প্রমাণ করব এর কারণ জিনের পরিবর্তন, বিলুপ্তির ফল নয়?

বিবর্তন তত্ত্বের পরবর্তী অগ্রগতির জন্য ডারউইনবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে সমকালীন বংশাণুবিদ্যার আবিষ্কার ও সিদ্ধান্তসমূহের পরীক্ষা-নিরীক্ষা যে প্রয়োজন, পিয়ারসন ও হার্ডির গবেষণার পর তা আর অস্পষ্ট ছিল না। হার্ডির প্রত্যয়াবলী সম্প্রসারণের জন্য কোন কাজই যে হয় নি তা নয়। পৃথক ও আংশিক সমস্যাবলীর কিছু সমাধান ও গৃহপালিত পশু নির্বাচনের সঠিক পদ্ধতি তখন নির্ণীত হয়েছিল। কিন্তু সার্বিক সামান্যীকরণের জন্য ডারউইনবাদের অপরিহার্য অগ্রগতি তখনো দুর্নিরীক্ষ্য।

সেই গুরুত্বপূর্ণ সংশ্লেষ

'বিবর্তন ও বংশাণুবিদ্যা সংশ্লেষের পথ কী? কীভাবে এই মৌলিক জীবতাত্ত্বিক সমস্যালগ্ন প্রত্যয়বৃত্ত আর আধুনিক বংশাণুতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ও ধারণাবলীর সংযোগবিধান সম্ভব? ডারউইন ও তাঁর প্রত্যক্ষ উত্তরসূরীদের বায়বীয়, অনিয়ত, অস্পষ্ট বংশানুসৃতি-প্রত্যয় পরিহার করে কেবলমাত্র বংশাণুবিদ্যার প্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলীর ভিত্তিতে প্রকারণের সমস্যাবলী, অস্তিত্বের সংগ্রাম ও নির্বাচন অর্থাৎ এককথায় ডারউইনবাদের পর্যালোচনা কি সম্ভব?'

এভাবেই জনৈক বিজ্ঞানী বংশাণুবিদ ও বিবর্তনবিদের সমস্যাকে সূত্রবদ্ধ করেছিলেন। বস্তুত অনেকের কাছেই তখন সমস্যাটি আর অস্বচ্ছ ছিল না। কিন্তু বিজ্ঞানীটি শুধু প্রশ্ন উত্থাপনেই নিরস্ত হন নি, এর সমাধান নির্ণয়েও সফল হয়েছিলেন এবং অতি স্বচ্ছ ও বিশ্বাস্যভাবে।

যে নিবন্ধ থেকে এই তথ্যাদি পরিবেশিত তার মুদ্রণকাল ১৯২৬ সাল। লেখক সের্গেই চেৎভেরিকভ, এ শতাব্দীর অন্যতম আকর্ষী রুশ বিজ্ঞানী। প্রাণীবিদ হিসেবেই বিজ্ঞানে তাঁর প্রথম প্রবেশ। তিনি প্রজাপতি বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং আজীবন তাঁর এ ভালবাসা অটুট ছিল। ড্রসোফিলা গবেষণায় মর্গান ও তাঁর দলের সাফল্যের কথা জেনে যে সকল রুশ বিজ্ঞানী এই অনন্যসাধারণ উপকরণ নিয়ে প্রথম কাজ শুরু করেন চেৎভেরিকভ তাঁদের অন্যতম। ড্রসোফিলা গবেষণার পর্যালোচনা ও পুনরাবৃত্তির জন্য তাঁর নেতৃত্বে ১৯২১ সালে এক গবেষণাচক্র সংগঠিত হয়। ১৯২৬ সালে লিখিত

'আধুনিক বংশাণুবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে বিবর্তন প্রকরণের কিছু বৈশিষ্ট্য' নামক যে নিবন্ধের জন্য চেৎভেরিকভের বিশ্বখ্যাতি তার রচনাকালেই অভিজ্ঞ গবেষক রূপে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এর পরের বছর বার্লিনে অনুষ্ঠিত পঞ্চম বংশাণুবিদ্যা কংগ্রেসে তিনি নিবন্ধটির মূল বক্তব্য পেশ করেন। কংগ্রেসের দুটি আলোড়নকারী ঘটনার অন্যতম ছিল চেৎভেরিকভের রিপোর্টটি (দ্বিতীয়টি পরে উল্লিখিত হবে)। দীর্ঘ করতালিতে নিবন্ধটি অভ্যর্থিত হল। বংশাণুবিদরা বছরের পর বছর যে স্বপ্নে বিভোর ছিলেন হঠাৎ তাই তাঁদের সামনে প্রমূর্ত হল। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী হোল্ডেন মঞ্চে উঠে চেৎভেরিকভকে আলিঙ্গন করলেন; মর্গানশিষ্য জে. এইচ. মুলার এবং আধুনিক জীবগণিতের প্রতিষ্ঠাতা রোনাল্ড ফিশারও তাঁর অনুসরণ করলেন।

চেৎভেরিকভের আলোচিত তিনটি মৌলিক সমস্যা: প্রাকৃতিক পরিবেশে মিউটেশনের উদ্ভব, অবাধ সঙ্করণে মিউটেশনের পরিণতি এবং এমতাবস্থায় নির্বাচনের তাৎপর্য।

মিউটেশন সমস্যার জটিলতা তখনো অনুদ্ঘাটিত। প্রাকৃতিক পরিবেশে মিউটেশনের নিরীক্ষা কিংবা তাদের কৃত্রিম আবেশন তখনো সফল হয় নি। প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে চেৎভেরিকভ এই সুস্থিত সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মিউটেশন স্বাভাবিকভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশেও উদ্ভূত হয়, এরা সত্যিকার মিউটেশন এবং বেট্‌সনের 'অনুপস্থিতি' প্রক্রিয়া নয়। তিনি দৃঢ়মত প্রকাশ করেন যে, জিনের কৃত্রিম পরিবর্তন সম্ভব এবং তাই অদূর ভবিষ্যতের প্রধান কর্মসূচি।

বার্লিনে চেৎভেরিকভের নিবন্ধ পাঠকালেই তাঁর দুটি প্রতিপাদ্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছিল। তাঁর সহকর্মী ও ছাত্রেরা ড্রসোফিলার প্রাকৃতিক জীবগোষ্ঠীর বংশানুসৃতি সম্পর্কে যে ব্যাপক তথ্যানুসন্ধান শুরু করেছিলেন কংগ্রেস চলাকালেই তার প্রথম ফলাফল জানা গিয়েছিল। আর মিউটেশনের কৃত্রিম আবেশন সম্পর্কে এই পঞ্চম কংগ্রেসেই হার্মান মুলার এক রিপোর্টে এক্স-রে মাধ্যমে ড্রসোফিলার বহুসংখ্যক মিউটেশন উৎপাদনে তাঁর সাফল্যের কথা ঘোষণা করেন।

হার্ডি প্রাকৃতিক জীবগোষ্ঠীতে মিউটেশন ও প্রাকৃতিক নির্বাচন ছাড়াই বংশানুসৃত ভারসাম্যের শর্তাবলী পরীক্ষা করেছিলেন। চেৎভেরিকভ মিউটেশনের উদ্ভব ও প্রাকৃতিক নির্বাচন — এই উভয় শর্ত গ্রহণ করেই তত্ত্বটির গ্রন্থনা সম্পূর্ণ করেন। কী সিদ্ধান্তে তিনি পৌঁছেছিলেন? তাঁর নিবন্ধের

প্রতিটি যুক্তিই নির্ভুল গাণিতিক পরিমাপে নির্ধারিত ছিল। দৃষ্টান্তসহ এর ব্যাখ্যাই আমাদের পক্ষে এখন যথেষ্ট।

আবার সেই সাদা কাকের প্রসঙ্গে ফেরা যাক। ধরুন, একটি মহাদেশে কাকের সংখ্যা দশ লক্ষ, তারা অবাধ সংকরণে অভ্যস্ত এবং তাদের মধ্যে একটিই শুধু প্রচ্ছন্ন ধবল জিনের বাহক (অসমভ্রূণাণুজাত অবস্থায়)। প্রজন্ম প্রজন্মান্তরে এই কাকের সঙ্গে সাধারণ কালো কাকের যৌনমিলন ঘটবে এবং তাদের সন্তানেরা এই দুষ্প্রাপ্য বৈশিষ্ট্য গোপনে বহন করবে। হার্ডির সূত্রানুসারে এর সম্ভাব্য ঘনত্ব দশ লক্ষে এক এবং অস্তিত্বকাল অসীম।

ধরা যাক, এখন কাকের মধ্যে আরো একটি ধবল মিউটেশন জন্মাল এবং অসমভ্রূণাণুজাত অবস্থার জন্য তাও প্রচ্ছন্ন রইল। যদি এই নতুন মিউটেশনবাহীর সঙ্গে একই জিনধারীর আকস্মিক মিলন ঘটে তবে সন্তানদের এক-চতুর্থাংশ হবে সত্যিকার ধবলী। এই মিলনের সম্ভাব্যতা কত? এর হিসাব সহজ: দশ লক্ষে এক অর্থাৎ প্রায় অসম্ভবের কোঠায়।

দশ লক্ষ নয় মাত্র দশটি পাখীর মধ্যে অবস্থাটি এবার কল্পনা করা যাক। এখানে দুটি প্রচ্ছন্ন জিনের মিলন সম্ভাবনা দশে এক এবং তা স্পষ্টতই পর্যাপ্ত। এই জীবগোষ্ঠীতে ধবলীর জন্ম সম্ভাব্য ঘটনা এবং কয়েক প্রজন্মে উক্ত সীমিত পরিসরে সাদা কাকের জন্ম সুনিশ্চিত। কিন্তু আমরা যদি হার্ডির আদর্শ জীবগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে সত্যিকার বৃহদায়তন জীবগোষ্ঠীর কথাই ভাবি, তবে মিউটেশনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সেখানে অবশ্যম্ভাবী, অনিবার্যরূপেই প্রকটিত হবে।

কোন জিনের নতুন মিউটেশন অতি দুর্লভ ঘটনা। ধরা যাক, একটি জিন এক প্রজন্মে দশ লক্ষে মাত্র একজনের মধ্যে মিউটেশনগ্রস্ত হল। (কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এর উৎপত্তির হার আরো বেশী। ইচ্ছে করেই অংকটি এখানে কমিয়ে বলা হল। দেখাই যাক, এ থেকে কী ফল পাওয়া যায়।) যেহেতু মিউটেশন ‘তরলীভূত’ হয় না, টিকে থাকে, তাই কালক্রমে এর ঘনত্ববৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। তাছাড়া প্রত্যেক প্রজাতির মধ্যে যেহেতু নানা প্রকারের হাজার হাজার জিন বর্তমান, সেখানে দশ লক্ষে একটি হাজার বার গুণিত হলে তার সংখ্যা দাঁড়াবে হাজারে একটি।

একটি প্রজাতির জীবনকাল এক বা দু’বছরে সীমিত নয়, ভূতাত্ত্বিক কালপরিসরেই তা পরিমাপ্য। সুতরাং এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সকল বন্য প্রজাতির পক্ষেই মিউটেশনগ্রস্ততা স্বাভাবিক এবং তা মুখ্যত প্রচ্ছন্ন অবস্থায়।

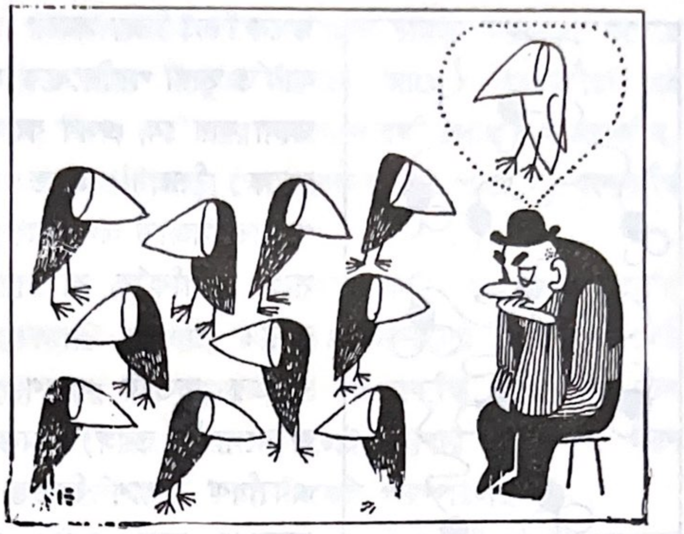

আমাদের গ্রহে যে প্রজাতি যত দীর্ঘজীবী এবং সংখ্যাধিক তার মিউটেশনও সেই অনুপাতেই অধিক।

বস্তুত উৎপন্ন মিউটেশনের হার যদি কমিয়েও দেখা হয় তবু বিবর্তনের উপকরণে কোন ঘাটতিই ঘটবে না। কিন্তু কী কী কারণে প্রাকৃতিক জীবগোষ্ঠীর বংশাণুর সংস্থিতিতে পরিবর্তন সঞ্চারিত হয়? এর একাধিক কারণ এখন জ্ঞাত।

এর প্রথমটি মিউটেশন প্রকরণ, কেবলমাত্র মিউটেশন নয়। অবাধ সংকরণের সুস্থিতি শক্তি বিপুল। পিয়ারসন সূত্র অনুসারে প্রথম সংকরণের পরপরই ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু প্রতি প্রজন্মেই মিউটেশন উৎপন্ন হয়, সংকরণ ঘটে, ফলত নতুন ভারসাম্যের সৃষ্টি হয় এবং আবারও নতুন মিউটেশনের সেই পুনরাবৃত্তি। এভাবেই চলিষ্ণু মিউটেশন প্রকরণের জন্য ভারসাম্যের ক্রমপরিবর্তন অব্যাহত থাকে।

এর দ্বিতীয় কারণ অন্তরণ। জীবগোষ্ঠীর পরিধি যত সংকীর্ণ, সংগুপ্ত পরিবর্তনের বাহ্য অভিব্যক্তির সম্ভাবনাও তত বেশী। দ্বৈপ জীবসংখ্যার মধ্যেই এর প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত সহজলক্ষ্য। প্রতি দ্বীপপুঞ্জ ও প্রায় প্রত্যেকটি দ্বীপেই এই গ্রহের অন্যত্র দুর্লভ প্রজাতিসমূহ দেখা যায়। 'বিগ্‌ল' জাহাজে ভ্রমণের সময়ই ডারউইন তা লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর তত্ত্ব গ্রন্থনায় এই নিরীক্ষার উল্লেখ্য ভূমিকা ছিল। কিন্তু অন্তরণ সর্বত্রই অবশ্যম্ভাবীরূপে ভৌগোলিক নয়। দীর্ঘকাল থেকেই এই দৃষ্টান্তটি আমরা জানি যে, একই অঞ্চলের হেরিং মাছ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে বসবাস করে এবং পৃথক পৃথক

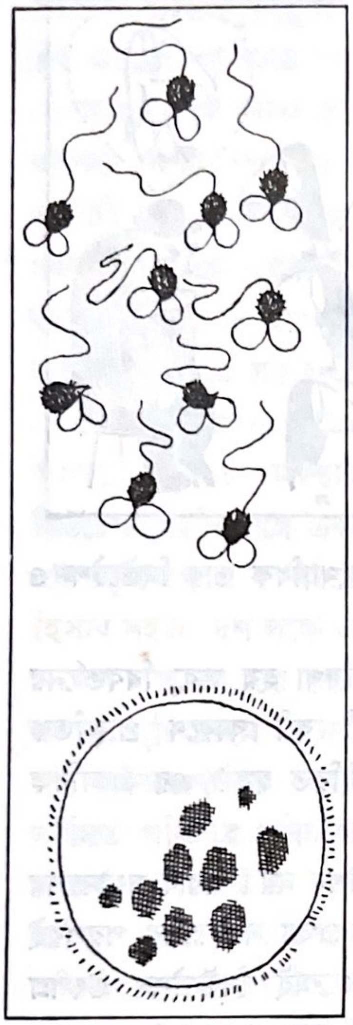

স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ডিম প্রসব করে। সুতরাং কার্যত তারা পরনিষেকে অভ্যস্ত নয়। জরিপ থেকে জানা যায় যে, এসব কলোনির চারিত্র্যও পরস্পর থেকে ভিন্ন। হয়ত এই অন্তরণ পৃথক খাদ্যাভ্যাসজাত অথবা বংশানুসৃত কোন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সম্পর্কিত, যা পরনিষেকে প্রতিবন্ধ সৃষ্টি করে।

এর তৃতীয় কারণ 'জীবন তরঙ্গ' (অথবা জীবগোষ্ঠী তরঙ্গ)। অন্তরণের ফলে জীবগোষ্ঠী একাধিক অংশে বিভক্ত হয় এবং ফলত এর আয়তন হ্রাস পায়। কিন্তু বিভক্তি ছাড়াও জীবগোষ্ঠীর আয়তন খর্বিত হতে পারে এবং বিবর্তনে তখনো এর গুরুত্ব হ্রাস পায় না। 'জীবন তরঙ্গ' খুবই সাধারণ প্রক্রিয়া এবং তা বিশেষভাবে মৌসুমী জীবের ক্ষেত্রে সহজলক্ষ্য। ঋতু পরিবর্তন সকল প্রাণী ও উদ্ভিদ জীবগোষ্ঠীকেও অল্পবিস্তর প্রভাবিত করে।

জীবগোষ্ঠী তরঙ্গ কেবলমাত্র মৌসুমী ঘটনা নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ নেংটিদের কথা উল্লেখ্য। এদের জীবগোষ্ঠীর ব্যাপক রদবদল সহজলক্ষ্য। 'নেংটি বর্ষে' এদের সংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কেন? বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন যে, 'নেংটি বর্ষ' নিয়মিত পরিসরে প্রাদুর্ভূত হয় এবং সৌরকলঙ্কের সংখ্যার উল্লেখ্য পরিবর্তনের সঙ্গে তা সম্পর্কিত।

সৌরকলঙ্কের সঙ্গে নেংটি সংখ্যার সম্পর্ক কী? সৌরচক্র এবং নেংটিচক্রের স্থায়িত্ব যথাক্রমে এগারো ও দশ বছর। এই সম্ভাব্য সংযোগ আবিষ্কারের সময় এদের 'চূড়ান্ত' সংখ্যা সমাপতিত হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘদিন তথ্যাদি সংগ্রহ করে দেখা গেল যে এরা পরস্পরান্বিত নয়। ভুল অনুমান।

কিন্তু কখনো কখনো দীর্ঘ জীবগোষ্ঠী তরঙ্গের কারণ সহজবোধ্য। মার্কিন বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন যে, কানাডার লিঙ্ক (বনবিড়াল জাতীয় প্রাণী) সংখ্যার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। কোন কোন বছর এদের সংখ্যা অন্য বছরের তুলনায় দশগুণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কী জন্য। এর ব্যাখ্যা এখন সহজবোধ্য।

প্রায় শতাব্দীকাল ধরে পশমব্যবসায়ীরা যে পরিমাণ চামড়া সরবরাহ করেছে হাড্‌সন বে কোম্পানীতে তার নির্ভুল হিসাব আছে। বিজ্ঞানীরা এই তথ্যাদি থেকে দেখলেন যে, 'লিঙ্ক বর্ষ' আর 'খরগোশ বর্ষ' যথার্থই সমকালীন। খরগোশ তো বাস্তব মাংস আর এটি ছাড়া তো লিঙ্ক বাঁচতে পারে না, বংশবৃদ্ধি করতে পারে না।

কিন্তু 'খরগোশ বর্ষের' কারণ কী? 'খরগোশ বর্ষ' যে 'লিঙ্ক বর্ষের' সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই সম্ভাবনাটি অবশ্যই বিবেচ্য। লিঙ্কদের সংখ্যা কমলেই খরগোশের সংখ্যা বাড়ে, আর লিঙ্কদের দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটলে খরগোশ সংখ্যায় তখনই ঘাটতি হয়। খরগোশরা কমলেই আবার লিঙ্কদের মরণ শুরু। সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রক্রিয়াটি উভয় দিকেই পরস্পরলগ্ন।

আসলে নেংটিদের সংখ্যাধিক্য সৌরকলঙ্ক অপেক্ষা শিকারী পাখীর সংখ্যার সঙ্গেই অধিকতর সংশ্লিষ্ট।

এবং শেষ ও চতুর্থ কারণ — নির্বাচন। এটি এক প্রচণ্ড শক্তি। এখানে গাছের বীজ, পতঙ্গ আর মাছের ডিমের পিণ্ড সংখ্যা স্মরণীয়। কিন্তু এদের সাবালক, বয়সী সন্তানদের সংখ্যা কত? এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। প্রসঙ্গটি এখন সুস্পষ্টতম, সর্বজ্ঞাত এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

বিজ্ঞানীরা বিবর্তনের চারটি কারণ সম্পর্কে অবহিত: মিউটেশন প্রকরণ, অন্তরণ, জীবগোষ্ঠী তরঙ্গ এবং নির্বাচন। এদের তাৎপর্য সমমাত্রিক নয়। জীবগোষ্ঠীর প্রাকৃতিক জনসংখ্যার বংশাণু-সংস্থিতি পরিবর্তনে এরা সকলেই সক্ষম। কিন্তু মিউটেশন প্রকরণ বংশানুসৃত পরিবর্তনেরও প্রাথমিক উপকরণের সরবরাহক। এটি ছাড়া বিবর্তনের অন্যান্য হেতুসমূহ নিষ্ক্রিয়।

পূর্বোক্ত হেতুচতুষ্টয়ে মিউটেশন, প্রকরণ, অন্তরণ এবং জীবন তরঙ্গ লক্ষ্যহীন শক্তিবিশেষ, বংশাণু-সংস্থিতিতে এদের সৃষ্ট পরিবর্তন আপতিক। বিপরীতক্রমে নির্বাচন কর্মকাণ্ড সুচিহ্নিত লক্ষ্যমুখীন এবং জীবনাবস্থার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ।

এ সবই ১৯২৬ সালে প্রকাশিত সের্গেই চেৎভেরিকভের নিবন্ধর সারাংশ মাত্র।

নবজীবনের সন্ধান

এতদিন বংশাণুবিদ্যার ভাষায় ডারউইনবাদ পুনর্লিখনের যে ভিত্তির জন্য জীববিজ্ঞানীরা অপেক্ষমাণ ছিলেন চেৎভেরিকভের গবেষণা থেকে তাই

পাওয়া গেল। কিন্তু এখানেই তার সকল তাৎপর্য সীমিত নয়। যে বিবর্তন তত্ত্ব এতদিন বর্ণনসর্বস্ব ছিল এখন তারই রূপান্তরণ ঘটল এক পরীক্ষাসিদ্ধ বিজ্ঞানে।

আশু স্বীকৃত ও ব্যাপক প্রচারিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাবলীর মধ্যে ডারউইনবাদ এক অনন্য দৃষ্টান্ত। ‘প্রজাতির উদ্ভব’ প্রকাশের অব্যবহিত পরেই এই নতুন তত্ত্বের পরিপূরক সকল বিষয়েই এক ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। সময় বয়ে চলল এবং ডারউইনের সমকালীন আলোড়ন ক্রমে মন্দীভূত হল। ডারউইনবাদ জীবিত রইল, বিকশিত হল কিন্তু এর ক্রমোন্নয়নের গতিবেগ থিতিয়ে পড়ল।

চেৎভেরিকভের গবেষণার ফলেই প্রকৃতপক্ষে সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীদের সামনে এক অবাধ উন্মুক্ত সুযোগ দেখা দিল। ডারউইনবাদে সঞ্চারিত হল নবজীবন।

বংশাণুবিদ্যা ও বিবর্তনের সংযোগ সম্পর্কিত নতুন প্রত্যয়াদি পরীক্ষার সময় যাকিছু সম্ভাবনা অনুমিত হয়েছিল চেৎভেরিকভের সহকর্মী সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানের ফলে তার সবই সম্পূর্ণ সত্যায়িত হল। বাহ্যত সুসদৃশ প্রাকৃতিক জীবগোষ্ঠী যে বিবিধপ্রকার এবং অসমভ্রূণাণুজাত অজস্র প্রচ্ছন্ন মিউটেশনবাহী তা শেষে জানা গেল। আর এই সঙ্গে আবিষ্কৃত হল নতুন, কৌতূহলোদ্দীপক এবং বহুলাংশে অভাবিত কিছু প্রতীতিবিষয়।

দৃষ্টান্ত হিসেবে বরিস আস্তাউরভ আবিষ্কৃত ড্রসোফিলার সম্পূর্ণ পুরুষহীন একটি ধারা উল্লেখ্য। এরা অন্য ধারার পুরুষদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বংশবৃদ্ধি করত এবং অনিবার্যভাবে এদের সকল সন্তানই স্ত্রীমাছি হত। অল্প কিছুদিন আগে এই কৌতুকপ্রদ ব্যাপারটির জটিলতা উন্মোচিত হয়েছে। দেখা গেছে, প্রজন্ম প্রজন্মান্তরে অব্যাহত ডিম্বকোষের প্রটোপ্লাজ্মের একপ্রকার সংক্রমণই এদের পুরুষদের বংশলুপ্তির কারণ। কিন্তু সংক্রমণের কারণ ভাইরাস না রিকেট্সিয়া তা আজও জানা যায় নি।

কেবলমাত্র বাহিরেই নয়, গবেষণাগারেও আণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় নতুন তথ্যাদি আবিষ্কৃত হল। দৃষ্টান্তস্বরূপ সোফিয়া ফ্রলোভার গবেষণা উল্লেখ্য। তিনি বিভিন্ন অঞ্চলের বিবিধ ড্রসোফিলা প্রজাতির ক্রমোসোম পরীক্ষা করেন। ড্রসোফিলার অন্যতম সাধারণ প্রজাতি ড্রসোফিলা অবস্কিউরা *(Drosophila obscura)* ইউরোপ ও আমেরিকায় সহজলক্ষ্য। এদের ইউরোপীয় ও আমেরিকান প্রকারের মধ্যে ক্রমোসোমের পার্থক্য উল্লেখ্য।

দেখা গেল, এদের বাহ্য সাদৃশ্য সত্ত্বেও আসলে এরা স্বতন্ত্র প্রজাতি। সুতরাং আমেরিকান প্রকারের নতুন নামকরণ হল ড্রসোফিলা সিউডোঅবস্কিউরা *(Drosophila pseudoobscura)*।

চেৎভেরিকভের দল যে গবেষণা শুরু করেছিল তা অব্যাহত থাকে, বিকশিত হয়। ত্রিশের দশকে নিকোলাই দুবিনিনের তত্ত্বাবধানে কর্মরত বৃহৎ সোভিয়েত গবেষকদল শুধুমাত্র বংশানুসৃতির বিশ্লেষণেই নিবিষ্ট ছিল না। ড্রসোফিলা লালাগ্রন্থির মহাক্রমোসোমে যে দুর্লভ সম্ভাবনা উন্মোচিত হয়েছিল তার সদ্ব্যবহারেও দুবিনিন সচেষ্ট হলেন। এই গবেষণা থেকেই জানা গেল যে, প্রাকৃতিক জীবগোষ্ঠীর অসমসত্ত্বতার কারণ শুধু একক জিনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, তা ক্রমোসোম সংস্থানের সঙ্গেও সম্পর্কিত। এদের প্রায় প্রত্যেক প্রাকৃতিক গোষ্ঠীতেই নির্দিষ্ট পরিমাণ এমন কিছুসংখ্যক মাছি থাকে যারা রূপান্তরিত ক্রমোসোমধারী। এই পরিবর্তিত ক্রমোসোমেরই জন্য সাধারণ মাছির সঙ্গে সঙ্গমে তারা ব্যর্থ হয় এবং প্রজন্মের একাংশের মৃত্যু ঘটে। নতুন প্রজাতি উদ্ভবের এও অন্যতম পথ।

বংশাণুবিদ্যার ভিত্তিতে বিবর্তন প্রকরণের নিরীক্ষামূলক গবেষণা অবশ্য কেবল ড্রসোফিলার প্রাকৃতিক জীবগোষ্ঠী বিশ্লেষণেই সীমিত নয়। এজন্য অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদে প্রজাতির প্রাকৃতিক জীবগোষ্ঠীও ব্যাপকভাবে পরীক্ষিত হয়। গবেষণাগারে টেস্ট-টিউব বা বিশেষ ধরনের বাক্সে কৃত্রিমভাবে বিশেষ কোন জীবগোষ্ঠীর চাষ এখন সম্ভব। এভাবেই যেকোন জীবগোষ্ঠীর প্রারম্ভিক উৎপাদন ও ব্যাপকতর বিশ্লেষণও করা যায়। পদ্ধতিটি আজ অপরিহার্য। প্রসঙ্গত, বিভিন্ন প্রজাতির আপেক্ষিক বাঁচার ক্ষমতা ও মিউটেশন সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্যনির্ণয়ের প্রচেষ্টা উল্লেখ্য। ইদানীংকালে ইলেকট্রনিক কম্পিউটারের সাহায্যে মডেল-অনুসারী বংশানুসৃত জীবগোষ্ঠী ‘সংগঠিত করা’ সম্ভব হয়েছে। এ সম্পর্কিত বহুবিধ প্রক্রিয়ার মধ্যে এখানে মাত্র কয়েকটিই উল্লিখিত হল। আমি শুধু এর একটিই বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব। আমি মনে করি, এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাশীল এবং এর ফলে ব্যাপকতর পর্যায়ে জীববিজ্ঞানের বহু শাখার ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

এতক্ষণ আমরা ডারউইনবাদ ও বংশাণুবিদ্যার মিলিত দৃষ্টিকোণ থেকে জীবগোষ্ঠীর নিরীক্ষা আলোচনা করেছি। কিন্তু কোন প্রজাতিই স্বেচ্ছায় ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে বেঁচে থাকে না। অন্যান্য প্রজাতির সঙ্গে সহাবস্থান তার অস্তিত্বের অনুষঙ্গ। প্রজাতির পক্ষে শূন্যস্থানে বসবাস অসম্ভব। তারা

সকলেই শ্বাস নেয়, খাবার খায় এবং অবস্থানস্থলের আবহাওয়া, মাটি, পাথর ইত্যাদি দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়। গোষ্ঠীবংশাণুবিদ্যা, জীবগোষ্ঠীবিদ্যা (জীবগোষ্ঠী সংক্রান্ত তত্ত্ব), ভের্নাদ্‌স্কির জীবমণ্ডল তত্ত্ব, জীবভূরসায়ন ও মৃত্তিকাবিদ্যার সমন্বয়ে উৎপন্ন জটিল যোগের সম্ভাবনা উল্লেখ্য এবং জীব ও তার ঘনিষ্ঠ অনুষঙ্গস্বরূপ জীবিত ও জড়ের সন্নিবেশ এখানে সবিশেষ বিবেচিত। কিন্তু এটা আমাদের প্রসঙ্গাতীত বিষয়।

আধুনিক গোষ্ঠীবংশাণুবিদ্যার মৌলিক প্রবণতাগুলির নামোল্লেখই এখন অসম্ভব। পৃথিবীর সর্বত্র এর গবেষণা চলছে। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য এসবই চেৎভেরিকভের গবেষণাসূচিত পুনর্নব ডারউইনবাদেরই প্রলম্বন।

প্রাচুর্যের স্রষ্টা

বিজ্ঞানের লক্ষ্য শুধুমাত্র মানুষের কৌতূহল নিবৃত্তিতেই সীমিত নয়। যেকোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারই একদিন না একদিন কোন না কোন প্রয়োগিক ফলাফল অর্জন করে। বংশাণুবিদ্যা ও বিবর্তন তত্ত্বের সংযোগের ফলিত গুরুত্ব এখন সহজলক্ষ্য। প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে প্রাকৃতিক প্রজাতি ও প্রকারের জন্ম হয়। নির্বাচন কৌশলেও জন্মানো যায় নতুন প্রজন্ম ও প্রকার। প্রাকৃতিক নির্বাচনে প্রজাতি উদ্ভবের তত্ত্বগ্রন্থনায় ডারউইন গৃহপালিত প্রাণীদের ক্রমবিকাশ থেকে সমৃদ্ধ উপকরণ আহরণ করেছিলেন। বিবর্তন তত্ত্ব ও বংশাণুবিদ্যার সংযোগ আজ নির্বাচনবিদদের সামনে এক নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচিত করেছে।

নির্বাচনবিদদের গবেষণাপদ্ধতি অন্ধের পথ হাতড়ে চলার মতোই তখন অনির্দিষ্ট ছিল। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত গবেষণাদির ফলেই অতঃপর নতুন প্রকার ও প্রজন্ম লাভের দুটি পথ উন্মুক্ত হয়েছিল। এখানে আমি ফলিত সংকরণের জন্য মেণ্ডেলবাদের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করছি না, কারণ এর অনেক আগে থেকেই পদ্ধতিটি প্রচলিত ছিল। প্রকৃতিদত্ত সম্পদ এবং আবেশিত মিউটেশন ব্যবহারের মধ্যেই এই পথদুটির সন্ধান নিহিত।

প্রসঙ্গত আকাদমিশিয়ন নিকোলাই ভাভিলভের নাম স্মরণীয়। নির্বাচনবিদ্যায় তাঁর গবেষণাবলীর তাৎপর্য অনন্যসাধারণ। বিশের দশকের শুরুর দিকে তিনিই 'সমসত্ত্ব ধারার নিয়ম' নির্ধারণ করেন। চেৎভেরিকভের

গবেষণার পূর্বকালীন হলেও বিষয়গুলি ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরসম্পর্কিত। বংশানুসৃত প্রকারণের বৈশিষ্ট্যই এর আলোচ্য বিষয়। বংশানুসারে রূপান্তরিত প্রকারের ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ প্রজাতিরা ‘সমান্তরাল ধারার’ অনুসারী — এই ছিল সূত্রটির সারমর্ম। এই নিয়মটি জানা থাকলে প্রাপ্তব্যের অনুসন্ধানে পণ্ডশ্রম পরিহার সম্ভব। যথা, কোন গম প্রজাতি রোগপ্রতিষেধক একটি জিনের বাহক হলে এর ঘনিষ্ঠতর প্রজাতিসমূহের মধ্যেও জিনটি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পক্ষান্তরে বহুবিধ ‘চোখের’ জিন থাকা সত্ত্বেও নীল চোখ ড্রসোফিলার অনুসন্ধান নিরর্থক। কারণ, প্রাকৃতিক মাছিদের মধ্যে নীলবর্ণ রঞ্জক উৎপাদনের নজির একেবারেই অনুপস্থিত।

ভাভিলভ সূত্রানুসারী নির্বাচনের অন্যতম সফল দৃষ্টান্ত মিষ্টি লিউপিন। সাদা লিউপিন মূল্যবান পশুখাদ্য এবং এর ফলনও প্রচুর। কিন্তু এতে লিউপিনিন নামক একপ্রকার তিক্ত, বিষাক্ত পদার্থ থাকে। তাই এর সঙ্গে অন্য কোন ফসল মেশাতে হয়, এমন কি তা ভাঁড়ারে রাখার সময়ও। সকল শিম্ব উদ্ভিদেরই যে মিষ্টস্বাদ ‘প্রকার’ আছে, বংশাণুবিদরা তা জানতেন। সারা মাঠে অন্তত একটি লিউপিনেও যে কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যটি পাওয়া যাবে সে-সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব ছিল। বংশাণুবিদ্যা নয় রসায়নকেই এর মোকাবিলা করতে হয়েছিল। তাই দ্রুত লিউপিনিন নির্ধারণের একটি পদ্ধতি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই ঈপ্সিত মিউটেশনটিও আর অপ্রাপ্য রইল না।

পৃথিবীতে জীবিত প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ত্রিশ লক্ষ। অতি অল্পসংখ্যক প্রজাতিই মানুষ ব্যবহার করে। চাষের ফসল আর গৃহপালিত প্রাণীর অধিকাংশই প্রাগৈতিহাসিক মানুষের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। যা কিছু তাদের চোখে ভাল লেগেছিল তাই তারা গ্রহণ করেছিল। প্রাকৃতিক সম্পদের সার্বিক ব্যবহারই আধুনিক নির্বাচনবিদদের সামনে এখন প্রধান সমস্যা। এক্ষেত্রে ভাভিলভের অবদান নজিরবিহীন। যেসব কেন্দ্র থেকে কৃষিজ উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়েছিল তিনি তা খুঁজে পেয়েছিলেন। তাছাড়া নির্বাচন সংক্রান্ত প্রাগ্রসর গবেষণার জন্য যে উপকরণ তিনি সংগ্রহ করেন তাও ছিল বিপুল।

নতুন প্রকার ও প্রজন্ম উৎপাদনের দ্বিতীয় পথ কৃত্রিমভাবে বংশানুসৃত প্রকারণ ত্বরান্বিতকরণ ও মিউটেশন আবেশন। এহাই আমাদের পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

আক্রান্ত জিন

একটি দুর্গের পতন

প্রকৃতির জিন সংরক্ষণ পদ্ধতি কম নিখুঁত নয়। তাই বংশাণুবিদদের জন্য অপেক্ষমাণ সমস্যাটিও যথেষ্ট জটিল। প্রতি জীবকোষেই পূর্ণ একপ্রস্ত জিন রয়েছে। সন্ততিতে সঞ্চারমান পরিবর্তন সংঘটনে জননকোষের জিন পরিবর্তন অপরিহার্য। কিন্তু তা সহজসাধ্য নয়। জননকোষের ভেতর নিউক্লিয়াস, নিউক্লিয়াসের ভেতর ক্রমোসোম এবং ক্রমোসোমের ভেতর জিন — সেই গোলক ধাঁধা পেরিয়ে তবেই এদের কাছে যাওয়া।

তাই কৃত্রিম জিন মিউটেশনের চেষ্টায় দীর্ঘ অসাফল্য কোন আপতিক ব্যাপার নয়। বহু প্রভাবকই জননকোষের জিন অবধি পৌঁছুতেই পারে নি এবং কখনো পৌঁছেও তা আত্যন্তিক রূপান্তরিত আকারে।

কৃত্রিম জিন মিউটেশনে কোন সাফল্যের সংবাদ ১৯২৭ সালের আগে বিজ্ঞানীরা আর কখনই শোনেন নি। পঞ্চম আন্তর্জাতিক বংশাণুবিদ্যা কংগ্রেসে প্রখ্যাত মার্কিন বংশাণুবিদ এইচ. মুলারের কাছ থেকেই সর্বপ্রথম সংবাদটি শোনা যায়। মুলার পরবর্তীকালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এক্স-রে প্রয়োগে ড্রসোফিলায় বহু মিউটেশন উৎপাদনে তিনি সফল হন।

আবিষ্কারের ক্ষেত্রে সন্নিপাত দুর্লভ নয়। মুলারের গবেষণা প্রকাশিত হবার পরপরই তাঁর স্বদেশবাসী এল. জে. স্ট্যাড্‌লার ১৯২৮ সালে বার্লি ও ভুট্টায় কৃত্রিম মিউটেশন উৎপাদনে সফল হন। তিনিও এক্স-রে ব্যবহার করেন এবং তা মুলার থেকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে।

মুলারের দু'বছর আগেই লেনিনগ্রাদের দুই বিজ্ঞানী কৃত্রিম মিউটেশন উৎপাদনে সাফল্য লাভ করেছিলেন। এঁরা রেডিওলজি ও রণ্টজিনোলজি ইনস্টিটিউটে কর্মরত আকাদমিশিয়ন গেওর্গি নাদ্‌সন এবং তাঁর তরুণ সহকর্মী গ্রিগরি ফিলিপভ। ইস্টের উপর তেজস্ক্রিয় পদার্থ প্রয়োগক্রমে তাঁরা মিউটেশন উৎপন্ন করেন। এই ইনস্টিটিউটের কার্যবিবরণীতে ১৯২৫ সালে

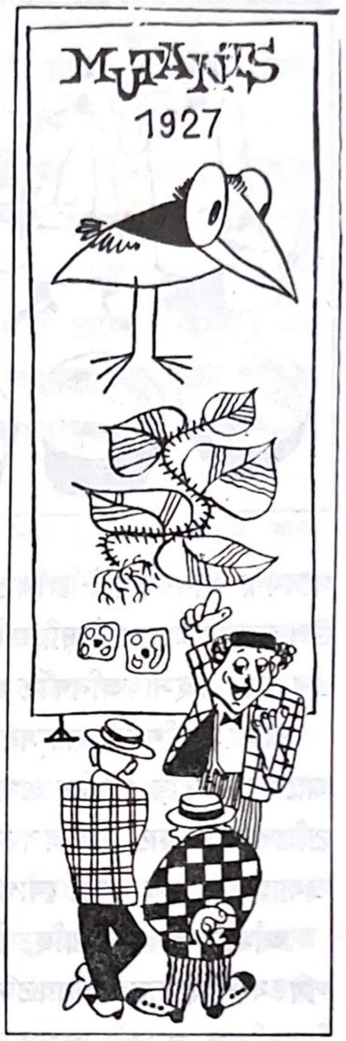

তাঁদের প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। অতঃপর তাঁরা তাঁদের গবেষণার ফল এক ফরাসী সাময়িকীতেও প্রকাশ করেন।

সুতরাং প্রথম পরীক্ষাকালেই প্রাণী, উদ্ভিদ ও জীবাণুর দেহে মিউটেশন উৎপাদিত হয়। এই তিনটি ক্ষেত্রেই মিউটেশন উৎপাদনে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ব্যবহৃত হয়েছিল। অতঃপর জন্ম নিল এক নতুন বিজ্ঞান — তেজবংশাণুবিদ্যা এবং অনতিবিলম্বে এর গতিতে দ্রুতি সঞ্চারিত হল।

তেজবংশাণুবিদ্যার প্রবক্তারূপে প্রায়ই মুলার ও স্ট্যাড্‌লার এবং মুখ্যত মুলারের নাম উল্লিখিত হয়। অথচ নাদ্‌সন ও ফিলিপভের অবদানও এখানে স্মর্তব্য। তাঁদের নিরীক্ষা মোটেই কোন আপতিক ঘটনা নয়। পক্ষান্তরে তাঁদের পরীক্ষা ছিল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এই বিজ্ঞানীদ্বয় নিজ আবিষ্কারের সম্ভাব্য গুরুত্ব সম্পর্কেও সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। ঐতিহাসিক তাৎপর্যে চিহ্নিত তাঁদের প্রথম প্রবন্ধের শিরোনামেই বিকিরণজাত মিউটেশনের সম্ভাব্য ফলিত প্রয়োগ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল। মুলার ও স্ট্যাড্‌লার প্রায় সমকালে এক সাময়িকীতেই তাঁদের নিবন্ধ প্রকাশ করেন। তবু মুলারের নামই সর্বাধিক উল্লিখিত। কেন?

পরীক্ষার উপকরণটির ভূমিকাই এখানে মুখ্য। মুলার বংশাণুবিদ্যার তৎকালীন সর্বাধিক কাম্য বিষয় নিয়ে পরীক্ষারত ছিলেন। এর চারিত্র্যসমূহ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে পরীক্ষিত হয়েছিল। সকল পরীক্ষাগারেই প্রজনিত ড্রসোফিলার বিশুদ্ধ ধারার সংখ্যা তখন অজস্র। তাই আত্যন্তিক নির্ভরতায় চারিত্র্যের নাজুকতম পরিবর্তন নির্ণয়েও বিজ্ঞানীদের আর কোন অসুবিধা ছিল না। বংশানুসৃতির ক্রমোসোম তত্ত্ব যে মুখ্যত ড্রসোফিলার পরীক্ষা থেকেই উদ্ভূত এবং তেজবংশাণুবিদ্যার জন্মও যে মূলত সেই চমৎকার উপকরণলগ্ন, এতে বিস্ময়ের অবকাশ নেই। তাই তেজবংশাণুবিদ্যার অধিকাংশ ক্লাসিকাল রচনায় স্ট্যাড্‌লার অথবা নাদ্‌সন ও ফিলিপভ অপেক্ষা মুলারের

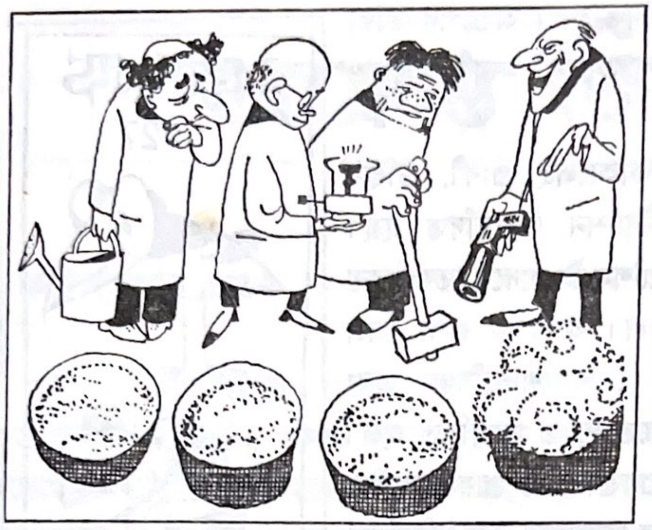

গবেষণা অধিকতর উল্লিখিত। আর ইস্ট, লেনিনগ্রাদ বিজ্ঞানীদের এই পরীক্ষার উপকরণের বংশাণুবিদ্যা জটিল, এর গভীরতা আত্যন্তিক এবং তাই অদ্যাবধিও এর বহু রহস্য অনির্ণীত।

আকাদমিশিয়ন নাদ্‌সন অন্যতম বিখ্যাত ইস্ট-বিশেষজ্ঞ। ইস্টে মিউটেশন আবেশনে তাঁর পদ্ধতি এখনো অনুসৃত। চল্লিশ বছর আগে নাদ্‌সন ও তাঁর প্রতিভাবান ছাত্র ফিলিপভ ইস্ট নিয়ে যে সকল গবেষণা শুরু করেন তা অব্যাহত রাখার মতো যোগ্য কর্মী সেকালে দুষ্প্রাপ্য ছিল।

আমরা লক্ষ্য করেছি, বিগত শতকের শেষ পাদে ভাইস্‌মানের পরীক্ষার পর বংশানুসৃত পরিবর্তন উৎপাদনের (অথবা তার অসম্ভাব্যতা প্রমাণের) নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, যান্ত্রিক প্রভাবক এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ায় এ বিষয়ে সাফল্যলাভের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সবকিছুই শেষ অবধি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অতঃপর বিশের দশকের মাঝামাঝি তিনটি পরীক্ষাগারে একই সঙ্গে কৃত্রিম মিউটেশন উৎপাদন সম্ভব হল এবং দেখা গেল প্রতিটি ক্ষেত্রে তেজাঘাত প্রয়োগেই তা অর্জিত হয়েছে।

বিকিরণই মিউটেশন উৎপাদনের একমাত্র সফল উপায় কেন? সমস্যাটি বোঝার জন্য জীববিজ্ঞান থেকে এবার পদার্থবিদ্যায় ফেরা দরকার।

পদার্থবিদ্যায় জ্ঞাত বহুবিধ বিকিরণের অনেকগুলিই বংশানুসৃত পরিবর্তন উৎপাদনে ব্যবহার্য নয়। দৃশ্যমান আলো, বিকীর্ণ তাপ এবং বেতার তরঙ্গ মিউটেশন উৎপাদন করে না। নাদ্‌সন ও ফিলিপভের ব্যবহৃত বিকিরণ, মার্কিন বিজ্ঞানীদের ব্যবহৃত এক্স-রে আয়নক বিকিরণের শ্রেণীভুক্ত।

কোন পদার্থবিশেষ অতিক্রমকালে সেই পদার্থকে আয়নিত করার ক্ষমতা তাদের সকলেরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য (এবং তাই তাদের এই নামকরণ)। আয়নন প্রক্রিয়া স্বয়ং না হলেও অন্তত এর ফলেই তা ঘটে থাকে।

নিউক্লীয় পদার্থবিদ্যা অথবা মহাজাগতিক রশ্মির গবেষণায় নিযুক্ত যেকোন পদার্থবিদ্যার পরীক্ষাগারেই 'উইল্‌সন ক্লাউড চেম্বার' নামে একটি যন্ত্র থাকে। এর আবিষ্কারকের নামাঙ্কিত এই যন্ত্রের ব্যবহারপ্রক্রিয়া অতি সরল। অতিসম্পৃক্ত জলীয় বাষ্পে পূর্ণ এটি একটি প্রকোষ্ঠবিশেষ। এই প্রকোষ্ঠের আয়তন পরিবর্তনের মাধ্যমে অতি দ্রুত বাষ্পের ঘনীভবন ঘটানো যায়। যদি এই প্রকোষ্ঠের মধ্যে কোন আয়নিত কণা প্রবেশ করে তবে এর পথ জলবিন্দুর ধোঁয়াটে একটি ক্ষীণ রেখা দ্বারা চিহ্নিত হয়।

ইলেকট্রোস্কোপের সাহায্যে অতি সহজেই আয়নন প্রক্রিয়া নির্ণয় করা যায়। এটি একটি পাত্রবিশেষ। এতে একটি ধাতব দণ্ড থেকে দুই টুকরো ধাতুপাত বা ফলক ঝুলানো থাকে। যখন এই দণ্ড তড়িতাহিত কোন বস্তুর সংস্পর্শে আসে তখন এই ফলকদ্বয় স্বস্থান থেকে সরে যায়। যখন কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থ এর কাছে রাখা যায়, ফলকদ্বয় তখনই দ্রুত একত্রিত হয়। এই বিকিরণ নির্ণয়ের আরো বহু পদ্ধতি আছে এবং এর অধিকাংশ তজ্জনিত বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। কারণ, আয়নন আসলে কোন পদার্থের পরমাণুকে তড়িতাহিত করা ছাড়া আর কিছুই নয়। উইল্‌সন ক্লাউড চেম্বারে যে পথরেখা সৃষ্টি হয় তা আহিত বাষ্পকণার চারিদিকে জলবিন্দু সন্নিবেশেরই ফল। যেহেতু আয়নিত বাতাস বিদ্যুৎবাহী তাই ইলেকট্রোস্কোপের ফলকদুটি অবনমিত হয়।

পরমাণু আহিত হয় কীভাবে? আপনারা জানেন যে, পরমাণুর ধনাত্মক নিউক্লিয়াস প্রদক্ষিণরত ঋণাত্মক ইলেকট্রনে বেষ্টিত। নিউক্লিয়াসের আধান এবং ইলেকট্রনের সংখ্যা প্রতিযঙ্গী, তাই বৈদ্যুতিক অর্থে পরমাণু একটি প্রশমিত সত্তা। আধান পৃথকীকরণক্রমেই পরমাণুকে আহিত করা সম্ভব অর্থাৎ এজন্য এর একটি ইলেকট্রন অপসারণ প্রয়োজন। ফলত দুটি আয়ন সৃষ্টি হবে — একটি ইলেকট্রনহারা ধনাত্মক আধানযুক্ত পরমাণু এবং অন্যটি ঋণাত্মক একক ইলেকট্রন।

পরমাণু থেকে একটি ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন করার জন্য যে প্রচুর শক্তির প্রয়োজন তা সহজবোধ্য এবং সকল প্রকার বিকিরণের পক্ষে তা সম্ভবপর নয়। কোন বস্তুকণা যখন দৃষ্ট আলো অথবা অতিবেগুনী রশ্মি শোষণ করে

তখন সেখানে একটি ইলেকট্রন নিউক্লিয়াস থেকে কিছু দূরে সরেই আবার নিজ কক্ষপথে ফিরে আসে।

আয়নক রশ্মি — দৃষ্ট আলো, অতিবেগুনী এবং অবলোহিত রশ্মিও বেতার তরঙ্গেরই স্বভাবযুক্ত। এরা সকলেই তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণ।

কিন্তু আয়নক রশ্মি অধিকতর শক্তিসম্পন্ন, তাই অন্য তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণ থেকে তা পৃথক। প্রভেদটি অত্যন্ত তাৎপর্যশীল। তাই বিকিরণের পক্ষে বস্তুর আয়নন সম্ভবপর। আয়নিত অবস্থা অতি স্বল্পস্থায়ী। আয়নিত পরমাণু অচিরেই কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ার অঙ্গীভূত হতে চায়। সুতরাং আয়নক রশ্মি যেকোন বস্তুর রাসায়নিক পরিবর্তন সংঘটনে সক্ষম। তাছাড়া উচ্চ শক্তির জন্য এই রশ্মি সকল প্রতিবন্ধ ভেদ করে এবং তাই চিকিৎসা ও প্রযুক্তিবিদ্যায় 'অভ্যন্তর নিরীক্ষণের জন্য' এটি ব্যবহৃত হয়। জ্ঞাত কোন বস্তুই এই রশ্মির কাছে অভেদ্য নয়। পদার্থবিশেষে এর প্রবাহ বড়জোর মন্দীভূত হতে পারে। বাতাস এদের কাছে স্বচ্ছ, কাচ ও কাঠ স্বল্পস্বচ্ছ এবং সীসা সর্বাধিক অস্বচ্ছ। কিন্তু সীসার কোন স্তরই (অন্তত তত্ত্বীয় দৃষ্টিকোণ থেকে) আয়নক বিকিরণের পূর্ণ শোষণের পক্ষে যথেষ্ট পুরু নয়। সুতরাং বিকিরণ থেকে প্রতিরক্ষার প্রশ্নে একে সম্পূর্ণ প্রতিহত করার চেষ্টা না করে, বিপজ্জনক স্তর থেকে এর মাত্রা অবনমিত করার কথাই প্রস্তাবিত হয়।

এখন আমরা আবার বংশাণুবিদ্যায় ফিরি। মিউটেশন সৃষ্টির জন্য কোন একটি জিনের পরিবর্তন প্রয়োজন। সুস্পষ্ট ধারণা ব্যতিরেকেও এটি যে রাসায়নিক পদার্থবিশেষ তৎকালেও এতে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কি জিনকে প্রভাবিত করা সম্ভব ? অবশ্যই তা সহজ নয়। আপতিক প্রভাবকের বিরুদ্ধে প্রকৃতির জিনসংরক্ষণ ব্যবস্থা অত্যন্ত নিখুঁত। কোন রাসায়নিক পদার্থই মধ্যপথে ঘনিষ্ঠতর কিছুর সঙ্গে বিক্রিয়ালিপ্ত না হয়ে অপরিবর্তিত অবস্থায় সেই রহস্যময় জিন অবধি পৌঁছতে পারে না। তাই জিনের উপাদান না জেনে সেজন্য পদার্থ নির্বাচন কি অসম্ভব নয় ?

আয়নক রশ্মিই সেই কাঙ্ক্ষিত বস্তু। এই রশ্মি যেকোন প্রতিবন্ধ অতিক্রম করে যেকোন পরমাণু অবধি পৌঁছতে এবং যেকোন পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

সম্ভবত মিউটেশন উৎপত্তির যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা এভাবেই উপস্থাপিত হয়েছিল। এই সংযোগ বিধান যে অভ্রান্ত ছিল এখন আমরা তা

জানি। দীর্ঘ অবরোধের পর আয়নক বোমাবর্ষণের ফলে জিন দুর্গটির পতন ঘটল।

সকল পরীক্ষায়ই অতঃপর বহু নতুন, স্থায়ী মিউটেশন পাওয়া গেল। নাদ্‌সন ও ফিলিপভ ইস্টের এমন সব কলোনি উৎপন্ন করলেন যারা আয়তন, আকৃতি ও বর্ণে বহুধাবিভিন্ন। পরীক্ষাধীন ইস্টকোষের জৈবরাসায়নিক প্রকৃতিতেই পরিবর্তন ঘটেছিল। স্ট্যাড্‌লার এমন সব উদ্ভিদ জন্মালেন যাদের উচ্চতা, বর্ণ ও পাতার আকৃতি পৃথক হল। মুলার এই পদ্ধতিতে বহু মাছি উৎপন্ন করলেন যাদের দেহবর্ণ হালকা অথবা গাঢ়, চক্ষুবর্ণ বিভিন্ন, দেহরোমের বিন্যাস স্বতন্ত্র এবং পাখনা কুঞ্চিত অথবা একেবারে অনুপস্থিত...

অন্যান্য বিজ্ঞানী ভিন্নতর উদ্ভিদ ও প্রাণীর মিউটেশন উৎপাদনে প্রয়াসী হলেন এবং নিশ্চিত সাফল্য অর্জন করলেন। সন্ততিতে নবোদ্ভিন্ন চারিত্র্যের সংক্রমণই ছিল এ পর্যায়ের সর্বাধিক কৌতূহলী ঘটনা।

কিন্তু সৃষ্ট মিউটেশনের অধিকাংশই ছিল নঞর্থক: এতে জীবনীশক্তি খর্বিত, এমন কি জীবের মৃত্যুও হত। মুলারের পরীক্ষায় বহু ‘প্রচ্ছন্ন জীবান্তক’ মিউটেশন জন্মাল। এই মিউটেশন অসমসত্ত্ব অবস্থায় বাহকের জীবনীশক্তির পক্ষে ক্ষতিকর না হলেও সমসত্ত্ব পর্যায়ে মারাত্মক, বিশেষভাবে ভ্রূণমৃত্যুর কারণ। একটি ক্রমোসোমে অবস্থিত জীবান্তক মিউটেশনের প্রতিক্রিয়া সামান্য ক্ষতিকর নয়। কিন্তু দুটি সমসংস্থ (সদৃশ) ক্রমোসোম মিউটেশনলগ্ন হলে এর বাহ্য অভিব্যক্তি অবশ্যম্ভাবী। মুলারের পরীক্ষার বিশেষ কৃৎকৌশলের জন্যই মিউটেশন নির্ণয় সম্ভবপর হয়েছিল। ইতিপূর্বে অন্যতর উপকরণে কৌশলগত কারণেই মিউটেশনগুলি চিহ্নিত হয় নি।

যেকোন জীবের তেজাঘাতজনিত মিউটেশনের প্রায় সবক'টিই জীবান্তক শ্রেণীর এবং এরা বাহকের মৃত্যু ঘটায়। জীবান্তক কখনো প্রকট, কখনো প্রচ্ছন্ন এবং কোষে তার একটির অবস্থিতিও অনেক সময় মৃত্যুর কারণ হতে পারে। যেসকল মিউটেশনে জীবের মৃত্যু ঘটে না, তাও কোন না কোন প্রকারে ক্ষতিকর, এবং এতে নানা পর্যায়ে জীবের জীবনীশক্তি খর্বিত হয়। অতি অল্পসংখ্যক মিউটেশনই জীবের ‘উন্নতি’ ঘটায়।

এতে বিস্ময়ের অবকাশ নেই। এই গ্রহবাসী সকল জীবই দীর্ঘ নির্বাচন ও জীবনাবস্থায় অভিযোজনার ফলে উদ্ভূত। জীবিত সত্তার মতো জটিল তন্ত্রে সকল আপাতিক পরিবর্তনই যে সংশোধনাতীত ক্ষতির কারণ তা সহজবোধ্য।

ছলনাকারী রশ্মি

বিকিরণ যে বংশানুসৃত পরিবর্তন ঘটায় এই তথ্যটি ১৯২৫ সালে প্রথম নাদ্‌সন ও ফিলিপভ আবিষ্কার করলেও জীবিত প্রাণীর উপর এর প্রভাব ইতিপূর্বেই সকলেই জ্ঞাত ছিল।

বিগত শতাব্দীর শেষে আয়নক রশ্মি আবিষ্কৃত হয়। ১৮৯৫ সালে জার্মান পদার্থবিদ ভিল্‌হেল্‌ম কন্‌রাড রণ্ট্‌গেন এক অদৃশ্য রশ্মি আবিষ্কার করে তার নাম দেন এক্স-রে। অবশ্য তাঁর নামানুসারে অনেক সময় একে রণ্ট্‌গেন রশ্মিও বলা হয়। ১৮৯৬ সালে ফরাসী পদার্থবিদ আঁরি বেকেরেল প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করেন। এই নবাবিষ্কৃত রশ্মিরাশি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং নানা বিজ্ঞানী নানাভাবে তা ব্যবহারের প্রয়াস পান। সুতরাং এদের জীবতাত্ত্বিক প্রভাবের আশু আবিষ্কারে বিস্ময়ের কিছুই ছিল না।

রণ্ট্‌গেন কর্তৃক বিজ্ঞানবিশ্বকে তাঁর আবিষ্কার সম্পর্কে অবহিত করার অল্প কয়েক মাস পরই ১৮৯৬ সালে সেণ্ট-পিটার্সবুর্গ জীবতাত্ত্বিক পরীক্ষাগারের বুলেটিনে ‘প্রাণীদের উপর রণ্ট্‌গেন আবিষ্কৃত এক্স-রে’র প্রভাব সম্পর্কিত নিরীক্ষা’ নামে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এর লেখক ইভান তার্খানভ — রুশ আকাদমিশিয়ন। নিঃসন্দেহে এক্স-রে’র জীবতাত্ত্বিক প্রভাব সম্পর্কে এটিই প্রথম প্রবন্ধ। তেজাহত সোনাব্যাঙে তার্খানভ কোন কোন শারীরবৃত্তীয় বিক্রিয়ার পরিবর্তন লক্ষ্য করেন। অতঃপর শবার, অ্যাট্‌কিনসন, লপ্রিওরে প্রমুখ ভিনদেশী বিজ্ঞানীও তাঁদের পরীক্ষার তথ্যাদি প্রকাশ করেন।

অচিরেই এক্স-রে’র জীবতাত্ত্বিক প্রভাব সম্পর্কে কিছু তথ্যাদি জীববিজ্ঞানের আওতাবহির্ভূত এক সূত্র থেকে জানা গেল। এক্স-রে নিয়ে কর্মরত বিজ্ঞানী এবং তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহারকারীরা সকলেই চর্মক্ষতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। বিকিরণের মুখোমুখি কিছু অনুভব না করলেও পরে স্থানবিশেষে লাল রঙের দাগ দেখা দিল এবং তা স্থায়ী ক্ষতে পরিণত হল। যথাসময়ে আরও কঠিন ব্যাধির উদ্ভব ঘটল এবং তা গবেষকদের পক্ষে মারাত্মক প্রমাণিত হল।

এক্স-রে ও তেজস্ক্রিয় পদার্থ সম্পর্কিত গবেষকদের অগ্রগামীরা প্রায় সকলেই বিজ্ঞানের শহীদ হলেন। ১৯৩৬ সালে এক্স-রে গবেষণায় আত্মদাতা বিজ্ঞানী ও ডাক্তারদের স্মরণে হামবুর্গে একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হয়।

উদ্বোধনের সময় খোদাই করা নামের সংখ্যা ছিল ১১০। এখন সংখ্যাটি বৃদ্ধি পেয়েছে।

এক্স-রে ও এর জীবতাত্ত্বিক প্রভাব বিজ্ঞানীদের সামনে এক জটিল সমস্যা হয়ে দেখা দিল। এতে মারাত্মক ক্ষতি হয় কেন? মনে রাখা দরকার যে, স্বল্প পরিমাণ বিকিরণের জীবতাত্ত্বিক প্রভাবও পর্যাপ্ত হতে পারে, এমন কি এতে মৃত্যু ঘটাও সম্ভব। আণবিক বোমার বিস্ফোরণকেন্দ্রের নিকটবর্তী বিকিরণ যে মৃত্যুবর্ষী এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু মাইল দশেক দূরেও এর প্রভাব মারাত্মক কেন তাই বিচার্য সমস্যা।

বিকিরণ রণ্ট্গেন এককের ভিত্তিতেই পরিমাপ্য। বহুসংখ্যক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, স্তন্যপায়ীদের সকল প্রজাতিতেই বিকিরণের মারাত্মক পরিমাণ কয়েক শো রণ্টগেনের কম নয়। বিশেষ ব্যবস্থা ছাড়া কোন স্তন্যপায়ীই ১,০০০ রণ্ট্গেন বিকিরণমাত্রা সহ্য করতে পারে না এবং মানুষও এর ব্যতিক্রম নয়।

কয়েক শো রণ্ট্গেনের মাত্রা আসলে কত? এতে ক্ষরিত শক্তির স্বচ্ছ ধারণার জন্য একে অন্যতর কোন সুপরিচিত এককের মাধ্যমে প্রকাশ করা প্রয়োজন।

পদার্থবিদরা যে সকল শক্তি সম্পর্কে অবহিত তাঁরা সেগুলি পরিমাপের জন্য ভিন্ন ভিন্ন একক ব্যবহার করেন। যথা, তাপের জন্য কেলোরি, বিদ্যুতের জন্য কিলোওয়াট-ঘণ্টা, ইত্যাদি। কিন্তু সকল শক্তিই পরস্পর-রূপান্তরক্ষম। তাপকে বিদ্যুতে এবং বিদ্যুৎকে তাপে রূপান্তরিত করা সম্ভব। কত কিলোওয়াট-ঘণ্টা এক কেলোরির সমান তা সকলেই জানেন। আয়নক বিকিরণের শক্তিও অন্যান্য শক্তিতে রূপান্তরণযোগ্য। মানুষের পক্ষে মারাত্মক পরিমাণ বিকিরণের (১,০০০ রণ্ট্গেন) অংশমাত্রও না হারিয়ে তা তাপ অথবা বিদ্যুতে রূপান্তরিত করলেই দেখা যাবে ঐ শক্তি দিয়ে কী করা সম্ভব। যদি তা দিয়ে এক গ্লাস জল গরম করা হয় তবে এর তাপমাত্রা বাড়বে মাত্র এক ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড। একে বিদ্যুতে রূপান্তরিত করে ২৫ ওয়াট একটি বাল্বে সরবরাহ করলে আলো জ্বলবে মাত্র আধ মিনিট। আর শেষ পর্যন্ত যদি এটি জীবনীশক্তিতে (জীবমাত্রেই প্রতি মুহূর্তে শক্তি ক্ষয় করে) ব্যবহৃত হয় তবে তা স্থায়ী হবে মাত্র ছয় সেকেন্ড।

অন্যান্য বিকিরণের এই মাত্রা একেবারেই ক্ষতিকর নয়। সমুদ্রসৈকতে সূর্যস্নাত মানুষও বিকিরণোন্মুক্ত। সে দুই সেকেণ্ডে প্রায় ১,০০০ রণ্ট্গেন

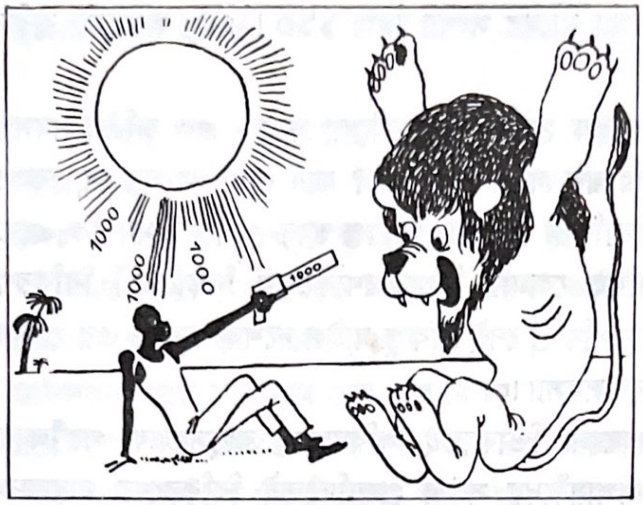

শক্তির প্রভাবাধীন। কিন্তু এই বিকিরণ আলোর, তাপের, অতিবেগুনী রশ্মির। অথচ মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোদ সহ্য করতে পারে।

এই সরল হিসাব থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, বিকিরণের মারাত্মক মাত্রার অর্থ প্রচুর পরিমাণ শক্তি নয়। স্পষ্টতই ‘ছলনাকারী’ রশ্মিটির কোন এক বৈশিষ্ট্যই ক্ষতির কারণ। আয়নক রশ্মির জীবতাত্ত্বিক প্রভাব তখনই আবিষ্কৃত হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল এর ব্যাখ্যাদান সম্ভব হয় নি। বিশের দশকের শুরুতেই কেবল এ সম্পর্কে প্রথম যুক্তিনিষ্ঠ তত্ত্ব উপস্থাপিত হয়েছিল। তাও ভ্রান্ত প্রমাণিত হল, তবু এর অংশবিশেষে এমন কিছু সারবত্তা ছিল যা তেজস্ক্রিয়তার জীবতাত্ত্বিক প্রভাব প্রক্রিয়ার আধুনিক ধারণাগুলিতে এখন আত্মীকৃত।

আণবিক বিস্ফোরণের পাল্লা

অধিকাংশ জীববিদ ও ডাক্তারদেরই পদার্থবিদ্যার জ্ঞান অতি সীমিত। পঞ্চাশ থেকে ষাট বছর আগে অবস্থাটি শোচনীয়তর ছিল। আয়নক বিকিরণ যেহেতু একটি ভৌত উপাদান, তাই পদার্থবিদ্যার জ্ঞান ব্যতিরেকে এর জীবতাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সম্ভব নয়।

ফ্রেডারিক ডেসাউয়ার রণ্ট্‌গেন তত্ত্বের অন্যতম প্রারম্ভিক গবেষক এবং তাঁর নাম হামবুর্গের সেই স্মৃতিস্তম্ভে খোদিত। পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে তিনি যথাযথ

অবহিত ছিলেন। এক্স-রে যে একক এবং পর্যাপ্ত মাত্রার আয়নন মাধ্যমে পদার্থবিশেষে শক্তিক্ষেপণ করে এই তথ্য তিনি জানতেন। বিকিরণের মারাত্মক মাত্রা যে জীবদেহে অত্যল্প পরিমাণ শক্তি ক্ষেপণ করে সে সম্পর্কেও তাঁর কোন ভ্রান্তি ছিল না। তিনি জানতেন, সকল শক্তিই শেষ অবধি তাপে রূপান্তরিত হয়। তিনি ভাবলেন যে, বিকীর্ণ শক্তির রূপান্তরণজাত তাপমাত্রার গড় পর্যাপ্ত না হলেও স্থানবিশেষে এর মাত্রা অত্যধিক হতে পারে। তেজস্ক্রিয়তা নির্দিষ্ট পরিমাণে শক্তি ক্ষেপণ করে ও নির্দিষ্ট বিন্দুতে তা ঘনীভূত হয়। এবং, সেখানে তাপমাত্রার অত্যধিক বৃদ্ধি ঘটে। ডেসাউয়ার উত্তাপকেন্দ্র তত্ত্ব ('পয়েণ্ট হিট') উপস্থাপিত করেন। এই তত্ত্বানুসারে বিকিরণের ফলে স্থানবিশেষে তাপমাত্রার অত্যধিক বৃদ্ধি ঘটে, প্রোটিন তঞ্চিত এবং ফলত জৈবিক ক্ষয় সংঘটিত হয়।

আমরা আগেই বলেছি যে, তত্ত্বটি শেষ অবধি ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছিল। সমস্যাটি কেবলমাত্র বিন্দুবিশেষের তাপমাত্রায় কেন্দ্রিত নয়। এর প্রভাবে স্থানবিশেষে প্রোটিনের তঞ্চন ঘটলেও বিধ্বস্ত অণুর পরিমাণ এখানে কোন জৈবিক পরিণতি ঘটানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাছাড়া তিনি শক্তিবিচ্ছুরণের মাত্রাকে এর অন্তর্ভুক্ত করেন নি। তাই ডেসাউয়ারের উত্তাপকেন্দ্র তত্ত্বটি এখন ঐতিহাসিক তথ্য ছাড়া আর কিছু নয়।

তা সত্ত্বেও তাঁর বস্তুমধ্যে অসম তাপপ্রসারণের প্রত্যয়টি অত্যন্ত ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়েছিল। বস্তুত, শক্তিপ্রসারণ ব্যতিরেকে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের জৈবিক প্রভাব ব্যাখ্যা সম্ভবপর নয়। কারণ, আমরা জানি এখানে মোট শক্তির পরিমাণ নগণ্য।

ডেসাউয়ারের তত্ত্বটি পরিত্যক্ত হলেও এ থেকে আমরা পেয়েছি 'লক্ষ্যভেদ প্রণালী' (হিট প্রিন্সিপল)। বস্তুপদার্থ রশ্মিশক্তিকে একক, স্বল্পসংখ্যক কিন্তু যথেষ্ট বড় মাত্রার শক্তি — 'লক্ষ্যভেদ' রূপে — শোষণ করে। অর্থাৎ এই প্রণালী অনুসারে কতকগুলো আণুবীক্ষণিক বিন্দু এখানে পর্যাপ্ত শক্তি আহরণ করে এবং অন্যরা কিছুই পায় না। 'লক্ষ্যভেদ প্রণালী' জীবপদার্থবিদদের আবিষ্কৃত কোন মনগড়া প্রকল্প নয়, একটি সুপ্রতিষ্ঠ ভৌত বাস্তবতা।

শক্তির অসম প্রসারণের ঘটনা আপনা থেকে কোন আলোকপাতে সক্ষম নয়। বিকিরণের জৈবিক প্রভাব বোঝার জন্য অতিরিক্ত অনুমান অপরিহার্য। বিজ্ঞানীরা লক্ষ্যভেদ তত্ত্ব (টার্গেট থিওরি) উপস্থাপিত করলেন। তদনুসারে

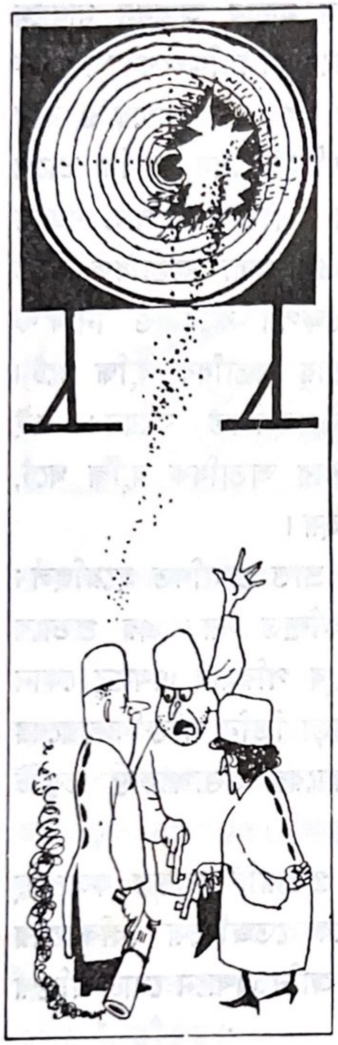

কোষে তেজাঘাতের সময় বিকীর্ণ রশ্মি কোষের সকল অংশ সমভাবে 'লক্ষ্যভেদ' করতে পারে না। যদি কোষের অতি সংবেদনশীল একটি 'প্রাণকেন্দ্র' আছে বলে মনে করা হয় তবে সেটির 'লক্ষ্যভেদে' মারাত্মক ফল ফলবে।

ডেসাউয়ার তাঁর উতাপকেন্দ্র তত্ত্ব গ্রন্থনাকালে সাধারণ যুক্তিপ্রমাণের মধ্যেই শুধু সীমিত থাকেন নি, একটি গাণিতিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠারও প্রয়াস পেয়েছিলেন। অধিকাংশ বিষের প্রভাবে যেমনটি ঘটে, বিকিরণ মাত্রার সৃষ্ট প্রতিক্রিয়ার গ্রাফ সে তুলনায় অনেকাংশে ভিন্নতর হয়।

তত্ত্বটির শুদ্ধতার নির্ণায়ক প্রয়োজনীয় গ্রাফ তৈরির জন্য তিনি তাঁর তরুণ সহকর্মী ব্লাউ ও আল্টেনবার্গারকে নির্দেশ দেন। তাঁরা তাঁর তত্ত্বকে গাণিতিক সূত্রের পরিভাষায় অনুবাদক্রমে গ্রাফ অংকন শুরু করলেন। গ্রাফগুলো ছিল পরীক্ষালব্ধ ফলেরই সম্পূর্ণ প্রতিফলন।

ব্লাউ ও আল্টেনবার্গারের সূত্রের সঙ্গে তাপ অথবা প্রোটিন অণুর কোনই সম্পর্ক ছিল না। তাতে আয়নন বিস্তার ও জৈবিক প্রভাবের মধ্যে একটি সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ডেসাউয়ারের তত্ত্বের এই অংশই অভ্রান্ত ছিল এবং তা থেকেই আমাদের 'লক্ষ্যভেদ নিয়ম' উদ্ভূত। অতঃপর প্রাচীনতর সূত্রাবলীও তাতে যুক্ত হল। পরীক্ষালব্ধ গ্রাফ থেকে প্রাপ্ত 'লক্ষ্যভেদসংখ্যা' ও 'লক্ষ্যের আকার' নির্ণয়ে এগুলো সহায়ক হয়েছিল।

বিষয়টি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। অনেক বিজ্ঞানী এর গাণিতিক বিশ্লেষণকেই নিজেদের গবেষণার প্রধান লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করলেন। কোন লক্ষ্যবস্তু — প্রাণী, উদ্ভিদ অথবা জীবাণুকে বিভিন্ন মাত্রায় তেজাঘাতের পর তাঁরা গ্রাফ অঙ্কন করতেন এবং বিশ্লেষণের পর ইপ্সিত জৈবিক প্রভাব সংঘটনের জন্য অমুক আয়তন 'লক্ষ্যবস্তুর' উপর অমুকবার 'লক্ষ্যভেদ' করা প্রয়োজন, সে সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন। সিদ্ধান্তগুলি

ছিল অত্যন্ত সরলীকৃত। প্রসঙ্গত, তৎকালীন প্রকাশিত নিবন্ধগুলির একটির প্রতিপাদ্য উল্লেখ্য: শিমের চারাকে মারতে, অর্থাৎ এদের বৃদ্ধিরোধ করতে, নয়টি 'লক্ষ্যভেদ' প্রয়োজন। কিন্তু আমরা জানি শিকড়ে অল্পবিস্তর সদৃশ কোষের সংখ্যা অজস্র। সুতরাং শিকড় মারার জন্য বহুসংখ্যক কোষ ধ্বংস প্রয়োজন। শিকড়ে বোধহয় এমন কোন আণুবীক্ষণিক লক্ষ্যবস্তুর অস্তিত্ব নেই যে প্রাণকেন্দ্রকে আঘাত করলে এর সকল কোষের বিভাজন প্রক্রিয়া অবরুদ্ধ হবে।

নানা বিজ্ঞানী নানাভাবে উক্ত তথ্যাদি ব্যবহার করেছেন। আনুষ্ঠানিক তাৎপর্য ছাড়া এগুলো যে গুরুত্বহীন অনেকেই এই শুদ্ধ ধারণার অনুবর্তী ছিলেন। তাঁরা প্রতিতুলনা ও তুলনার সুবিধার জন্য এগুলোকে গ্রাফ বর্ণনায় ব্যবহার করতেন। অন্যরা অবশ্য আরো এগিয়ে যাবার জন্য সচেষ্ট হন। তাঁরা মনে করতেন লক্ষ্যভেদ তত্ত্বানুসারে এই আনুষ্ঠানিক জ্ঞানগর্ভ তাৎপর্যে সমৃদ্ধ। ফরাসী পদার্থবিদ হল্‌ভেকের মতে লক্ষ্যভেদ তত্ত্ব জৈবপ্রকৃতি নিরীক্ষায় সর্বাধিক সূক্ষ্ম ও সঠিক পদ্ধটি। এটি পরিসংখ্যানভিত্তিক অতি-অণুবীক্ষণবিশেষ, যা প্রকৃতিকে তার নিগূঢ়তর রহস্যের উন্মোচনে বাধ্য করবে। অজ্ঞাত বস্তুর আবিষ্কার, অতি গুরুত্বপূর্ণ জৈবিক সংস্থার অস্তিত্ব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণীতে হল্‌ভেকের পরিসংখ্যানভিত্তিক বিশ্লেষণ ব্যবহারের প্রয়াস পেয়েছিলেন। কিন্তু অনেক সময় তাঁর হিসাব ও মূলসংস্থার মধ্যে সঠিক কোন পারম্পর্য ছিল না।

অতি সামান্য পরিমাণ শক্তি এবং এরই ফলস্বরূপ নাটকীয় জৈবিক বিক্রিয়া — বিজ্ঞানীরা এর ব্যাখ্যাদানের জন্য বহু সময় ব্যয় করলেন। তেজজীববিদ্যার বিপুল প্রকল্প উপস্থাপিত হয়েছে।

অবশ্য, যে সকল তেজজীববিজ্ঞানী বংশাণুবিদ্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ তাঁদের কাছে সমস্যাটি কোন হেঁয়ালি নয়। ১৯২৮ সাল অবধি সকলেই অবহিত হয়েছিলেন যে, তেজাঘাত মাত্রা যত সামান্যই হোক তা থেকে উৎপন্ন অধিকাংশ মিউটেশনই জীবান্তক এবং এতে কোষের মৃত্যু ঘটে। (ডেসাউয়ারের প্রতি সুবিচারক্রমে বলা যায়, বিকিরণের বংশানুসৃত প্রভাব তাঁর কালে অজ্ঞাত ছিল। অথচ হেল্‌ভেকের সময় অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি যখন তাঁর 'পরিসংখ্যানভিত্তিক অতি-অণুবীক্ষণ' প্রত্যয় প্রচারে উচ্চকণ্ঠ, তেজবংশাণুবিদ্যা তখন একটি সুপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান।)

তেজাহত কোষকলায় তেজস্ক্রিয় শক্তির বিস্তার অসম এবং এতে তাপগহ্বর

সৃষ্টি হয় এই তত্ত্ব থেকেই 'লক্ষ্যভেদ নিয়ম'এর উদ্ভব। 'লক্ষ্যভেদ' স্থানের উপরই সম্ভাব্য ফলাফল নির্ভরশীল। যদি কোষস্থ জলের কোন অণু অথবা গলিত কোন লবণ এভাবে বিনষ্ট হয় তবে এতে কোন সাংঘাতিক ফল ফলবে না। যদি গুরুত্বপূর্ণ জৈব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন প্রোটিন অথবা উৎসেচক অণু বিনষ্ট হয় তবে এতেও মারাত্মক কিছু ঘটবে না। যদিও প্রোটিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ তবু কোষে এমন বহুসংখ্যক সদৃশ অণু আছে যারা একই কার্য সম্পাদনে সক্ষম। যদি কোষস্থ ১,০০০ অণুর মধ্যে ৯৯৯টিই অটুট থাকে তবে সেখানে এই ক্ষয় অনুভূত হবে না। কোন প্রোটিন ধ্বংসক্রমে কোন কর্মকাণ্ডের পরিবর্তন ঘটাতে হলে ঐ সব সদৃশ অণুর অধিকাংশই ধ্বংস করা প্রয়োজন। এবং বলা বাহুল্য জীবতাত্ত্বিক পরীক্ষায় এমন মাত্রার ব্যবহার সম্ভবপর নয়।

কোষের অন্য উপাদান অপেক্ষা জিনের বিশেষ ভূমিকার কারণ তুলনামূলক গুরুত্বের বিষয় নয়, এ তার স্বকীয় অনন্য বৈশিষ্ট্য। অন্যান্য উপকরণ ব্যতীতও কোষের পক্ষে টিকে থাকা অসম্ভব। প্রতি ক্রমোসোমে প্রত্যেক প্রকার জিন একটি করে অবস্থিত। এর বিনাশ কিংবা রূপান্তরণ ঘটলে এর বিকল্প মেলা ভার। অধিকাংশ দেহকোষে দ্বিগুণসংখ্যক ক্রমোসোম বর্তমান, সুতরাং জিনের সংখ্যাও দ্বিগুণ। জিনদুটির মধ্যে একটির বিনাশ এক গুরুতর সমস্যা। জিনের উপর আঘাতজনিত পরিবর্তনে কোষের মৃত্যু ঘটা সম্ভব। কোন কোষকে প্রভাবিত করার জন্য নির্দিষ্ট জিনকে আঘাত করা নিষ্প্রয়োজন, কারণ সেজন্য যেকোন জিনই যথেষ্ট। সুতরাং কোষের সম্ভাব্য বংশাণুধৃত মৃত্যুর হার এতে কম হবে না।

অতএব এরূপ একটি প্রকল্প উপস্থাপন সম্ভব যে, কোষের মিউটেশনই তেজাঘাতজনিত কোষমৃত্যুর মুখ্য কারণ। কিন্তু তথ্যনির্ভরতা ও পরীক্ষাসিদ্ধতা ছাড়া কোন প্রকল্পের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বপর্যায়ে উত্তরণ কোনক্রমেই গ্রাহ্য নয়। মিউটেশন যে তেজাঘাতসৃষ্ট নাদ্‌সন ও ফিলিপভ, মুলার ও স্ট্যাড্‌লারের দিগ্‌দর্শী গবেষণার ফলেই তেজাঘাতের কারণ হিসেবে মিউটেশনের উদ্ভব স্বীকৃতি লাভ করে এবং এই নতুন প্রক্রিয়ার মাত্রিক গুরুত্ব গবেষণার কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়।

জীববিজ্ঞানীর পক্ষে কাজটি যে সহজসাধ্য ছিল না, তা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। এই ধরনের সূক্ষ্ম ও নিখুঁত পরীক্ষার জন্য পরীক্ষামূলক পদার্থবিদ্যায় দক্ষতা অপরিহার্য ছিল। পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের প্রসেসিং ও

তত্ত্বগত মূল্যায়নের বিশেষ জ্ঞান কেবল পদার্থবিদ ও গণিতবিদদেরই আছে। সুতরাং জীববিজ্ঞানীরা যখন পদার্থবিদদের সঙ্গে একযোগে কাজ করেছেন কেবল তখনই মাত্রিক তেজবংশাণুবিদ্যার সমস্যাবলীর সমাধান সম্ভবপর হয়েছে।

একটি বিজ্ঞানের জন্ম

তেজবংশাণুবিদ্যা নির্বিঘ্নে সৃষ্টি হয় নি। এমন কি আয়নক বিকিরণ যে বংশানুসৃতিকে প্রভাবিত করে তার নিরীক্ষাও সহজসাধ্য ছিল না।

মুলার ও স্ট্যাড্‌লার এবং নাদ্‌সন ও ফিলিপভ যথাক্রমে তাঁদের গবেষণার ফল ১৯২৭ এবং ১৯২৫ সালে প্রকাশ করেন। কিন্তু ১৯২০ সালেই নাদ্‌সন লিখেছিলেন: 'রেডিয়াম থেকে পাওয়া ঘাত কোষের বংশানুসৃত বৈশিষ্ট্যে পর্যবসিত হতে পারে।' রুশ বিজ্ঞানী নিকোলাই কল্‌ৎসোভ ১৯১৭ অথবা ১৯১৮ সালে তাঁর তরুণ সহকারী দ্‌মিত্রি রমাশোভকে এক্স-রে মাধ্যমে ড্রসোফিলার মিউটেশন উৎপাদন করার নির্দেশ দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দশ বছর পরে মুলার ঠিক এরই পুনরাবৃত্তি করেছিলেন।

রমাশোভ যথানির্দেশিত পরীক্ষা শুরু করলেও অচিরেই তা পরিত্যাগ করেন। কল্‌ৎসোভ তেজাহত মাছিদের সন্ততিতে প্রত্যাশিত মিউটেশনগ্রস্তদের খুঁজে পেলেন। কিন্তু বিকিরণের ফলেই যে এদের উদ্ভব, এর নিশ্চয়তা বিধানে তিনি সফল হলেন না। এদের সংখ্যা ছিল খুবই অল্প এবং মিউটেশন বাহ্যপ্রভাব ছাড়াও উদ্ভূত হয়। তাছাড়া এমনো হতে পারে যে, বহুকালের প্রচ্ছন্ন মিউটেশন পরীক্ষাগারে এই সঙ্করণের মধ্যে এখনই প্রকটিত হয়েছে। সুতরাং কল্‌ৎসোভের প্রাপ্ত ফলাফল থেকে শেষ অবধি কোন সিদ্ধান্তই গৃহীত হল না।

বিকিরণভিত্তিক পরীক্ষার জন্য বংশাণুবিদদের ড্রসোফিলার এমন বিশেষ ধারা উৎপাদন প্রয়োজন ছিল যেখানে মিউটেশন সনাক্ত করা সহজ ও নিখুঁত হয়। *C l B* মাছিগোষ্ঠীর মুখ্য অবদান এখানে সবিশেষ উল্লেখ্য। এদের সাহায্যে প্রচ্ছন্ন লিঙ্গান্বিত মিউটেশন (যৌন ক্রমোসোমে অবস্থিত) 'ধরা' সম্ভব হয়েছিল। এই পরীক্ষা অত্যন্ত সহজ। এতে তেজাহত পুরুষ মাছিদের *C l B* স্ত্রীদের সঙ্গে মিলিত করে দ্বিতীয় প্রজন্মই পরীক্ষা করা হয়।

যৌন ক্রমোসোমে কোন মিউটেশন জন্মালে এর প্রতিযঙ্গী চারিত্র্য দ্বিতীয় প্রজন্মের সকল পুরুষেই প্রকটিত হবে। এখানে মিউটেশনটি সত্যিকার না আপাতিক কোন বিকৃতি, সে সম্পর্কে আর সংশয় থাকবে না। কারণ, এই শেষোক্ত বৈশিষ্ট্যটি বংশানুসৃত নয়। মিউটেশনটি যদি জীবান্তক (ভ্রূণের মৃত্যু ঘটিয়ে) হয় তবে দ্বিতীয় প্রজন্মে কোন পুরুষ মাছিই আর জন্মাবে না। পদ্ধতিটি ব্যবহারে ড্রসোফিলার বংশাণুবিদ্যার অভিজ্ঞতা অপরিহার্য নয়।

সমগ্র মিউটেশনমালা তিনটি বৃহদায়তন বর্গে বিভাজ্য। পূর্বালোচিত মিউটেশনসমূহ নিজেরাই জিন পরিবর্তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং তাই তো বংশাণুধৃত বা জেনিটিক নামাঙ্কিত। কোষস্থ ক্রমোসোমের আণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় এই মিউটেশন নির্ণীতব্য নয়। যে আণবিক রূপান্তর এর কারণ তার পরিসর অতি সূক্ষ্ম।

তবু এমন মিউটেশনও সম্ভব (তেজাঘাতের ফলে এর বিশেষ সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে), যখন ক্রমোসোমের পরিবর্তন সহজেই লক্ষ্য করা যায়। দৃষ্টান্ত হিসেবে একটি ক্রমোসোমের দ্বিধাভবন অথবা একটি ক্রমোসোমের শীর্ষ এবং অন্যটির পুচ্ছ নিয়ে আণুবীক্ষণিক 'সেণ্টর'এর উদ্ভব উল্লেখ্য। এই ধরনের মিউটেশন ক্রমোসোমীয়।

দৈহিক স্বাভাবিকতা সত্ত্বেও ক্রমোসোমের সংখ্যাগত পরিবর্তন এই ধারার অন্যতর নজির। কোন একটি ক্রমোসোমের সংখ্যা একটি বেশী কিংবা একটি কম অথবা সকল ক্রমোসোমের দ্বিগুণিত হওয়া সম্ভব। এই শেষোক্ত মিউটেশনটি জিনোমিক নামে চিহ্নিত। বিকিরণের প্রভাবে জিন ও ক্রমোসোম মিউটেশনের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলেও জিনোমিক মিউটেশনে তা নিষ্ক্রিয়প্রায়।

বংশাণুবিদরা সেকালে বহু সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন। বিকিরণের মাত্রা, এর ব্যাপনকাল, বিকিরণের প্রকারভেদ, তাপমাত্রা, আনুষঙ্গিক রাসায়নিক প্রভাব ইত্যাকার হেতুসমূহের সঙ্গে মিউটেশন সংখ্যার সম্পর্ক তাঁদের নির্ণয় করতে হয়েছিল। এই আবিষ্কার যে সাধারণ নিয়ম এবং কোন্ কোন্ প্রজাতির তা বিশেষ চারিত্র্য — এর নিশ্চয়তা বিধানের জন্য বহুসংখ্যক প্রাণী ও উদ্ভিদ প্রজাতির উপর বিজ্ঞানীরা পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। বিশের দশকের শেষ থেকে রুশ সাময়িকী 'বিওলগিচেস্কি জুর্নাল'এর প্রায় প্রতি সংখ্যা এবং মার্কিন সাময়িকী 'জিনেটিক্স', জার্মান 'ট্‌সাইশ্রিফ্‌ট ফিউর ফেরার্‌বুংস্‌লেরে' এবং ব্রিটিশ 'জার্নাল অব জিনেটিক্স' পত্রিকায়

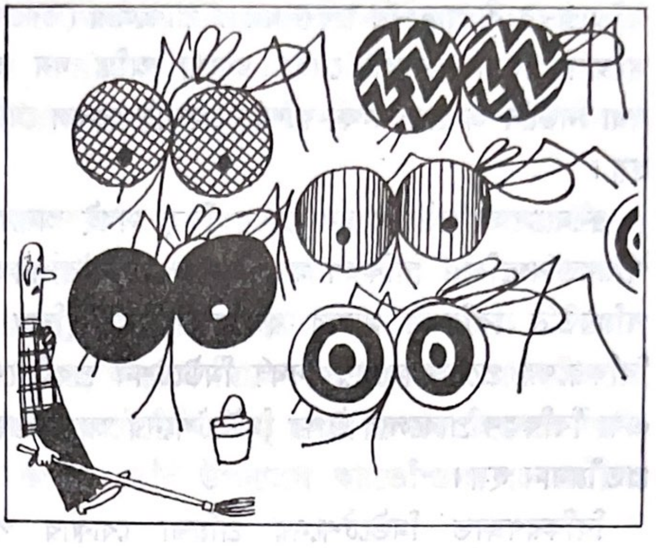

তেজবংশাণুবিদ্যা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত হত। চল্লিশের দশকের প্রথম দিকে এক্ষেত্রে সাধারণীকরণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভবপর হয়েছিল।

জিন মিউটেশন নিয়েই এবার আলোচনা শুরু করা যাক।

সংখ্যানুসারে বিকিরণ মাত্রার সঙ্গে এরা সমানুপাতিক। যদি এর মাত্রা দ্বিগুণ করা হয় তবে মিউটেশনের সংখ্যাও দ্বিগুণিত হবে। তাত্ত্বিক ও প্রয়োগিক এ উভয় ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্তটির গুরুত্ব সমধিক। তাছাড়া বংশাণুবিদ্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত নয় এমন কিছু সমস্যা সমাধানের জন্যও তা অপরিহার্য।

এই সরলরৈখিক সম্পর্কের সিদ্ধান্ত এই যে, কোষ অতিক্রমকারী একটি আয়নক কণাই মিউটেশন উৎপাদনে সক্ষম। মিউটেশন প্রকরণ বোঝার পক্ষে এই উপলব্ধিটি গুরুত্বপূর্ণ। এই পারম্পর্য থেকে মাত্রাবিশেষের প্রতিক্রিয়া নির্ণয় সম্ভব এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রচলনে তা গুরুত্বপূর্ণ।

অবশেষে বলা যায়, বংশানুসৃত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির জন্য বিকিরণের 'সীমান্ত মাত্রা' বা নিরাপদ মাত্রা বলে কিছু নেই। আণবিক পরীক্ষা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার পক্ষে এটি অন্যতম যুক্তি।

বিকিরণের নির্দিষ্ট মাত্রায় উৎপন্ন জিন মিউটেশনের সংখ্যা বিকিরণ প্রয়োগকালের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভরশীল নয়। রশ্মি কয়েক মিনিট, কয়েক দিন অথবা কয়েক অংশে ভাগ করে প্রক্ষিপ্ত হলেও ফলাফলে কোন তারতম্য ঘটে না।

এক্স-রে বা গামা-রে প্রদত্ত মাত্রার প্রাবল্যের (তরঙ্গের দৈর্ঘ্য) সঙ্গে মিউটেশন সংখ্যার কোন সম্পর্ক নেই। অবশ্য অতি ঘন আয়ন উৎপাদক বিকিরণ যথা নিউট্রন অথবা আল্ফা রশ্মির ক্ষেত্রেই কেবল মৌলিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

ক্রমোসোম মিউটেশনের ক্ষেত্রে কিন্তু সবই অন্যরকম। এখানে সাধারণতম পরিবর্তনগুলিও বিকিরণ মাত্রার সঙ্গে সরলরৈখিকভাবে সম্পর্কিত। অন্যান্য পরিবর্তন বিকিরণ মাত্রার বর্গীয় পরিমাণবৃদ্ধির অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। বিকিরণের প্রয়োগকালের দৈর্ঘ্য মিউটেশন প্রকটনকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে এবং বিকিরণ প্রাবল্যের উপর মিউটেশনের আত্যন্তিক নির্ভরশীলতা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়।

বিকিরণজাত মিউটেশনের প্রক্রিয়া বোঝার পক্ষে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত এই স্বল্পসংখ্যক তথ্যই গুরুত্বপূর্ণ সমাধানসূত্র। জিন মিউটেশনের জন্য মাত্র একটি আয়ননের শক্তিই যথেষ্ট। কিন্তু ক্রমোসোম মিউটেশনের জন্য বিপুল পরিমাণ না হলেও এর চেয়ে বেশী শক্তি প্রয়োজন। এক বা দুটি কণা দ্বারা ক্রমোসোম বিদ্ধ হওয়া এখানে আবশ্যিক।

বিকিরণ পরীক্ষাবলী থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই জিনের প্রকৃতি সম্পর্কে প্রথম অনুমান নির্ধারিত হয়। জিন মিউটেশন যে একটি মৃদু রাসায়নিক পরিবর্তনমাত্র, ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি তেজবংশাণুবিদরা সে সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছিলেন এবং তাঁদেরই সিদ্ধান্ত: জিন একটি রাসায়নিক সত্তা অথবা একটি অণু কিংবা একটি মহাণুর অংশমাত্র। ত্রিশ বছর পর আণবিক বংশাণুবিদ্যায় তথ্যটি সম্পূর্ণ সমর্থিত হয়েছিল।

এগুলো তেজবংশাণুবিদ্যার মৌল উপকরণমাত্র। এখন তেজবংশাণুবিদ্যা অন্যতর সমস্যাবলীর প্রতি আকৃষ্ট এবং মিউটেশন প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। যত অবিশ্বাস্যই মনে হোক এই সমস্যাটির সমাধানও সম্ভব এবং কিছু পরেই আমরা তা আলোচনা করব।

এক হেঁয়ালির সমাধান

মাত্রিক বংশাণুবিদ্যার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হবার পর কোষের বিকিরণজনিত ক্ষয়ক্ষতির ক্ষেত্রে বংশানুসৃত পরিবর্তন — মিউটেশনের ভূমিকানির্ণয়ও সম্ভবপর হল। সমস্যাটির সমাধানে ডাগলাস এডোয়ার্ড লি’র নাম বিশেষ

উল্লেখ্য। জীবপদার্থবিদ্যার ইতিহাসে লি এক বিস্ময়কর প্রতিভা। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনকাল অনন্য সাফল্যে দীপ্ত। ১৯১০ সালে লিভারপুলে তাঁর জন্ম, সেখানেই স্কুলশিক্ষা এবং ১৯৩১ সালে কেমব্রিজ থেকে পদার্থবিদ্যার অনার্স ডিগ্রী লাভ।

কেমব্রিজের সকল সেরা স্নাতকরাই বিখ্যাত ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরিতে কাজ করেন — এই সেখানকার রীতি। তখন প্রখ্যাত পদার্থবিদ রাদারফোর্ড এর প্রধান এবং কাপিৎসা, চেড্‌উইক, কক্রফ্‌ট, ব্ল্যাকেট এবং অন্যান্য খ্যাতিমান পদার্থবিদ তাঁর সহকারী। তাঁদের অন্যতম ছিলেন সি. পি. স্নো। পদার্থবিদ্যায় তাঁর ভাগ্যে খ্যাতির জয়মাল্য জোটে নি। কিন্তু শেষে লেখক হিসেবে তিনি বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর উপন্যাসে ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরির চমৎকার বর্ণনা আছে।

রাদারফোর্ডের পরীক্ষাগারে লি’র কাজ ভালভাবেই চলছিল। এই তরুণ পদার্থবিদ ছিলেন পরিশ্রমী ও প্রতিভাধর। নিউক্লীয় পদার্থবিদ্যার তখন শৈশবকাল। এরই অন্যতম সমস্যা — নিউট্রন ও প্রোটনের মিথষ্ক্রিয়া ছিল তাঁর গবেষণার বিষয়। একদিন হঠাৎ এক সাময়িকীতে কয়েকটি নিবন্ধ তাঁর চোখে পড়ল। ব্যাক্টেরিয়ার উপর আয়নক রশ্মির তেজাঘাতের প্রতিক্রিয়াই ছিল নিবন্ধাবলীর আলোচ্য বিষয়।

নিজের মনে মনে বললেন তিনি: ‘পদার্থবিদ্যার একটু বাড়তি জ্ঞান ব্যবহার করলে পরীক্ষাগুলি থেকে চমৎকার ফল পাওয়া যেতে পারে।’

ঘটনাটি ১৯৩৪ সালের। ১৯৩৫ সালের শেষাশেষি তেজজীববিদ্যার প্রবল আকর্ষণে তিনি স্ট্রেঞ্জওয়েস জীববিজ্ঞান ল্যাবরেটরিতে আসেন। কিন্তু কেবল পদার্থবিদ্যায় স্বীয় প্রতিভা এবং শ্রমের বিনিময়ে লি’র পক্ষে বিশেষ কোন সাফল্য অসম্ভব ছিল। জীববিদদের সঙ্গে সহযোগিতায় তাঁর অধিকাংশ নিবন্ধ রচিত। উদ্ভিদবিজ্ঞানী কোচসাইড, বংশাণুবিদ থোডে, ভাইরাসবিদ স্যালামান ও মার্কহ্যাম, অণুজীববিদ হেন্স ও কোল্‌সন — এঁরা সকলেই লি’র কাছ থেকে পদার্থবিদ্যায় শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং বিনিময়ে তাঁরা লি’কে জীববিদ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি অণুবীক্ষণ নিয়ে বসতেন, ড্রসোফিলা বাছাই ও অ্যাগার টুকরোয় ব্যাক্টেরিয়ার কলোনি গণনা করতেন। এভাবে তিনি জীববিদ্যায় পর্যাপ্ত জ্ঞান লাভ করেন এবং সেজন্য অন্য কোন পদার্থবিদ

অপেক্ষা জীবপদার্থবিদ্যায় তাঁর পক্ষে অধিকতর অবদান সৃষ্টি সম্ভবপর হয়।

লি ব্যাক্টেরিয়া নিয়েই কাজ শুরু করেন। বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের এক্স-রে (নিজের নকশানুযায়ী নির্মিত যন্ত্র ব্যবহার করে), আলফা, বেটা ও গামা রশ্মি, অতিবেগুনী আলো ও নিউট্রন দ্বারা ব্যাক্টেরিয়াগুলোকে আঘাত করে বিকিরণের মাত্রা, সময়দৈর্ঘ্য, রশ্মির প্রাবল্য ও তাপমাত্রা এবং এদের প্রভাবের পারম্পর্য নির্ণয়ে তিনি সচেষ্ট হন। ব্যাক্টেরিয়ার প্রজনন ক্ষমতার বিলুপ্তি (যা নিষ্ক্রিয়তা নামে চিহ্নিত) যে একটি মাত্র জিন মিউটেশনের ফল এই তথ্যটির প্রামাণিকতা তাঁরই আবিষ্কার।

অতঃপর শুরু হল ভাইরাস, ব্যাক্টেরিওফেজ, ড্রসোফিলা ও ফুলের রেণু নিয়ে পরীক্ষা। প্রতি বারই ফলাফল অভিন্ন : জীবন্ত কোষের বংশানুসৃত পরিবর্তনই মৃত্যুর কারণ।

বিভিন্ন উপকরণ ও সকল প্রকার আয়নক বিকিরণ ব্যবহারে ফলাফলের কোন তারতম্য দেখা গেল না এবং সর্বত্র একই অনুসিদ্ধান্ত গৃহীত হল। তাই তেজাহত কোষে বংশাণুধৃত পরিবর্তন বা মিউটেশনই যে মৃত্যুর প্রধান কারণ তা জীবজগতের বৈধ রীতি হিসেবে স্বীকৃতি পেল।

‘বংশানুসৃতি’ পিতা-মাতা থেকে সন্তানে চারিত্র্যলক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যের সংক্রমণ হিসেবেই শুধু চিহ্নিত নয়। বস্তুত সম্পর্কটি একক কোষের ক্ষেত্রেও বাস্তব। জীবকোষ বিভক্ত হয়, এদের অনেকের মৃত্যু ঘটে, অন্যরা এদের স্থলবর্তী হয়। কিন্তু এই শেষোক্তরা অন্য কোষ থেকে বংশানুসৃত বৈশিষ্ট্য লাভ করে। এমন কিছু কিছু কোষ আছে যারা অতি দ্রুত পুনর্স্থাপিত হয়, প্রত্যঙ্গবিশেষে মাত্র দিনকয়েক জীবিত থাকে।

ব্যাখ্যাটি থেকে অতঃপর বহুকোষী জীবকোষের বংশানুসৃত ক্ষয়ক্ষতির তাৎপর্য উপলব্ধি সম্ভবত সহজতর হবে। বহুসংখ্যক দেহকোষনাশী জীবান্তক মিউটেশন দেখা দিলে প্রত্যঙ্গবিশেষে তন্ত্রাবলীর দুর্বলতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিকিরণ ব্যাধি দেখা দেয়। আর মিউটেশন জীবান্তক না হলে অসময় বার্ধক্য অথবা টিউমারের উৎপত্তি ঘটে। জননকোষে অনুরূপ মিউটেশন জন্মালে নিকটতর অথবা দূরতর উত্তরপুরুষ এতে আক্রান্ত হতে পারে। লি’র পরীক্ষা থেকেই উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলির উদ্ভব।

১৯৪৬ সালে তাঁর লিখিত ‘জীবন্ত কোষে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাব’

গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য জীববিজ্ঞানীর তা অবশ্যপাঠ্য। এতে তাঁর প্রধান গবেষণাবলীর মর্মসার লিপিবদ্ধ।

১৯৪৭ সালের ১৬ই জুন এক দুর্ঘটনায় তাঁর শোচনীয় মৃত্যু ঘটে। পাঠনিবিষ্ট অবস্থায় গরাদহীন জানালায় হেলান দিতে গিয়ে তিনি নিচে পড়ে যান ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর বয়স তখন মাত্র ৩৭।

...১৯৪৫ সালের ৭ই আগস্টের ভোর। জাপানের হিরোশিমায় 'সহস্র সূর্যের আলো' বিস্ফোরিত হল, মৃত্যুর মুখে আত্মাহুতি দিল লক্ষাধিক প্রাণ। শুরু হল এক নতুন যুগ — আণবিক যুগ।

এযাবত আণবিক ও বিকিরণ গবেষণারত বিজ্ঞানীরা অন্যতর জরুরী সমস্যাবলীর প্রতি তাঁদের অনীহার জন্য নিন্দিত হতেন। এবার সে নিন্দার পালা ঘুচল। বৃদ্ধি পেল তেজজীববিজ্ঞানী ও তেজবংশাণুবিদদের চাহিদা। আয়নক বিকিরণ এখন আধুনিক জীবনের সাধারণ অনুষঙ্গ। এর বিপদ, এ থেকে প্রতিরক্ষার উপায় কী এবং এই সম্ভাবনাশীল শক্তিকে কীভাবে মানুষের সেবায় নিযুক্ত করা যায়, আমাদের তা জানা উচিত। পক্ষান্তরে তেজবংশাণুবিদরা আজ গবেষণার এমন সুযোগ লাভ করছেন যা যুদ্ধপূর্বকালে স্বপ্নাতীত ছিল। একদা উদ্যমী গবেষকদের কাছে এক্স-রে উপকরণই ছিল প্রধান হাতিয়ার। আজ নিউট্রন জেনারেটর, রেডিও-আইসোটপ, আয়নক কণিকার বিশাল অ্যাক্সেলেরেটর — মুহূর্তকাল অথবা একাধারে কয়েক দিন যাবৎ প্রয়োজনীয় বিকিরণ মাত্রা ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন যন্ত্রাদি বংশাণুবিদদের কাছে সহজলভ্য... কিন্তু নিজ কর্মকান্ডের ব্যাপক তাৎপর্য এবং এ বিজ্ঞান থেকে সুফল লাভের জন্য অপেক্ষিত মানবজাতির প্রত্যাশা আজ প্রত্যেক তেজবংশাণুবিদের চেতনায় অঙ্গীভূত এবং এটিই বড় কথা।

কেবলমাত্র আয়নক 'গোলা'য় বিদ্ধ হলেই কি জিনের পরিবর্তন ঘটে? জিনের যদি কোন রাসায়নিক সংস্থা থাকে, তবে কোন রাসায়নিক উপাদানে তা প্রভাবিত হবে? অবশ্যই, তা সম্ভব। কিন্তু বংশানুসৃতি পরিবর্তনের রাসায়নিক পদ্ধতি নির্ণয়ের বহু পূর্বেই এর ভৌত পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছিল।

আয়োডিন থেকে ইপেরাইট

যেকোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে। বলা বাহুল্য বংশানুসৃতির উপর রাসায়নিক পদার্থের প্রভাব আবিষ্কারও এর ব্যতিক্রম নয়।

মস্কোর উদ্ভিদবিজ্ঞানী ইভান গেরাসিমভ ১৮৯২ সালে সবুজ শৈবাল স্পাইরোগিরা-র উপর তাপমাত্রার প্রভাব পরীক্ষা করেন। কোন কোন কোষে তিনি অদ্ভুত পরিবর্তন দেখতে পান। নিউক্লিয়াসশূন্য কোষ, দুই নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষ এবং বিভাগোন্মুখ কোন কোন কোষে স্বাভাবিক সংখ্যার দ্বিগুণ ক্রমোসোমও তাঁর চোখে পড়ে। ক্রমোসোম সংখ্যার দ্বিগুণন অন্যতম বংশানুসৃত পরিবর্তন। এটি অবশ্য তেজাঘাতকৃত জিন মিউটেশন নয়, এটি জিনোমিক মিউটেশন।

ক্রমোসোমের সঙ্গে বংশানুসৃতির সংযোগ তখনো বিজ্ঞানীদের চোখে ধরা পড়ে নি। সুতরাং সমকালীন বিজ্ঞানীরা গেরাসিমভের এই আবিষ্কারের যথাযথ তাৎপর্য নির্ণয়ে ব্যর্থ হলেন। তিনি নিজেও বংশানুসৃতির রূপান্তরের সঙ্গে তাঁর আবিষ্কৃত ঘটনাকে যুক্ত করেন নি। চার বছর পর কিন্তু বিজ্ঞানবিশ্বের সামনে তিনি আরো একটি নতুন আবিষ্কার উপস্থাপিত করলেন। তিনি দেখালেন যে, নিম্ন তাপমাত্রার মতো ক্লোরোফোর্ম অথবা ক্লোরেলহাইড্রেট জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগেও একই ফল ফলানো সম্ভব।

গেরাসিমভের গবেষণার ফল ক্রমে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে গেল। সুতরাং রাসায়নিক পদ্ধতিতে মিউটেশন আবেশনের চেষ্টায় বংশাণুবিদদের একেবারে গোড়া থেকে কাজ শুরু করতে হল।

ত্রিশের দশকের প্রথম দিকে রুশ বিজ্ঞানী নিকোলাই কল্‌ৎসভ নিষেক ব্যতিরেকে গুটি পোকার ডিম ফুটানোর চেষ্টা শুরু করেন। তাঁর প্রচেষ্টা সফল হয়। তিনি হাইড্রক্লোরিক এসিড, আয়োডিন, ফর্মেলিন, আয়রন ক্লোরাইড, পটাসিয়াম পার্মাঙ্গানেট, সিলভার নাইট্রেট এবং পটাসিয়াম ক্লোরেট ব্যবহারে ঈপ্সিত ফল পান।

যখনই জানা গেল যে এই পদার্থগুলি প্রত্যক্ষভাবে নিউক্লিয়াসকে প্রভাবিত করে তখন এগুলির প্রয়োগক্রমে মিউটেশন আবেশনের চেষ্টারম্ভই শুধু বাকি রইল। কল্‌ৎসভের অন্যতম সহকর্মী ভ্লাদিমির সাখারভই প্রথম এই

প্রচেষ্টা শুরু করেন। ড্রসোফিলার নিষিক্ত ডিমে আয়োডিন প্রয়োগ করে তিনি বহুসংখ্যক মিউটেশন উৎপাদন করলেন। এদের মধ্যে জীবান্তক (যা সন্তানদের মৃত্যু ঘটিয়েছিল) এবং জীবন্ত (বংশানুসৃত পরিবর্তিত বাহ্য চারিত্র্য সহ) উভয়ই প্রকার মিউটেশনই ছিল। ১৯৩২ সালে সাখারভের প্রথম নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। পরবর্তী পরীক্ষাসমূহে সাখারভ ও তাঁর ছাত্ররা অন্য পদার্থ ব্যবহার করেও মিউটেশন উৎপাদনে সফল হন। আর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে এবং একই সময়ে লেনিনগ্রাদের তরুণ বিজ্ঞানী মিখাইল লবাশভও রাসায়নিক মিউটেশন (ড্রসোফিলার উপরেই) উৎপাদন করেন।

পরীক্ষাগুলির মাত্রিক ফলাফল অত্যন্ত সীমিত ছিল। উৎপন্ন মিউটেশনের আত্যন্তিক স্বল্পতা সত্ত্বেও এতে রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে মিউটেশন আবেশনের সম্ভাব্যতা নীতিগতভাবে প্রমাণিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মৌলিক তথ্যাদি উদ্‌ঘাটনই সাখারভ ও লবাশভের একমাত্র অবদান নয়। এমন কি প্রাথমিক পরীক্ষার সময় বিকিরণ ও কোন কোন রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগের ফলে উদ্ভূত মিউটেশনের সুচিহ্নিত প্রকারভেদও সাখারভের দৃষ্টিতে অস্পষ্ট থাকে নি।

সাখারভ, লবাশভ ও তাঁদের সহকর্মীদের আবিষ্কৃত প্রথম মিউটাজেনগুলো তেমন ফলপ্রসূ হয় নি। এজন্য কার্যরত গবেষকরা এগুলির প্রতি উদাসীন ছিলেন। কিন্তু ক'বছর পরেই আরো শক্তিধর মিউটাজেন আবিষ্কৃত হল।

১৯৩৭ সালে মার্কিন বিজ্ঞানী এ. এফ. ব্ল্যাক্স্‌লি কল্‌সিসিন আবিষ্কার করলেন। পদার্থটির উৎস শরৎকালীন ক্রকাস *(Colchicum)* এবং এতে উদ্ভিদের ক্রমোসোম সংখ্যা দ্বিগুণিত হয়। গেরাসিমভ চল্লিশ বছর আগে ক্লোরেলহাইড্রেট ও ক্লোরোফোর্ম ব্যবহার করে যে ফল পেয়েছিলেন পক্ষান্তরে ব্ল্যাক্স্‌লি এবার তাই পেলেন। গেরাসিমভ ব্যবহৃত পদার্থ অপেক্ষা কল্‌সিসিন বহুগুণ বেশী কার্যকরী প্রমাণিত হয়েছিল। আজ বহু বছর অতিক্রান্ত তবুও এর চেয়ে উন্নততর কিছুই আর আবিষ্কৃত হয় নি।

কল্‌সিসিন চমৎকার বস্তু। প্রাচীন রোমে বাতের সাধারণ প্রতিষেধকরূপে (অবশ্য বিশুদ্ধ অবস্থায় নয়) এর ব্যবহার প্রচলিত ছিল। আজ কল্‌সিসিনের ব্যবহার শুধুমাত্র ক্রমোসোম দ্বিগুণনেই সীমিত নয়, কয়েক ধরনের ক্যান্সার চিকিৎসায়ও প্রযুক্ত।

ক্রমোসোম সংখ্যার দ্বিগুণন (কিংবা বহুগুণীভবন) পলিপ্লয়েডি নামে চিহ্নিত। বিজ্ঞানীদের তা জ্ঞাত ছিল। পলিপ্লয়েডি প্রকৃতিতে নতুন

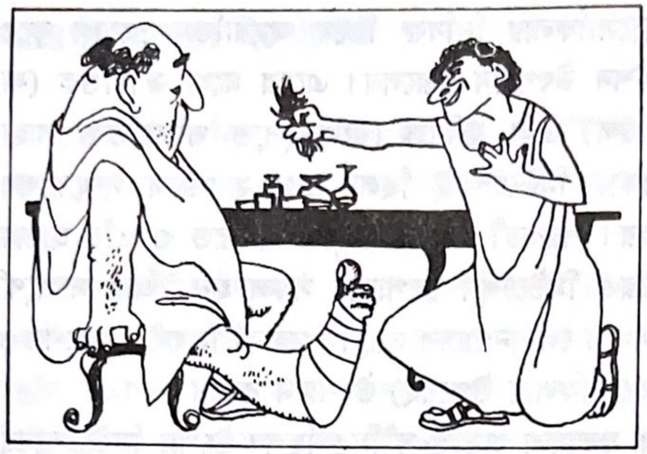

প্রজাতি জন্মের অন্যতম কারণ। বহু পলিপ্লয়েডমালা আমরা এখন জানি যথা, বিভিন্ন প্রকার গমের ক্রমোসোম সংখ্যা হয় ১৪ অথবা ২৮ (দ্বিগুণ) কিংবা ৪২ (ত্রিগুণ)। এদের ১৪, ২৮ ও ৪২ ক্রমোসোমবিশিষ্ট ধারার মধ্যে যথাক্রমে একদানাধর গম, কঠিন ও কোমল জাতের গম অন্তর্ভুক্ত।

পলিপ্লয়েড প্রকার যথানিয়মে অধিক ফলনশীল। কিন্তু প্রকৃতির সকল উদ্ভিদ অবশ্যই পলিপ্লয়েড নয়। সুতরাং কৃত্রিমভাবে নতুন ও আর্থিক দিক থেকে লাভজনক উদ্ভিদ সৃষ্টির জন্য কল্‌সিসিন ও এই শ্রেণীর অন্যান্য পদার্থ ব্যবহৃত হয়।

বিজ্ঞানী মহলে পদ্ধতিটির প্রয়োগ অত্যন্ত ব্যাপক। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সাখারভকৃত পলিপ্লয়েড বাক্‌হুইট উল্লেখ্য। সাধারণ বাক্‌হুইটের ১,০০০টি দানার ওজন ১৬-২৯ গ্রাম। কিন্তু পলিপ্লয়েড প্রকারে এই ওজন ৩৫ গ্রাম হওয়াও সম্ভব। সোভিয়েত বংশাণুবিদরা ব্যবসায়িক দিক থেকে লাভজনক জোয়ার, কোক-সাগীজ (রবার উৎপাদক উদ্ভিদ), আফিম পপি, তিসি, পেপারমিণ্ট, চিনিবীট ও অন্যান্য ফসলের পলিপ্লয়েড প্রকার উৎপাদনে সাফল্য অর্জন করেছেন।

কিন্তু সমস্যার তা কেবল অংশমাত্র। নির্বাচকরা অনেক সময় এমন সম্ভাবনাশীল সংকর উদ্ভাবন করেন যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বন্ধ্যা। কিন্তু পলিপ্লয়েডীকরণে এদের উর্বরতা বিধান সম্ভব। এই পদ্ধতি অনুসারেই আ. দের্জাভিন রাই ও গমের সংকর এবং ভ. খিজ্‌নিয়াক 'এগ্রোট্রিটিক' (এক শ্রেণীর ঘাস *Triticum repens* ও গমের সংকর) নামক পশুখাদ্য উৎপন্ন করেন।

সাখারভ ও লবাশভ ব্যবহৃত আয়োডিন ও অন্যান্য পদার্থ একক জিনের মিউটেশন সৃষ্টিতে কার্যকরী হলেও অধিকতর ফলপ্রসূ পদার্থ উদ্ভাবনে দীর্ঘ সময় ব্যয়িত হয়েছিল।

বহুসংখ্যক জিনের মিউটেশন উৎপাদক পদার্থ উদ্ভাবনে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গ্রেট ব্রিটেনের সাফল্য সমকালীন। সোভিয়েত বিজ্ঞানী ইওসিফ রাপোপর্ত ও এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরতা শার্লট আউয়ারবাকের সাফল্য এক্ষেত্রে বিস্ময়কর। (শার্লট আউয়ারবাকের জন্ম জার্মানিতে।)

রাপোপর্ত গত মহাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং বিকলাঙ্গ হয়ে বাড়ি ফেরেন। যুদ্ধোত্তর বছরগুলিতে একের পর এক রাপোপর্তের নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এতে এমনসব রাসায়নিক পদার্থ উল্লিখিত ছিল যাদের ব্যবহারে নামমাত্র ড্রসোফিলাই নয়, তাদের ৫—১০ শতাংশ অবধি মিউটেশনাক্রান্ত হয়। পরবর্তীকালে তিনি অধিকতর ফলপ্রসূ উপকরণও আবিষ্কার করেন। যেমন, ১৯৬২ সালে তাঁর ব্যবহৃত নাইট্রোসোইথিলোইউরিয়া (Nytrosoethi*lourea)* পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হল। এতদ্বারা প্রকোপিত মাছিদের সন্তানেরা ৯২ শতাংশ মিউটেশনাক্রান্ত হল। বিকিরণের সাফল্যও এর তুল্য ছিল না।

জে. এম. রবসনের সঙ্গে শার্লট আউয়ারবাক ইপেরাইট জাতীয় পদার্থ ব্যবহারে ড্রসোফিলার যথেষ্ট সংখ্যক মিউটেশন আবেশনে সফল হন। কণ্ট্রোল গ্রুপের ০·২ শতাংশের তুলনায় পরীক্ষাকালে তাঁরা ২৪ শতাংশ মিউটেশন উৎপাদন করেন।

কিন্তু পর্যাপ্ত মিউটেশন উৎপাদনক্ষম আয়নক রশ্মি থাকা সত্ত্বেও রাসায়নিক মিউটাজেন সন্ধানের প্রয়োজন কী? রাসায়নিক মিউটাজেনের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এমন রাসায়নিক পদার্থের সন্ধানলাভ সম্ভব যা কেবলমাত্র আয়নক বিকিরণের প্রয়োজনীয় অংশবিশেষেরই গুণসম্পন্ন।

ইপেরাইটের মিউটাজেনিক প্রভাবের গবেষণা থেকে নানাবিধ নতুন ঔষধ আবিষ্কৃত হল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, নভোত্রম্বিকিন নামক ইপেরাইটের প্রকারটি উল্লেখ্য। এটি কোন বিষাক্ত গ্যাস নয়। নভোত্রম্বিকিন ক্যান্সারের ঔষধ এবং ম্যালিগনেণ্ট লিউকোমিয়ার চিকিৎসায় অত্যন্ত ফলপ্রসূ।

উদ্ভিদ প্রজননেও রাসায়নিক মিউটাজেনের আত্যন্তিক প্রয়োজনীয়তা এখন প্রমাণিত। কেবলমাত্র পলিপ্লয়েড প্রকার উৎপাদনেই এদের ক্ষমতা সীমিত নয়। আয়নক বিকিরণে অজস্র মিউটেশন উদ্ভূত হয়, কিন্তু এদের অধিকাংশই

জীবান্তক এবং এতে সন্ততিদের একাংশ বা সকলেই মারা যায়। স্বভাবতই ঐ মিউটেশনগুলি নির্বাচনের উপযোগী নয়। তাই স্বল্পসংখ্যক সঞ্জীবী মিউটেশনের সন্ধান ছাড়া গবেষক তখন অনন্যোপায়। পক্ষান্তরে রাসায়নিক মিউটাজেন থেকে বহুবিধ প্রকারের উদ্ভব ঘটে।

এমন অনেক মিউটাজেন (ইপেরাইটের মতো) আছে যাদের প্রভাব বহুলাংশে বিকিরণতুল্য। অন্যতর কোন কোন পদার্থে বস্তুত জীবান্তক মিউটেশনই উৎপন্ন হয় না। এদের অনেকগুলোই রাপোপর্তের আবিষ্কার, অন্যগুলো সুইডিশ বিজ্ঞানীদের অবদান। তাছাড়া বিবিধ মিউটাজেনকৃত সঞ্জীবী মিউটেশনের পরিবর্তন আপতিকভাবে বংশাণুধৃত হলেও এরা বহুবিধ। তাই যে নির্বাচকের হাতে যত বেশীসংখ্যক মিউটাজেন থাকবে দ্রুততর সাফল্যের সম্ভাবনাও তাঁর তত বেশী।

কোষ পুনর্ণবায়ন

মানুষের কল্যাণ, কৃষি ও চিকিৎসায় ভৌত ও রাসায়নিক মিউটাজেনের ব্যবহার প্রসঙ্গে আমরা বলতে ভুলে গেছি যে, সকল মিউটাজেনই জীবিত প্রাণীর পক্ষে ক্ষতিকর এবং তেজাহত হওয়াও মানুষের পক্ষে নিরাপদ নয় (অবশ্য চিকিৎসার্থে প্রযুক্ত ব্যবস্থা এর ব্যতিক্রম)।

বিকিরণের বংশাণুধৃত প্রভাব লঘুকরণ কি সম্ভব? দীর্ঘকাল বিজ্ঞানীরা প্রশ্নটি সম্পর্কে নৈরাশ্যবাদী ছিলেন। কিন্তু চল্লিশের দশকের শেষ থেকে সঞ্চিত বিস্ময়কর তথ্যাদির ফলে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে।

বিকিরণক্ষতের অতি অল্প পরিমাণ নিরাময়ই শুধু সম্ভব — দীর্ঘকাল যাবৎ প্রত্যয়টি সর্বজনস্বীকৃত ছিল। চল্লিশের দশকের শেষের দিকে জনৈক ব্যারনের গবেষণার যে ফলাফল প্রকাশিত হয়েছিল জীববিদ্যার সঙ্গে কোনক্রমেই তা সংশ্লিষ্ট ছিল না। তিনি প্রোটিনের জলীয় দ্রবণ তেজাহত করে এদের ক্ষতি পরিমাপের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি দেখলেন যে, দ্রবণে কিছু পরিমাণ গ্লুটাথিওন যোগ করলে ক্ষতির তীব্রতা আংশিক হ্রাস পায়।

নিবন্ধটি পাঠ করার সময় আমার মনে একটি চিন্তা এল: গ্লুটাথিওন কি বিকিরণের ক্ষত থেকে জীবন্ত কোষকেও রক্ষা করতে পারবে? সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত হলেও বিজ্ঞানের জন্য কয়েকটি ইঁদুর বলি দেওয়া যায়

বৈকি। আমাদের পরীক্ষাগারে গ্লুটাথিওনের অন্যতম উপকরণ সিস্টেইন তৈরির ব্যবস্থা করা হল। ইঁদুরে সিস্টেইন ইনজেকশন দেবার পর এদের উপর জীবান্তক তেজাঘাতের ফলাফলের জন্য আমরা অপেক্ষা শুরু করলাম। যা ঘটল তা অভাবিত, বিস্ময়কর। দেখা গেল, কণ্ট্রোল গ্রুপের তুলনায় সিস্টেইন দেয়া ইঁদুরের মৃত্যুহার প্রায় অর্ধেক। যে ধারণা দ্বারা আমাদের পরীক্ষাটি অনুপ্রাণিত তার স্বতঃসিদ্ধতা এখানে প্রমাণিত হল। ব্যারনের নিবন্ধ প্রকাশের পর দুনিয়া জুড়ে একই ধরনের পরীক্ষা পুনরাবৃত্ত হয়েছিল। এর প্রথম ফলাফল প্রকাশ করেছিলেন মার্কিন গবেষক — হার্ভে প্যাট।

অতঃপর এমন পরীক্ষায় অন্যতর পদার্থেরও ব্যবহার শুরু হয়। এদের কয়েকটি সিস্টেইনতুল্য ফলপ্রসূ হল। কিন্তু তেজাঘাতের পূর্বে দেয়া হলেই এগুলো কার্যকরী হত। তেজাহত প্রাণীর উপর এদের ইনজেকশন, এমন কি তেজাঘাতের কয়েক মিনিট পরে হলেও, অনেক ক্ষেত্রেই তা আরোগ্যমূলক না হয়ে বরঞ্চ মৃত্যুহারই বাড়াত। তেজাহত ইঁদুরদের মৃত্যুতে কোষাবলীর বংশানুসৃত ক্ষয়ক্ষতির ভূমিকা কী তা নির্ণয় করা সম্ভবপর ছিল না।

সেকালে থোডে ও রিডের পরীক্ষার প্রতি সকলেই সবিশেষ আকৃষ্ট হন। এই ব্রিটিশ বিজ্ঞানীদ্বয় অক্সিজেনমধ্য ও অক্সিজেনশূন্য এই উভয় অবস্থায়ই শিমের শিকড় তেজাহত করে তার গজান এবং ক্রমোসোম মিউটেশনের সংখ্যা পর্যবেক্ষণ করেন। অক্সিজেনশূন্য অবস্থায় এর প্রভাবমাত্রা দুই-তৃতীয়াংশ হ্রাস পেয়েছিল। ঘটনাটির কাল ১৯৪৭ সাল। দু'বছর পর এক্স-

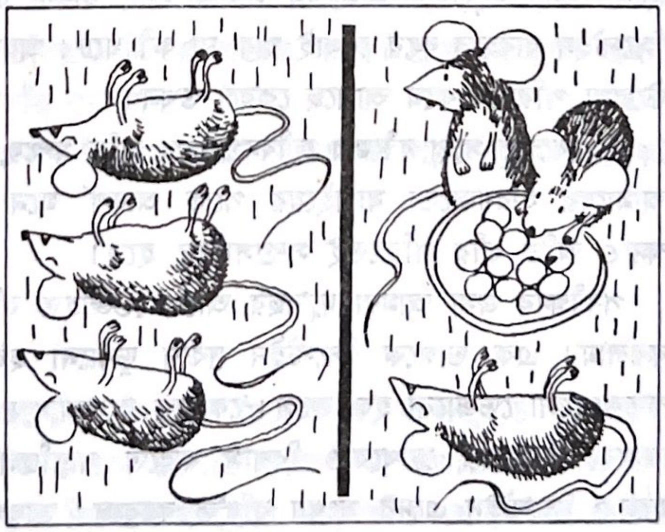

রে'র বদলে পরীক্ষাটিতে তাঁরা আল্‌ফা রশ্মি ব্যবহার করলেন। দেখা গেল, ফলাফলের উপর অক্সিজেনের প্রভাব শূন্যের কোঠায়।

তেজাহত জলের সঙ্গে থোডে ও রিডের পরীক্ষালব্ধ তথ্যাদির সাদৃশ্য অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এক্স-রেদীর্ণ জল থেকে যে পর্যাপ্ত পরিমাণ হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড উৎপন্ন হয় তা সুপরিজ্ঞাত তথ্য। অথচ আল্‌ফা রশ্মি এতে সম্পূর্ণ নিষ্ফলা। হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড একটি সক্রিয় অক্সিজেন যোজক। এতদ্দ্বারা কোষ সংস্থার ক্ষয় সম্ভবপর। এ থেকেই 'অপ্রত্যক্ষ বিকিরণ প্রভাব তত্ত্ব' উদ্ভূত হল। এর মর্মার্থ তেজাহত জলের অণু (যা দ্বারা কোষের প্রধান অংশ গঠিত) থেকে বিবিধ সক্রিয় রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয় (কেবলমাত্র হাইড্রোজেন পেরোক্সাইড নয়) এবং এরাই জৈবিক প্রভাবক।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে সিস্টেইনের প্রভাব ব্যাখ্যা সহজসাধ্য। জলভঙ্গজাত পদার্থের প্রতি প্রবলতর আকর্ষণের জন্য এরা সহজেই সিস্টেইনের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং ফলত এদের প্রতিক্রিয়া হ্রাস পায়। যেহেতু এসব সক্রিয় পদার্থের অস্তিত্বকাল মুহূর্তের ভগ্নাংশে পরিমাপ্য, তাই তেজাঘাতের পর সিস্টেইন প্রয়োগের নিষ্ক্রিয়তা তত্ত্বটির সঙ্গে স্পষ্টতই সঙ্গতিপূর্ণ।

কিন্তু কালক্রমে বহু তেজজীববিজ্ঞানী ক্রমপুঞ্জিত তথ্যের আলোতে 'অপ্রত্যক্ষ প্রভাবের' উপর আরোপিত আত্যন্তিক গুরুত্বের বিরোধিতা করেন। তাঁদের মতানুসারে সিস্টেইনের প্রভাবকে কোষের ক্ষয়মুক্তির উন্নেতা রূপেও ব্যাখ্যা করা যায়। আর তেজাঘাতের পর প্রদত্ত সিস্টেইনের নিষ্ক্রিয়তার কারণ এই যে, আঘাতের শুরুতেই ক্ষতির বিস্তার অতি দ্রুত আরোগ্যাতীত হয়ে ওঠে। সুতরাং আমাদের মাথায় সেই ধারণা এল: তেজাঘাতের পর সিস্টেইন ব্যবহার করে দেখাই যাক না কী ঘটে। অবশ্য ক্ষতসম্প্রসারণ যখন উল্লেখ্য পরিমাণ কমে আসছে কেবল তখন।

যেহেতু সুপ্ত বীজের জীবনপ্রক্রিয়া অতি মন্থর, তাই এই উপকরণটিই আমাদের ধারণামতো যাচাইয়ের পক্ষে আদর্শ মনে হল। এখানে সম্ভবত ক্ষয়ও অতি ধীর গতিতেই সম্প্রসারিত হবে।

পরীক্ষার জন্য আমরা দু'বছর আগে তেজাহত বীজকে দুই ভাগে ভাগ করলাম। এক ভাগকে সিস্টেইন দ্রবণে ডুবানো হল আর তুলনার জন্য কতকগুলো ভেজানো হল জলে। কোষের বংশাণুধৃত পরিবর্তন গণনা করে আমরা আমাদের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। দু'বছর পরে হলেও সিস্টেইন এদের সংখ্যা বর্ধিত করেছে। তারপর যখন তেজাঘাত ও

বীজ ভেজানোর সময়কে দু'বছর থেকে দু'দিনে কমিয়ে আনা হল, দেখা গেল ফল হয়েছে আরো বেশী।

এর অর্থ কী? কোষ কি বিকিরণজনিত বংশাণুধৃত ক্ষতিপূরণে সক্ষম? বিষয়টি মোটেই সরল নয়। বিজ্ঞানে যেকোন তথ্যের স্বপক্ষে একাধিক ব্যাখ্যাদান সম্ভব। দৃঢ় সমর্থক অন্যতর কিছু এখানে অপরিহার্য। তাই কোষ যে বংশানুসৃত ক্ষয়পূরণে সক্ষম এমন দুঃসাহসী সিদ্ধান্তে আস্থা স্থাপন না করে আমরা ক্রমান্বয়ে পরীক্ষা চালিয়ে গেলাম। কারণ, পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত সাধারণ ও দীর্ঘস্থায়ী ধ্যানধারণার প্রতিকূল ছিল।

তখনই তরুণ জীববিজ্ঞানী ভ্লাদিমির করোগোদিনের সঙ্গে আমার সাক্ষাত, আর তিনি তাঁর অনুরূপ সন্দেহ উদ্বেল অবস্থার কথা আমাকে বললেন। করোগোদিন বৃহদায়তন এক্স-রে মাত্রায় ইস্টকোষ তেজাহত করে এদের একাংশ তৎক্ষণাৎ এবং বাকী অংশ ২৪ ঘণ্টা ধরে কলের জলে ভিজিয়ে খাদ্যমাধ্যমে স্থাপন করেছিলেন। ফল হল বিস্ময়কর: 'ভেজানো' কোষসমূহ কণ্ট্রোল অপেক্ষা বহুগুণ অধিক কলোনি উৎপন্ন করল। সম্পূর্ণ ভিন্ন উপকরণ আর স্বতন্ত্র ধরনের পরীক্ষা সত্ত্বেও তিনিও একই সিদ্ধান্তে উত্তীর্ণ হন। তাছাড়া আমাদের পরীক্ষা সুন্দরভাবে পরস্পরের পরিপূরক হয়েছিল। বীজ ও অঙ্কুরে বংশানুসৃত পরিবর্তন লক্ষ্য করা সহজতর, কারণ এদের অনেকগুলিই সোজা অণুবীক্ষণে ধরা পড়ে। কিন্তু তেজাহত কোষে প্রজন্মপরম্পরায় কী কী পরিবর্তন ঘটে, তা লক্ষ্য করা দুঃসাধ্য। ইস্টের কথাই ধরা যাক। এর কোষের ভেতর কিছুই দেখা যায় না। এমন কি বংশাণুধৃত পরিবর্তনে তাদের মৃত্যু ঘটলেও এতে সন্দেহের অবকাশ থাকে। কিন্তু তাদের কোষের ভবিতব্য নির্ণয় অত্যন্ত সহজ। প্রয়োজন হলে এজন্য নির্ভুল বংশতালিকা তৈরি করা যায়।

তখন আমরা শেষ অবধি নিশ্চিত হলাম যে কোষের পুনর্নবায়ন বাস্তবিকই সম্ভবপর।

অপসৃত শঙ্কা

দীর্ঘদিন যাবৎ বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত ছিলেন যে, বংশাণুধৃত পরিবর্তন, বিশেষভাবে যা বিকিরণজাত তার উৎপত্তি তাৎক্ষণিক, অপরিবর্তনশীল এবং এদের সম্ভাব্য অভিব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ মানুষের সাধ্যাতীত। ধারণাটির ভ্রান্ততা

সম্পর্কে অতঃপর আমরা নিশ্চিত হলাম। অবশ্য আমাদের পরীক্ষার কোন প্রত্যক্ষ প্রয়োগিক ব্যবহার সম্ভবপর ছিল না। মটর বীজ বা ইস্টকোষে উচ্চমাত্রার তেজাঘাতে যে মিউটেশনের উদ্ভব ঘটে তার হার কমানোর কীই-বা প্রয়োজন ছিল? কিন্তু নীতিগতভাবে একটি সম্ভাবনার সত্যায়নই বিজ্ঞানের পক্ষে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং আমরা তাই করেছিলাম। পরীক্ষাগারে বংশাণুধৃত ক্ষয়ক্ষতি লাঘব করা সম্ভবপর হলে রোগশয্যায়ও এর পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা নিশ্চিত হয়ে ওঠে।

আমরা সুখী হলাম। আমাদের মতে তথ্যটি মানবতার কল্যাণে এক অবদানস্বরূপ। কিন্তু আমাদের জন্য তিক্ত হতাশা অপেক্ষমাণ ছিল। অন্যান্য বিজ্ঞানীরা অবিশ্বাসের হাসি হাসলেন। আমাদের পরীক্ষালব্ধ ফলাফল সম্পর্কে তাঁরা কোন প্রশ্ন তুললেন না, কিন্তু প্রায় প্রত্যেকেই আমাদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করলেন। অবশ্য আমাদের পরীক্ষায় আমরা বংশাণুধৃত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত যে স্বল্পসংখ্যক কোষ পেয়েছিলাম, পূর্বাহ্ন মৃত্যুও তার কারণ হতে পারে। তাছাড়া বিকিরণের ফলে কোষ বিভাগের গতিপরিবর্তন, প্রাথমিক ক্ষতের সংখ্যা, এমনি অনেক কিছুই ঘটা সম্ভবপর ছিল।

তবু আমরা যুক্তির পর যুক্তি দেখিয়ে চললাম। প্রতিপক্ষের সন্দেহ দূর করার জন্য আমরা আরো অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলাম। কিন্তু অন্যরাও ক্রমান্বয়ে নতুন আপত্তি উত্থাপন করে চললেন। বয়স্ক বিজ্ঞানীরাই আমাদের সামনে কঠিনতম প্রতিরোধ উত্তোলন করেন। কিন্তু তাঁদের মতামতের গুরুত্ব অনস্বীকার্য, কারণ এগুলিই ছিল প্রামাণ্যতর। সুতরাং ম্যাক্স প্লাঙ্কের বাণীতে তুষ্ট থাকা ছাড়া আমরা তখন অনন্যোপায়। কোয়াণ্টাম তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বখ্যাত এই পদার্থবিদ মনে করতেন যে, 'নতুন ধারণা কখনই জয়ী হয় না, আসলে যা ঘটে তা প্রাচীনপন্থীদের ক্রমাগত প্রস্থান।' আমরা অবশ্য কারও মৃত্যু কামনা করি নি। তবে উক্তিটিতে আমাদের জন্য সান্ত্বনা নিহিত ছিল।

কোষ যে প্রাথমিক বংশাণুধৃত পরিবর্তন থেকে আরোগ্য লাভ করতে পারে, এই সিদ্ধান্তে আস্থাশীল গবেষকদের সংখ্যা ইতিমধ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। একই সময়ে নেদারল্যাণ্ডে সবেল্‌স ড্রসোফিলা নিয়ে, ব্রিটেনে অ্যাল্‌পার ব্যাক্টেরিয়া নিয়ে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিম্বাল ইনফিউসোরিয়া নিয়ে গবেষণারত ছিলেন।

আমাদের ধারণা যে তৎক্ষণাৎ স্বীকৃতি লাভ করে নি তা স্বাভাবিক। এজন্য প্রয়োজন ছিল নতুন নতুন সাক্ষ্যের। বিষয়টির আত্যন্তিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য,

কারণ মিউটেশন প্রক্রিয়ার মূলগত দৃষ্টিভঙ্গিই এতে আপত্তির সম্মুখীন হয়েছিল।

অথচ আশাত্মক ফল পাবার পরই তত্ত্বীয় ও ফলিত এই উভয় দিক থেকেই এটি অত্যাকর্ষী প্রমাণিত হওয়ায় অনেকেই তখন কোষ পুনর্নবায়ন গবেষণায় শরিক হয়েছিলেন। ফলত তেজাহত কোষাবলীর বংশাণুধৃত প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতির আংশিক পূরণের সম্ভাব্যতা এবং প্রদত্ত বিকিরণ মাত্রার ফলে উদ্ভূত বংশাণুধৃত পরিবর্তন সংখ্যার ঐচ্ছিক হ্রাসবৃদ্ধির উপায় খুঁজে পাওয়া গেল। আজকাল প্রাথমিক পরিবর্তনের প্রকৃতি ও পুনর্নবায়ন প্রক্রিয়ার সমস্যাবলী বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত গবেষণার বিষয়।

এই তথ্যাবলীর প্রায়োগিক তাৎপর্য উল্লেখ্য। বংশানুসৃতির উপর বিকিরণের ক্ষতিকর প্রভাব (উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বংশানুসৃত পরিবর্তন ঘটালে তা ব্যতিক্রম হিসেবে বিবেচ্য) সম্বন্ধে আমরা এখন অবহিত। তাই প্রগতিশীল মানবসমাজ আণবিক পরীক্ষার শর্তহীন ও সম্পূর্ণ নিষেধের জন্য সংগ্রাম অব্যাহত রাখবে।

আয়নক বিকিরণ আধুনিক জীবনের এক নতুন উপসর্গ এবং একে অবহেলা করা অসম্ভব।

একদিন একদল মার্কিন বিজ্ঞানী নিম্নোল্লিখিত পরীক্ষাটি সম্পূর্ণ করেন। তাঁরা মটর-ইঞ্জিনের ধোঁয়া সংগ্রহ ও ঘনীভূত করে তা সাদা ইঁদুরের চামড়ায় লাগান। কয়েকদিন পর প্রাণীগুলি ক্যান্সার টিউমারে আক্রান্ত হয়। অতঃপর তাঁরা লস-অ্যানজেলস নগরের কিছু বাতাসের নমুনা সংগ্রহ করেন। তাঁরা একে পরিস্রাবিত করে পরিস্রুতে আটকে থাকা বর্জ্য ইঁদুরের গায়ে লাগিয়ে দেন। ফল হল অনুরূপ ভয়ংকর। যান্ত্রিক প্রগতি মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্যের জন্য একই সঙ্গে ক্রমবর্ধমান বিপদের ঝুঁকিও বয়ে আনছে। কিন্তু অদ্যাবধি মানুষকে ঘিরে থাকা অনিষ্টকর অজস্র উপকরণ সম্পর্কে আমাদের ঔদাসিন্য এক ভীতিকর বাস্তবতা। বিপদাশঙ্কা অচিরেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আয়নক বিকিরণের সব গবেষণায়ই সর্বাধিক সতর্ক নিরাপত্তার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। তাছাড়া বিকিরণ বা তেজস্ক্রিয় পদার্থের প্রতিবেশসংক্রামণ বন্ধের জন্য সবকিছুই করা হয়েছে। কিন্তু শুনুন, সড়ক দুর্ঘটনা অপেক্ষা তেজস্ক্রিয়তায় মানুষের ক্ষতি হয় অনেক কম।

কিন্তু ক্ষতির তুলনায় বিকিরণের সুফলের পরিমাণ বিপুল। ভাল ও মন্দের ভারসাম্যই মূলকথা। বিকিরণের বংশাণুধৃত ক্ষয়ক্ষতির পূরণ সংক্রান্ত

আলোচনায় আবার ফেরা যাক। আমাদের পূর্বতন বক্তব্য থেকে স্পষ্টতই ধারণা হওয়া উচিত যে, বংশাণুধৃত পরিবর্তনের সংখ্যা কমানোয় সাফল্য আর বিকিরণের শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের সম্ভাবনা পরস্পরসম্পর্কিত। তাছাড়া এতে সম্ভাব্য দুর্ঘটনার বিপদও কমে আসবে। পরীক্ষাগার থেকে ক্লিনিক অবধি এর দূরত্ব এখন আর খুব বেশী নয়। তেজাহত প্রাণী ও উদ্ভিদের আরোগ্যলাভ সংক্রান্ত পরীক্ষার ফলাফল এখন রোগীর শয্যালগ্ন।

ইতিপূর্বে কোষের বংশাণুধৃত পরিবর্তনের সংখ্যাহ্রাস প্রসঙ্গই আলোচিত হয়েছে। কিন্তু স্মরণীয়, অনেক সময় এর সংখ্যাবৃদ্ধিও লাভজনক। ক্যান্সার চিকিৎসার আনুষঙ্গিক আধুনিক একটি সমস্যার কথা আমি ভাবছি।

আয়নক রশ্মি ক্যান্সার চিকিৎসার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। তার কারণ সহজবোধ্য। ক্যান্সার কোষ অন্য কোষেরই সদৃশ। কিন্তু বংশানুসৃত বৈশিষ্ট্যের নির্দিষ্ট পরিবর্তনে এর বিভাজনবেগ নিয়ন্ত্রণাতীত হয়ে ওঠে। মানুষের দেহকোষের কোন ক্ষতি না ঘটিয়েও জীবাণু ধ্বংসের ঔষধ আবিষ্কার নীতিগতভাবে দুঃসাধ্য নয়। কিন্তু ম্যালিগন্যাণ্ট টিউমারের সমস্যাটি জটিলতর। এখানে সুস্থ কোষ অক্ষত রেখে রুগ্ণকে মেরে ফেলা প্রয়োজন। অথচ এই দুই ধরনের কোষ প্রায় অভিন্ন। ক্যান্সার কোষের দ্রুততর বিভাজনই এদের মূল পার্থক্য এবং ক্যান্সারের বিকিরণ চিকিৎসার লক্ষ্য এদিকেই।

বিকিরণের জৈবিক প্রভাবের প্রথম গবেষকরা লক্ষ্য করেন যে দ্রুত বিভক্ত কোষই বিকিরণ প্রভাবে অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মনে করা হত যে, ক্যান্সার কোষের পার্শ্বস্থ সুস্থ কোষাবলী রুগ্ণ কোষ অপেক্ষা বিকিরণে কম প্রভাবিত হয়। পরীক্ষায় অনুমানটি সত্যায়িত হল। তারপর বহু বৎসর ক্যান্সার চিকিৎসার মাত্র দুটি পদ্ধতিই চালু রইল — অস্ত্রোপচার কিংবা টিউমারের তেজাঘাত অথবা দুই-ই।

ক্যান্সার কোষে বংশাণুধৃত ক্ষয়সৃষ্টিই বিকিরণপ্রভাবের ভিত্তি। ক্যান্সার কোষে তেজাঘাতের ফলে বহুসংখ্যক ক্রমোসোম মিউটেশনের উদ্ভব ঘটে এবং কোষের মৃত্যু হয়। ক্যান্সার কোষের অধিকতর সংবেদনশীলতা এতেই প্রমাণিত। দ্রুত বিভাজনের জন্য বংশাণুধৃত ক্ষয়পূরণের প্রয়োজনীয় সময় আর ক্যান্সার কোষের থাকে না এবং কোষ বিভাজনে তা স্পষ্টতই প্রকটিত হয়।

যদিও ক্যান্সার কোষের মতো সুস্থ কোষের ক্রমোসোমও বিকিরণের ফলে প্রভাবিত হয় তবু শেষোক্তের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ অল্প। কেবলমাত্র ক্যান্সার

টিউমারই নষ্ট হবে এবং পার্শ্ববর্তী সুস্থ কোষকলার ক্ষতি হবে না, বিকিরণের এমন মাত্রা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। আসলে তা একেবারেই অসম্ভব। সমস্যাটির সমাধান দুটি পথের একটিতেই নিহিত: পার্শ্ববর্তী স্বাভাবিক কোষের সংবেদনশীলতা হ্রাস করা অথবা ক্যান্সার কোষে তা বৃদ্ধি করা। সুতরাং কেবলমাত্র কোষের বংশাণুধৃত সংস্থার ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসই নয়, প্রয়োজনমতো তা বৃদ্ধির কৌশল শিক্ষাও জরুরী। বংশাণুবিদরা এখানেও উল্লেখ্য সাফল্য অর্জন করেছেন।

কিন্তু তেজবংশাণুবিদ্যার প্রয়োগক্ষেত্র কেবলমাত্র কোষহননই নয়। এর লক্ষ্য কোষের ধ্বংস নয়, বংশাণুধৃত পরিবর্তন সৃষ্টি কিংবা অন্যতর কিছু।

মানুষের কল্যাণে

আমরা বলেছি, তেজাঘাতে উৎপন্ন বংশাণুধৃত পরিবর্তনসমূহের প্রায় সবক'টিই ক্ষতিকর। কিন্তু ক্ষতিকর পরিবর্তনের সঙ্গে দৈবাৎ অতি দুর্লভ কল্যাণকর পরিবর্তন ঘটাও সম্ভব। পূর্বোক্ত তেজাঘাতজনিত চারিত্র্যপরিবর্তন অন্য কারণে কিংবা আপাতদৃষ্টিতে কোন নির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই ঘটতে পারে। এদের প্রায় সবক'টিই ক্ষতিকর। বিবর্তনের পথে প্রকৃতি নির্দয়ভাবে ক্ষতিকর পরিবর্তনসমূহের বিলুপ্তি ঘটায় এবং স্বল্পসংখ্যক ব্যবহার্য পরিবর্তনকে শক্তিশালী ও সন্তানসন্ততিতে পুনরুৎপাদন করে।

নতুন জাতের কোন পশু বা উদ্ভিদ উৎপাদনের সময় মানুষ আরো অল্প সময়ে একই কাজ সম্পূর্ণ করে। প্রকৃতিজাত স্বল্পসংখ্যক মিউটেশনই এই কাজে ব্যবহৃত হয়। এরা সংখ্যাল্প হলেও তেজাঘাতে এদের বহুগুণ বৃদ্ধি সম্ভব।

এভাবেই তেজাঘাত পদ্ধতিতে নির্বাচনোপযোগী প্রয়োজনীয় অসংখ্য বংশানুসৃত পরিবৃত্তি সৃষ্টি করা যায়। বিজ্ঞানীদের হিসাবে তেজাঘাতে ফসলী উদ্ভিদে বংশানুসৃত পরিবৃত্তির সংখ্যা হাজার গুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। নির্বাচনের সম্ভাবনা এতে কতদূর যে সম্প্রসারিত হয় তা সহজবোধ্য।

তবু এটাও বড়কথা নয়। ক্ল্যাসিকাল নির্বাচনের প্রধান হাতিয়ার ছিল সঙ্করণ। দুই জাতের প্রয়োজনীয় গুণাবলীর সংমিশ্রণে উভয় প্রকারের মধ্যে সঙ্করণ ঘটানোই প্রকৃষ্ট পন্থা ছিল। কিন্তু সমস্যা হল উভয় জাতের নিজস্ব

জিন সংখ্যা বহু এবং সঙ্করণ ঘটালে প্রয়োজনীয় জিন সমাবন্ধন ভেঙ্গে পড়ে (মেণ্ডেলীয় পৃথকীভবন) আর সঙ্কর সন্তানরা পূর্বসূরীর তুলনায় নিম্নমানের বৈশিষ্ট্য লাভ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কোন এক জাতের গম বা বার্লির কথাই ধরা যাক — যার সব গুণই আছে, কিন্তু তা রাস্ট (ছত্রাকজাতীয় রোগ) প্রতিরোধক নয়। অথচ প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যধর অন্য কোন প্রকারের সঙ্গে সঙ্করণে এর বিনষ্টি সম্ভাবনাই সমধিক।

সঙ্করণ ছাড়াই এই উদ্দেশ্যসিদ্ধি সম্ভব। যে প্রকারবিশেষের উন্নয়ন প্রয়োজন তার বীজে তেজাঘাতক্রমে বহু মিউটেশন আবেশিত করা যায়। মূলত ক্ষতিকর হলেও হাজারে দু'-একটি মিউটেশন উদ্ভিদটিকে বংশচারিত্র্য অক্ষত রেখেও প্রত্যাশিত বৈশিষ্ট্য দান করতে পারে। তেজাঘাতের আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগে কয়েক হাজার মিউটেশন সৃষ্টি ও তা থেকে পছন্দসই নির্বাচন আজ আর দুঃসাধ্য নয়।

তেজনির্বাচন একটি তরুণতম বিজ্ঞান। কথাটি অদ্ভুত শোনাতে পারে কারণ বিকিরণের মিউটেশন উৎপাদক ক্ষমতা বিশের দশকের মাঝামাঝি আবিষ্কৃত হয়েছিল। কিন্তু অধিকাংশ মিউটেশনই ক্ষতিকর বিধায় নির্বাচনে বিকিরণ প্রয়োগ বহু বিজ্ঞানীর কাছেই তেমন আশাপ্রদ মনে হয় নি।

তেজনির্বাচনের গুরুত্ব অনুধাবনের প্রথম কৃতিত্ব সোভিয়েত বংশাণুবিদদের। ওদেসায় আ. সাপেগিন এবং খার্‌কভে ল. দেলোনে ১৯২৭-২৮ সালেই ফসলী উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। অচিরে ইভান মিচুরিন এক্স-রে মিউটেশনের প্রতি আকৃষ্ট হন। এর ফলাফল পেতে খুব বেশী দেরী হল না। ১৯৩৮ সালে দেলোনে গম ও বার্লির কয়েক শো প্রকার রেডিওমিউটেণ্টের রিপোর্ট পেশ করেন। প্রায় একই সময় আ. লুৎকভ বার্লি ও মটরের এবং ম. তের্নভ্‌স্কি তামাকের কয়েক ধরনের মিউটেণ্ট প্রকার উৎপাদন করেন — যাদের কয়েকটির আর্থিক সম্ভাবনা ছিল। চমৎকারভাবে শুরু হলেও দুর্ভাগ্যবশত শেষ অবধি পরীক্ষাগুলি দীর্ঘদিন স্থগিত রইল। এমন সব লোকের হাতে নির্বাচন কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত হল যাঁরা জিনের, বংশানুসৃতির ক্রমোসোম তত্ত্ব, বিশুদ্ধ বংশধারার গুরুত্ব, সঙ্কর বীজ, পলিপ্লয়েড প্রকার এবং স্বাভাবিকভাবেই তেজনির্বাচনের তাৎপর্য অস্বীকার করতেন। ইদানীং কাজটি এদেশে আবার শুরু হয়েছে এবং তা ব্যাপক আকারে বহু ডজন গবেষণা ইনস্টিটিউটে চলছে। খামারের প্রায় সকল প্রধান ফসলকে নিয়েই তেজনির্বাচন পরীক্ষা

চলেছে, যথা গম, ভুট্টা, তুলো, সূর্যমুখী, বাক্‌হুইট, কয়েক ধরনের শিম্ব ফসল, সব্জী, ফল, বৃক্ষ ও বাহারী উদ্ভিদ।

একটি নতুন প্রকার উৎপাদন ও একে খামারে ব্যবহারের মধ্যে ব্যবধান কয়েক বছরের। মিউটেশন আবেশনই কেবল যথেষ্ট নয়। এর সর্বোত্তমটি খুঁজে পাওয়া, সব দিক থেকে পরীক্ষা, বিভিন্ন প্রতিবেশে একে খুঁটিয়ে দেখা এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে এর সংখ্যাবৃদ্ধি করা দরকার। তেজাঘাত-উৎপন্ন গুরুত্বপূর্ণ খামারী ফসলের তালিকা নাতিদীর্ঘ নয়। উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ এতে ৫—১০ শতাংশ কিংবা কখনো আরো বেশী বৃদ্ধি পেয়েও থাকে। কিন্তু আমরা অন্যতর একটি ক্ষেত্রে এখন ফিরে যাই, যেখানে বংশাণুবিদ্যা ও নির্বাচন অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে।

১৯২৮ সালে ব্রিটিশ বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার ফ্লেমিং এক বিস্ময়কর আবিষ্কারের গৌরব অর্জন করেন। তিনি পেনিসিলিয়াম গণভুক্ত একটি ছত্রাক আবিষ্কার করেন যা স্বতঃনিঃসারিত পদার্থ দ্বারা জীবাণুনাশে সক্ষম ছিল। ছত্রাকটি যে 'পেনিসিলিন' এখন তা সর্বজনজ্ঞাত। ১৯২৮ সালে আবিষ্কৃত হলেও কেবলমাত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ই এর প্রয়োগ সম্ভবপর হয়। ফ্লেমিং আবিষ্কৃত ছত্রাকটির অতি সীমিত পরিমাণ পেনিসিলিন উৎপাদনের ক্ষমতার প্রেক্ষিতে এর বিশোধন ও ব্যবসায়িক উৎপাদন সহজসাধ্য ছিল না। প্রথম পেনিসিলিন ছিল সোনার চেয়েও দামী। এখন এটি সর্বত্র সহজলভ্য ঔষধ।

তেজবংশাণুবিদ্যার কৃৎকৌশল প্রয়োগেই পেনিসিলিন উৎপাদনের এই প্রকৌশলগত দ্রুত উন্নতি। ফ্লেমিং আবিষ্কৃত প্রথম পেনিসিলিন কেবল খাদ্যমাধ্যমের ঊর্ধ্ব স্তরেই জন্মাত এবং প্রতি ঘন সেণ্টিমিটার খাদ্যমাধ্যমে এর পেনিসিলিন উৎপাদন ক্ষমতা ছিল প্রায় দশ আন্তর্জাতিক একক। তাই একজন রোগীর প্রয়োজনীয় দশ লক্ষ একক ঔষধ তৈরিতে অন্যূন ৫০ বর্গ মিটার পরিমাণ খাদ্যমাধ্যমের ব্যবহার অপরিহার্য ছিল। শেষ অবধি এই বিস্ময়কর ছত্রাকের উন্নতিসাধন সম্ভবপর হল। পরে একে খাদ্যমাধ্যমের গভীরতর স্তরেও জন্মানো গেল এবং প্রতি ঘন সেণ্টিমিটারে উৎপন্ন হল ২৫০ একক ঔষধ। প্রচলিত নির্বাচনেই এই সাফল্য অর্জিত হয়েছিল। অতঃপর সর্বৈব চেষ্টা সত্ত্বেও ছত্রাকটির আর কোন গুণগত উন্নতি ঘটানো গেল না।

নিউ ইয়র্কের অদূরে কোল্ড স্প্রিং হারবারে বংশাণুবিদ্যার একটি ছোট পরীক্ষাগার আছে। তার পরিচালক মিলান ডেমেরেট্‌স (জাতিতে তিনি

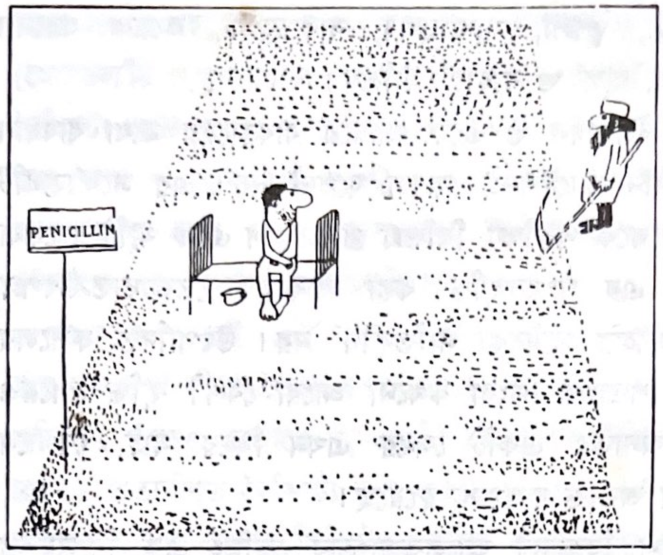

খর্ভাত)। তিনি ছত্রাকটির একটি নতুন জাতির উদ্ভব ঘটান — যার উৎপাদক ক্ষমতা মূল জাতি অপেক্ষা ২০০ শতাংশ অধিক ছিল। ডেমেরেট্স অণুজীববিজ্ঞানী কিংবা ডাক্তার ছিলেন না। কিন্তু তেজবংশাণুবিদ্যায় তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা পেনিসিলিনের ক্ষেত্রে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হয়েছিল। তিনি ড্রসোফিলার বংশাণুবিদ্যা (বিশেষভাবে তেজবংশাণুবিদ্যা) গবেষণার জন্য বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেন। আমরা জানি উপকরণ হিসেবে মাছিটি আর্থিক তাৎপর্যহীন। বহু বছর যাবৎ ছত্রাকের এই জাতিই ছিল শিল্প পর্যায়ে পেনিসিলিনের উৎপাদক। উদ্ভিদ নির্বাচনের ইতিহাসে ২০০ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধির হার নজিরবিহীন। তা স্বাভাবিক। উদ্ভিদ প্রজনকরা যে গাছগাছড়া নিয়ে কাজ করেন তা বহুশতাব্দীর নির্বাচনের ফল এবং তাদের পর্যাপ্ত উন্নয়ন কঠিনতর। তাছাড়া খামারী ফসল নির্বাচনের লক্ষ্য একাধিক চারিত্র্যে নিবদ্ধ থাকে। কিন্তু নিয়ম হিসেবে এণ্টিবায়োটিক্স উৎপাদকের লক্ষ্য একটি মাত্র চারিত্র্য।

পেনিসিলিন সম্পর্কিত গবেষণা অব্যাহত রইল। এদের সব জাতিরই একটি অপরিহার্য সাধারণ ত্রুটি ছিল। পেনিসিলিন ছাড়াও এদের দেহ থেকে একটি হলুদ রঞ্জক নিঃসারিত হত। পেনিসিলিনের শোধন ব্যয়বহুল ছিল এবং এই প্রক্রিয়ায় মূল্যবান উৎপন্নের একাংশ নষ্ট হত। অতিবেগুনী রশ্মি প্রয়োগে পেনিসিলিনের হলুদ রঞ্জকবিহীন একটি মিউটেশন উদ্ভাবিত হল, কিন্তু এর পেনিসিলিন উৎপাদক ক্ষমতা ছিল কম। এই জাতির কয়েকটি নতুন মিউটেশন সৃষ্টির ফলে অবশেষে পূর্বতন উৎপাদন সীমায় পেঁছানো ও

তা অতিক্রম করা গেল। শেষ অবধি মার্কিন নির্বাচকরা এর এমন একটি জাতি উদ্ভাবন করলেন যার উৎপাদন ক্ষমতা হল খাদ্যমাধ্যমের প্রতি বর্গ সেণ্টিমিটারে ৩,০০০ একক (ফ্লেমিং আবিষ্কৃত প্রথম জাতি থেকে উৎপন্ন ১০ একক তুলনীয়।)

একেবারে শুরু থেকেই সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা এণ্টিবায়োটিক্স উৎপাদনে নির্বাচনের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের এণ্টিবায়োটিক্স ইনস্টিটিউটে সস্‌ আলিখানিয়ানের নেতৃত্বে একটি নির্বাচনী পরীক্ষাগার গঠন করা হয়েছিল। এই পরীক্ষাগার থেকে উৎপন্ন হল 'নবসঙ্কর' নামক পেনিসিলিনটি, যার বর্গ সেণ্টিমিটার প্রতি ৫,০০০ একক উৎপাদনের ক্ষমতা ছিল। শুধু পেনিসিলিনই নয় এণ্টিবায়োটিক্স উৎপাদক সকল শ্রেণীর ছত্রাক নিয়েই আলিখানিয়ান ও তাঁর সহকর্মীরা কাজ করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ্য যে, এক্স-রে ব্যবহারক্রমে তাঁরা এল্‌বমাইসিন উৎপাদন ছয় গুণ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হন।

কেবল খামারের ফসল নির্বাচন ও এণ্টিবায়োটিক্স উৎপাদনেই তেজবংশাণুবিদ্যার উল্লেখ্য অবদান সীমিত নয়। যে সকল জীবাণু ভিটামিন (বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ B_{12} ভিটামিন), অন্যান্য মূল্যবান খাদ্যবস্তু ও শিল্পোকরণ সৃষ্টি করে সে ক্ষেত্রে এ গবেষণা অনুসৃত হয়েছে। তেজবংশাণুবিদ্যার কৃৎকৌশল প্রয়োগ রোগজীবাণু ও ভাইরাসের চারিত্র্য পরিবর্তন ও এদের 'জীবন্ত টিকা' রূপে ব্যবহার করাও সম্ভব। কৃষির পক্ষে ক্ষতিকর পোকাদের মধ্যে জীবান্তক মিউটেশনের সংক্রমণ ঘটিয়ে স্বাভাবিক প্রতিবেশে এদের মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্ত বিলুপ্তির প্রক্রিয়া শুরু করা যায়।

ইতিপূর্বে যা কিছু উল্লিখিত হয়েছে তেজবংশাণুবিদ্যার বিপুল সম্ভাবনার প্রেক্ষিতে সংখ্যাটি অতি সীমিত। এখন নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ১৯২০-এর বংশাণুবিজ্ঞানী, আমেরিকার মুলার ও স্ট্যাড্‌লার এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের নাদ্‌সন ও ফিলিপভের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাবলীর আত্যন্তিক তাৎপর্য সর্বসমক্ষে এখন প্রমাণিত। যদিও নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত মুলারই এক্ষেত্রে মুখ্য অবদানস্রষ্টা তবু স্মরণীয় যে, লেনিনগ্রাদের দু'জন কর্মী নাদ্‌সন ও ফিলিপভই বিকিরণের মিউটেশন উৎপাদক ক্ষমতার প্রথম আবিষ্কারক।

স্বপ্রজননক্ষম অণু

বংশাণুবিদ্যা ও জৈবরসায়নের দোস্তি

১৯৬১ সালে মস্কোতে পঞ্চম জৈবরসায়ন কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন এঙ্গেল্‌গার্ত, বেলোজের্‌স্কি, অপারিন, ব্রাউন্‌স্টাইন, জ্‌বার্‌স্কি, ওয়াটসন, ক্রিক, যেকব, মেজেল্‌সন, মেল্‌হার্স, শ্রাম, ফ্রাঙ্কেল-কন্‌রাত, ডটি, ডেভ্রিস, বার্টন, লেভিণ্টাল... কংগ্রেস, সভা, সম্মেলন সাধারণত নৈরাশ্যজনক, কারণ এখানে বক্তারা যা কিছু বলেন তার সবই কোন না কোন সাময়িকীর সাম্প্রতিকতম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। তবে এঁরা মস্কো কংগ্রেসে সঙ্গে এনেছিলেন বহু নতুন ও কৌতূহলোদ্দীপক তথ্যাদি। এবং প্রত্যেকের মুখে মুখে তখন এক নতুন নাম: নিরেনবার্গ।

কংগ্রেসে তাঁর রিপোর্ট শুনে বংশাণুবিদ ও জৈবরাসায়নিকেরা একযোগে আলোড়িত হন। কথাটি অদ্ভুত মনে হতে পারে। কিন্তু বংশাণুবিদ্যা ও জৈবরসায়নের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কাল এখন অবসিত।

কয়েক বছর আগেও বংশাণুবিদদের আলোচ্য বিষয় ছিল চারিত্র্য পৃথকীভবনের নিয়মাবলী, লিংকেজ, প্রকটতা এবং চারিত্র্যগঠনে জৈবরাসায়নিক বিক্রিয়াবর্জিত জিনবিনিময়। আর জৈবরাসায়নিকরা শুধু জৈবপ্রকরণের রসায়নেই ব্যাপৃত ছিলেন। জৈবরাসায়নিক সংযুতি ও প্রক্রিয়াসমূহের বংশানুসৃত শর্তাধীনতা সম্পর্কে তাঁদের বিন্দুমাত্র কৌতূহল ছিল না। বংশানুসৃতির ভৌত উপকরণ জিনের প্রতিই তখন বংশাণুবিদরা নিবদ্ধ দৃষ্টি আর জৈবরাসায়নিকদের কৌতূহল তখন কেন্দ্রিত জীবনীশক্তির বাহক প্রোটিনে।

অতঃপর ক্রমপুঞ্জিত তথ্যে এই সত্য প্রকটিত হল যে, জীবের জৈবরাসায়নিক বৈশিষ্ট্যাবলীর বংশানুসৃতি শতাব্দীকাল আগে মটরশুঁটির সংকরণ থেকে পাওয়া মেণ্ডেলীয় নিয়মাবলীরই অনুসারী। দুটি বিজ্ঞানের সমন্বয়ে অতঃপর জন্ম নিল এক নতুন বিদ্যা: জৈবরাসায়নিক বংশাণুবিদ্যা, অথচ আগে এরা ছিল সম্পূর্ণ পরস্পরবিচ্ছিন্ন। অতীতে বংশাণুবিজ্ঞানীরা একদা

পাতার আকৃতি ও চক্ষুবর্ণের ভিত্তিতে জিন মানচিত্র আঁকার চেষ্টা করতেন। বর্তমান বংশাণুবিদরা (এবং জৈবরাসায়নিকরাও) জৈবরাসায়নিক চারিত্র্যস্রষ্টা জিনের স্থাননির্ণয় শুরু করেছেন।

বংশানুসৃতির ক্রমোসোম তত্ত্বের উদ্ভবে ড্রসোফিলার ভূমিকা ছিল উল্লেখ্য। জৈবরাসায়নিক বংশাণুবিদ্যায় একই ভূমিকা ছত্রাক নিউরোস্পরার *(Neurospora)*। বাহ্যত ছত্রাকটি সাধারণ ছাতার (মোল্ড) অনুরূপ, কিন্তু চিনি, লবণ ও বায়োটিন নামক একটি ভিটামিনযুক্ত অতি সাধারণ কৃত্রিম খাদ্যমাধ্যমে এটি সহজেই জন্মে, বৃদ্ধি পায়। তেজাহত হলে অথবা রাসায়নিক মিউটাজেনের প্রভাবে নিউরোস্পরায় এমন মিউটেশন জন্মে যার ফলে সামান্যতম খাদ্যবস্তুতে আর তার পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব হয় না। এর অর্থ জীবনের অপরিহার্য কোন উপাদান সংশ্লেষের ক্ষমতা সে হারিয়ে ফেলেছে। কোন বিশেষ উপাদানের সংশ্লেষের কৌশলটি ছত্রাক 'ভুলে গেছে' এবং উৎপন্ন ত্রুটির জিনধৃত ভিত্তি কোথায় জৈবরাসায়নিক পরীক্ষা ও সংকরণে তা জানা সম্ভবপর।

এ সকল পরীক্ষা থেকে বিজ্ঞানীরা এক বিস্ময়কর সিদ্ধান্তে উপনীত হন। বিষয়টি সহজ করার জন্য আমরা নিউরোস্পরার এক ধারা পরীক্ষা উল্লেখ করছি।

ছত্রাকটির এমন বহু মিউটেশন আছে যেখানে একে বাঁধিয়ে রাখতে খাদ্যমাধ্যমে আর্জিনিন সংযোগ অপরিহার্য হয়ে ওঠে। (আর্জিনিন একটি এমিনোএসিড এবং তা বহু প্রোটিনের উপাদান।) মিউটেশনগুলির ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে জানা গেল যে, এদের কোন কোনটির ক্ষেত্রে কেবলমাত্র আর্জিনিনই প্রয়োজনীয়, আর কিছু নয়। অন্যেরা আবার কম খুঁতখুঁতে। এরা ঘনিষ্ঠতর অন্য এক উপাদান সাইট্রুলিন পেলেও তুষ্ট, তবে অন্য কিছু নয়। শেষে মিউটেশনের যে তৃতীয় প্রকারটি আবিষ্কৃত হল সেটি শুধু আর্জিনিন ও সাইট্রুলিন পেলেই তুষ্ট নয়, তার জন্য আরো একটি তৃতীয় উপাদান অর্নিথিন অপরিহার্য।

আপাতদৃষ্টিতে বিষয়টি তেমন আকর্ষী মনে হয় না। কিন্তু জৈবরাসায়নিকরা জানতেন যে, জীবন্ত কোষে সাইট্রুলিন থেকে আর্জিনিন এবং অর্নিথিন থেকে সাইট্রুলিন তৈরি হয়। এদের ক্রমবিন্যাস এরূপ: অর্নিথিন → সাইট্রুলিন → আর্জিনিন। অতঃপর এই সিদ্ধান্তে উত্তরণ স্বাভাবিক যে, প্রথম দলীয় মিউটেশনের ফলে সাইট্রুলিন থেকে আর্জিনিন, দ্বিতীয়টিতে অর্নিথিন থেকে

সাইট্রুলিন এবং তৃতীয় ক্ষেত্রে সাধারণ উপকরণ থেকে আর্নিথিন উৎপাদনে ছত্রাক ব্যর্থ হয়।

কোষের সকল জৈবরাসায়নিক বিক্রিয়াই উৎসেচক নামক জটিল প্রোটিনে নিয়ন্ত্রিত। প্রতিটি বিক্রিয়ার দায় এক-একটি নির্দিষ্ট উৎসেচকের উপর ন্যস্ত, যেমন একটি আর্নিথিনকে সাইট্রুলিনে এবং অন্যটি সাইট্রুলিনকে আর্জিনিনে রূপান্তরিত করে। তাই প্রত্যেক মিউটেশনের ফলে কোষ এক-একটি নির্দিষ্ট উৎসেচক তৈরির ক্ষমতা হারায়। এভাবেই পরীক্ষাটির ফলাফল ব্যাখ্যা সম্ভব।

কিন্তু মিউটেশন কোন একটি জিনের পরিবর্তন। সুতরাং উপরোক্ত পরীক্ষার ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা যে অনুমানে পৌঁছেন তা 'এক জিন এক উৎসেচক প্রকল্প' নামে খ্যাত। এর মর্মার্থ: এক-একটি উৎসেচক উৎপাদনই এক-একটি জিনের কাজ। বহু পরীক্ষায় অনুমানটি আজ সত্যায়িত।

এখন মূল বিষয়টির দিকে আমরা অগ্রসর হচ্ছি। যেহেতু উৎসেচকমাত্রেই প্রোটিন, তাই কোষের নির্দিষ্ট প্রোটিন অণু নির্মাণের পদ্ধতি বংশানুসৃতির রাসায়নিক প্রকৃতির অন্যতম সমস্যাবিশেষ। মস্কো কংগ্রেসে নিরেনবার্গ তাঁর রিপোর্টে সমস্যাটি সমাধানের পথনির্দেশ করেন। বংশানুসৃতির অ-আ, ক-খ আবিষ্কারের পথে এটিই প্রথম পদক্ষেপ এবং প্রোটিন গঠনের পরিকল্পনা অর্থাৎ বংশানুসৃত চারিত্র্য কীভাবে জিনে লিপিবদ্ধ হয় সেই হেঁয়ালি সমাধান তাঁরই অবদান।

বংশাণুবিদ্যার ইতিহাস ও ক্রমোন্নতির বর্ণনায় এই গবেষণার উপেক্ষা অসম্ভব। নিজ নিজ গবেষণার স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও উপরোক্ত কার্যাদির জন্য সকল বিজ্ঞানীই আজ বংশাণুবিদ্যায় আকৃষ্ট। দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি, উদ্ভিদের নতুন প্রজাতি উৎপাদন, নতুন রাসায়নিক কৃৎকৌশল এবং অন্যান্য বহু সুবিধাদির আশ্বাস উক্ত গবেষণায় নিহিত। কিন্তু এসবই ত্রিশ বছর আগে অনন্যসাধারণ রুশ বিজ্ঞানী আকাদমিশিয়ন নিকোলাই কল্‌ৎসোভ উপস্থাপিত প্রত্যয়েরই স্বীকৃতিমাত্র।

অবয়ব ও উপাদান

নিকোলাই কল্‌ৎসোভ বংশাণুবিদ্যার সমস্যাবলী বিশ্লেষণে ভৌতরাসায়নিক পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপন করেন। জীববিদ্যা ও ভৌতরাসায়নিক বিজ্ঞানসমূহের

সেই মধ্যবর্তী সীমান্তরেখাতেই গবেষণার সমৃদ্ধতম সম্ভাবনাটি তাঁর চোখে পড়ল, যদিও অঞ্চলটি তখনো সম্পূর্ণ অনাবিষ্কৃত ছিল। তরুণ কল্‌ৎসোভ একদা বিখ্যাত পদার্থবিদ অসোয়াল্ডের একটি বই পড়েছিলেন। এর কিছু বাক্যাবলী আজীবন তাঁর মনে ছিল। অসোয়াল্ড বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে অজ্ঞতার সমুদ্রে বিক্ষিপ্ত মহাদেশ ও দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন যে, ঐ খণ্ডছিন্ন ভুবনকে দৃঢ়যোজককে সংযুক্ত করাই নিসর্গীর মহত্তম আদর্শ। এই আদর্শসাধন কল্‌ৎসোভের সমগ্র জীবনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। প্রাণের বিবিধ অবয়ব ও প্রক্রিয়ার ভৌতরাসায়নিক ব্যাখ্যাদানের চেয়ে আকর্ষণীয়তর প্রকল্প আর কী আছে? কিন্তু কাজটি অসম্ভব জটিল আর সমস্যাটি উত্থাপনও ছিল প্রচলিত ধ্যানধারণার বিরোধী।

অদ্ভুত ঠেকলেও কোষতত্ত্বের ক্রমোন্নতির ইতিহাসের শুরুতে অবয়ব ও উপাদানের সংযোগ স্পষ্টতর মনে হচ্ছিল। শ্লাইডেন উদ্ভিদ কোষকে যথার্থই কোষ মনে করতেন। যে আবরণীর জন্য একে দালানের ইটের মতো দেখায় তাকেই তিনি কোষের প্রধান উপাদান মনে করেছিলেন। শ্‌ভানের মতে সম্পৃক্ত দ্রবণে উৎপন্ন কেলাসের মতোই কোষ আদি উপাদানের অধঃক্ষেপবিশেষ। এসব আদিম প্রত্যয়ের অন্তর্গত যুক্তি এক অর্থে অনস্বীকার্য: অবয়ব ও উপাদান পরস্পর অবিভাজ্য।

তারপর শুরু হল খোদ কোষের নিরীক্ষা। নিউক্লিয়াস আবিষ্কার এবং সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর উপাদানসমূহের সন্ধান ক্রমে সম্পূর্ণ হল। কোষদেহের রাসায়নিক উপকরণ থেকে পাওয়া গেল এর বিস্তৃততর ব্যাখ্যা। এতে অবশ্য বিজ্ঞানের ব্যাপক অগ্রগতিই সূচিত। কিন্তু এর ফলে অবয়ব ও উপাদান সমস্যায় ব্যাপক দ্বিভাজন ঘটল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মাক্স সুল্ট্‌সের কথা উল্লেখ্য। তাঁর তত্ত্বানুসারে প্রটোপ্লাজ্‌মই সকল প্রাণধর্মের ধারক ও বাহক এবং কোষবেষ্টনী, এমন কি নিউক্লিয়াসও সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়, বর্জ্য। চেম্বার্সের মতে সেণ্ট্রিফিউজ মাধ্যমে সাইটোপ্লাজ্‌মীয় উপকরণসমূহ আলাদা করে প্রটোপ্লাজ্‌ম নামক 'জীবন্ত পদার্থ' পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করাই সর্বোত্তম পন্থা (এবং এসব উপদেশই কার্যত তিনি অনুশীলন করতেন)। এভাবে পাওয়া নিরাকার কলোয়েড দ্রবণকেই তিনি প্রাণের ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন...

এই প্রেক্ষিতেই নিকোলাই কল্‌ৎসোভ অবয়ব ও উপাদানের প্রত্যয়কে শ্লাইডেন ও শ্‌ভানের কালের তুলনায় উচ্চতর ও নতুনতর পর্যায়ে একত্রিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯০৪ সালের মধ্যেই উপাদানসমূহের

ভৌতরাসায়নিক ধর্মের ভিত্তিতে তিনি কোষের অবয়ব ব্যাখার এক তত্ত্ব উপস্থাপিত করেন। এই তত্ত্ব ও গবেষণা, এর ক্রমান্বয় স্বীকৃতির কাহিনী অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। কিন্তু এ পথে আমরা মূল বক্তব্য থেকে ক্রমেই দূরে সরে যাব। তাই কল্ৎসোভের জীবনের দীর্ঘ, দীপ্ত অধ্যায়টি আমরা এড়িয়ে যাচ্ছি। ইউরোপের প্রধান প্রধান পরীক্ষাগারে তাঁর গবেষণা, ছাত্র থেকে রিডার হওয়া পর্যন্ত মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর অবস্থান ইত্যাদি ঘটনাবলীর বর্ণনা আমাদের পরিহার করতে হবে। তাঁর প্রতিভাদীপ্ত গবেষণাবলীর অন্তর্গত 'কোষাবয়ব সম্পর্কে অনুসন্ধান' জাতীয় মনোগ্রাফগুলি, ধনাত্মক আয়ন সম্পর্কিত শারীরবৃত্তীয় রচনাবলী, শ্বেত কণিকাক্ষয়, কৃত্রিম অপুংজনি প্রভৃতি এখানে অনুল্লিখিত থাকবে।

রাশিয়ায় অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের পর ১৯১৭ সালে পরীক্ষামূলক জীববিজ্ঞান ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হল। কল্ৎসোভের ইচ্ছা ছিল এর মূল কার্যসূচি এমন বিষয়ে কেন্দ্রিত হোক রাশিয়া তখন যেখানে পিছিয়ে পড়ে ছিল, আর তা ছিল বংশাণুবিদ্যা।

নতুন ইনস্টিটিউট দ্রুত বিশ্বখ্যাতি অর্জন করল। সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃস্থানীয় প্রবীণতর বংশাণুবিদদের অনেকেই এখানে শিক্ষাপ্রাপ্ত। এরই কার্যাদির ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাহ্নে আমেরিকার সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নও বিশ্ববংশাণুবিদ্যার নেতৃস্থানে আসীন হয়।

সে সময় ছিল ইনস্টিটিউটের সর্বোত্তম কাল এবং পরিচালক নিকোলাই কল্ৎসোভের জীবনের সেরা সুখের দিন। ঐ বছরগুলিতেই বংশাণুবিদ্যার শৈশব অতিক্রম ও বয়ঃপ্রাপ্তি, মেণ্ডেলীয় নিয়মাবলীর পুনরাবিষ্কার এবং কোষবংশাণুবিদ্যা ও বংশানুসৃতির ক্রমোসোম তত্ত্ব তখন বিকাশপ্রাপ্ত, কোষ সংস্থা ও কোষ বিভাজন সম্পর্কে মৌলিক তথ্যাদি ততদিনে সমস্ত পাঠ্যগ্রন্থের অর্ন্তভুক্ত ও ক্রমোসোমের বাহ্যিক গঠন সুপরিজ্ঞাত আর বংশানুসৃতির বস্তুগত ভিত্তি ও বংশানুসৃত উপকরণের ভৌতরাসায়নিক প্রকৃতির সমস্যাবলী তখন আলোচনার দৈনন্দিন প্রসঙ্গ।

স্বপ্রজননক্ষম অণু?

ঘটনাটির স্থান লেনিনগ্রাদ, কাল ১৯২৭ সালের ১২ই ডিসেম্বর। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রাণীবিদ, শারীরস্থান ও কলাসংস্থানবিদদের তৃতীয় কংগ্রেসের

আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অধিবেশনে কল্‌ৎসোভকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করা হল। তাঁর নির্বাচিত বিষয় ছিল 'অঙ্গসংস্থানের ভৌতরাসায়নিক ভিত্তি'। তিনি তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতায় বললেন:

> কংগ্রেসের উদ্বোধনী অধিবেশনে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ করে আমাকে যে সম্মান প্রদর্শন করেছেন সেজন্য প্রথমেই আমি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমার পক্ষে এ এক দুর্লভ সৌভাগ্য। এই অধিবেশনের পরই কংগ্রেসের কাজ শুরু হবে এবং প্রতিনিধির নিজ নিজ বিশেষ গবেষণা রিপোর্ট পেশ করার আগে এই মুহূর্তে আমরা আমাদের গবেষণার বিশেষ ক্ষেত্র থেকে একটু সরে এসে জীববিজ্ঞানের বিস্তৃততর সমস্যার দিকে বারেক তাকাতে পারি। আমি ভৌতরসায়নের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে জীববিজ্ঞানের দ্বীপপুঞ্জকে যুক্ত করার চেষ্টা করব। এই প্রচেষ্টায় মাঝে মাঝে আমার নির্মাণোপকরণ ফুরিয়ে যেতে পারে, আমাকে তখন নৌকা কিংবা প্রকৃতিদর্শনের বিমানে চড়ে জলরাশি পাড়ি দেবার অনুমতি দিতে হবে। জীববিদ্যা ও ভৌতরসায়নের সংযুক্তি সমস্যার বর্তমান বিস্তৃত ফারাকে কোন সেতুবন্ধ তৈরি করা এখনো সাধ্যাতীত...

কল্‌ৎসোভের বক্তৃতা ছিল দীর্ঘ, উদ্দীপনাকর। অজস্র তথ্যাদি সত্যায়নের জন্য এতে বহু অঙ্ক, সূত্রাবলী, মাইক্রোফোটোগ্রাফ উপস্থাপিত হয়েছিল।

শেষে তিনি প্রোটিন অণুর সংযুতি সম্পর্কে বললেন। বিষয়টি তখনো সকলের অজ্ঞাত। আজ তাঁর কোন কোন নিরীক্ষার সত্যলগ্নতা বিস্ময়কর মনে হয়। বক্তৃতায় তিনি বহুবিধ প্রোটিন অণু প্রকারের উল্লেখ করেন। তাদের সংযুতি যে এমিনোএসিড সূত্র — পলিপেপ্‌টাইড শৃঙ্খল — প্রোটিন অণুসংস্থার তাঁর এই অনুমানটি নির্ভুল ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তিনি ১৭টি বিভিন্ন এমিনোএসিডের শৃঙ্খলবিশিষ্ট হেপ্টাকাইডিকাপেপ্টাইডের *(Heptakaidecapeptide)* কথা উল্লেখ করেছিলেন।

প্রোটিন অণুর ধর্ম তার সাধারণ উপাদান এবং পারস্পরিক অংশের বিশেষ অবস্থানের উপর নির্ভরশীল। যেমন ১৭টি এমিনোএসিডের একটি শৃঙ্খলের শুধু পুনর্বিন্যাস থেকে কত রকমের অণু (যাকে আইসোমার বলা হয়) পাওয়া সম্ভব, কল্‌ৎসোভ তার হিসাব উপস্থাপিত করেন। দেখা গেল ফলাফল অবিশ্বাস্য: প্রায় এক লক্ষ কোটি।

লক্ষ কোটি সংখ্যাটি এমনিতে কল্পনাতীত। কল্‌ৎসোভ ব্যাখ্যাটি

উপস্থাপিত করলেন এভাবে: প্রতিটি এমিনোএসিডকে একটি অক্ষর হিসেবে কল্পনা করে হেপ্টাকাইডিকাপেপ্টাইডের এক লক্ষ কোটি আইসোমারের সূত্রাবলী যদি সরলতম আকারেও মুদ্রিত হয় তবে সারা দুনিয়ার সকল ছাপাখানায় প্রতি বছর ১০০ ফর্মার ৫০,০০০ খণ্ড হারে ছাপিয়ে কাজটি শেষ করতে সময় লাগবে পৃথিবীর আদিতম ভূতাত্ত্বিক যুগ জীবশূন্য আর্কিয়ান পর্ব থেকে একাল অবধি সবক'টি বছর। কল্‌ৎসোভ বর্তমান মতানুযায়ী একটি ক্ষুদ্র অণুকেই তাঁর হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। অধিকাংশ প্রোটিনেরই এমিনোএসিড সংখ্যা ডজনদেড়েক নয়, শত শত। জটিলতাটি বিজ্ঞানীদের সামনে এক বিরাট সমস্যা।

ধাতুর উপর এসিড নিক্ষিপ্ত হলে বুদ্বুদ ওঠে, তরল পদার্থ বাষ্পীভূত হয় এবং পাতলা একটি আস্তর পড়ে। এই বিক্রিয়ায় লবণ উৎপন্ন ও হাইড্রোজেন মুক্ত হয়। কিন্তু বিক্রিয়াটি অন্যভাবে ঘটে না কেন? বিজ্ঞানে এর স্বচ্ছ ও শুদ্ধ উত্তর আছে: রাসায়নিক বিক্রিয়া ন্যূনতম মুক্ত শক্তি ব্যয় করেই উৎপাদ তৈরি করে।

কিন্তু অতি সাধারণ ক্ষেত্রেই কেবল এমনটি ঘটে থাকে। সমপরিমাণ শক্তি ব্যয়ে বিভিন্ন প্রকার উৎপাদ তৈরিও সম্ভব। রাসায়নিক পদ্ধতিতে চিনি তৈরির সময় দুই প্রকার পদার্থ বা আইসোমার উৎপন্ন হয়। সমবর্তিত আলোকে প্রতিক্রিয়াগুলি ভিন্নতর পথে এবং নানা আকৃতির কেলাস উৎপাদন করে। কিন্তু জীবন্ত কোষে উৎপাদিত চিনিতে শুধু একটিমাত্র আইসোমারই থাকে। জীবন্ত কোষে প্রোটিনজাতীয় যে উৎসেচক থাকে তাদেরই প্রভাবে বিক্রিয়াটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে চালিত হয়।

তাহলে প্রোটিনের জটিল অণুরাশির সংশ্লেষ কীভাবে ঘটে? উত্তরটি সহজ নয়। তাদের সংযুতি কেবলমাত্র শক্তিশর্তে নির্ধারিত হলে উৎপন্ন অণুর প্রকারে বিশৃংখলা ঘটত। পৃথিবীতে তখন দুটি সদৃশ অণুর খোঁজ মিলত না। উৎসেচক থেকে কি এতে কোন সাহায্যলাভ সম্ভব? কিন্তু তাহলে কোষে প্রতিটি উৎসেচক (যা নিজেও প্রোটিন) তৈরির জন্য আরও একটি উৎসেচক প্রয়োজন হত এবং এর শেষ মিলত না। অতঃপর জীবন্ত কোষে অণুসংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি পেত এবং তা স্পষ্টতই অযৌক্তিক।

তাহলে সমস্যাটির সমাধান কি? বিষয়টি সহজলক্ষ্য যে, জীবনরহস্যের যবনিকা উত্তোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিধায় এর সমাধান দুরূহ। প্রকৃতি তার মূল্যবান রহস্যাবলী অবগোপনে অতি তৎপর। নিকোলাই কল্‌ৎসোভ

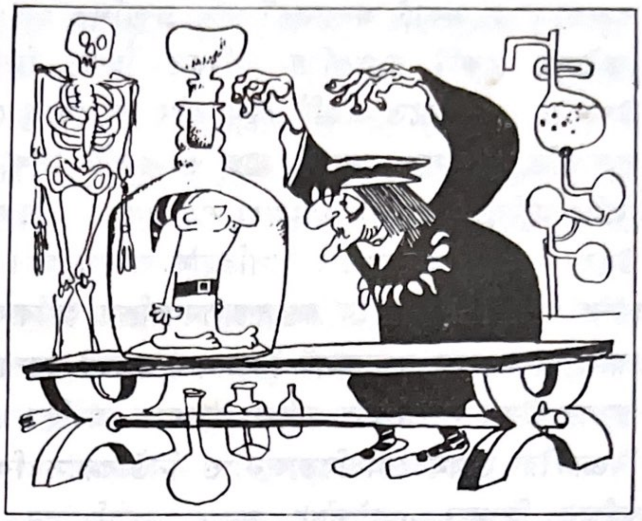

এমতাবস্থায় এক অসাধারণ দুঃসাহসী প্রকল্প উপস্থাপিত করলেন। বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রত্যয়টির উৎস সন্ধানে আমরা ৩০০ বছর পেছনে ফিরে যাব।

প্রাচীনেরা প্রাণের স্বতঃজননে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁরা ভাবতেন মাছি জন্মে পচা মাংস থেকে আর নেংটি নোংরা কাপড় থেকে। বাইবেলে লিখিত আছে যে, মৌমাছিরা মৃত সিংহের অন্ত্রজাত। আলকেমিয়ালরা বলতেন, তাঁরা কৃত্রিমভাবে ছোট মানুষ — হোমুন্‌কিউলাস — তৈরি করতে পারেন। আরিস্টোটলও স্বতঃপ্রজননে বিশ্বাসী ছিলেন।

স্বতঃজনন তত্ত্বের ভূমিচ্যুতি শুরু হয় মাত্র সপ্তদশ শতক থেকে। প্রখ্যাত পদার্থবিদ তরিচেল্লির বন্ধু ফ্লরেন্সবাসী চিকিৎসক ফ্রান্সিস্কো রেডি পচা মাংস থেকে মাছি জন্মানোর সুপ্রাচীন বিশ্বাসে প্রথম সন্দেহ প্রকাশ করেন। বিষয়টির যাথার্থ্য সন্ধানে তাঁর প্রচেষ্টা এখন স্বাভাবিক মনে হলেও সেকালে তা অপ্রত্যাশিত ছিল। তিনি দেখলেন, মাছির সংস্পর্শহীন মাংসে 'ক্রিমি' জন্মে না। মাংসের মাছি সম্পর্কে তাঁর নিরীক্ষাটি ১৬৬৮ সালে প্রকাশিত হয় এবং অতঃপরই তাঁর চিরঅম্লান বিশ্বখ্যাতি। *Omne vivum ex vivo* — প্রাণীই সকল প্রাণীর উৎস! — এই সংক্ষিপ্ত লেটিন বাক্যাংশেই তিনি তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেন। যথা সময়ে তাঁর আপ্তবাক্যটি সবর্জনীন স্বীকৃতি লাভ করল। পরে পাস্তুর প্রত্যয়টিকে অদৃশ্য জীবাণু জগতে সম্প্রসারিত করেন। রেডির আপ্তবাক্য অনুসারে প্রাণী জড় পদার্থ থেকে উদ্ভূত হয় না। কিন্তু তাহলে জীবন্ত প্রাণী কীভাবে উদ্ভূত?

যে সময় রেডি বেঁচে ছিলেন, গবেষণা করেছিলেন তখন 'প্রাণী প্রজন্মাবলী

প্রসঙ্গে’ নামে একটি অত্যাকর্ষী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির প্রচ্ছদে বজ্রদেব জিউসের একটি রূপকচিত্র অঙ্কিত ছিল: জিউস সেখানে সিংহাসনে উপবিষ্ট, তাঁর হাতে একটি ডিম এবং তা থেকে বেরিয়ে আসছে মাকড়শা, প্রজাপতি, সরীসৃপ, পাখী, মাছ ও একটি শিশু। ডিমটির উপর একটি লিপি মুদ্রিত: *Omne vivum ex ovo* — ডিম থেকেই সকল জীবনের উদ্ভব! — রেডি সূত্রের এক অপরিহার্য অনুপূরক। গ্রন্থটির লেখক উইলিয়াম হার্ভে। তিনিই ইতিপূর্বে রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়া আবিষ্কার ও বর্ণনা করেছিলেন। রেডি ও হার্ভের রচনাবলী বিজ্ঞানভাণ্ডারের রত্নস্বরূপ এবং বিজ্ঞানীমাত্রেই প্রাণের উদ্ভব সম্পর্কিত তাঁদের মতামত অবহিত। আর বিগত শতাব্দীতে বিজ্ঞানীরা প্রথম কোষবিভাজন ও নিউক্লিয়াস বিভাজন আবিষ্কারের পর তাঁদের সিদ্ধান্ত একইভাবে প্রকাশ করেছিলেন: *Omnis cellula ex cellula* — কোষ থেকেই সকল কোষ এবং *Omnis nucleus ex nucleo* — নিউক্লিয়াস থেকেই সকল নিউক্লিয়াস।

কল্‌ৎসোভির চিন্তা যেকোন প্রোটিনকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয় নি, এর লক্ষ্য ছিল কোষোৎপন্ন প্রয়োজনীয় প্রোটিন। শুধু জীববিদ্যাই নয়, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন থেকেও তিনি তথ্যাদি আহরণ করেন এবং যাকিছু কৃৎকৌশল তাঁর মনে ছিল তা উজাড় করে দিয়ে প্রতিবার একই সিদ্ধান্তে পৌঁছন: অসম্ভব!

প্রক্রিয়াটি যদি অসম্ভবই হয় তবে আমাদের গ্রহে জীবনের অস্তিত্ব ও বিকাশ কীভাবে ঘটল? জীব কোথা থেকেই-বা তাদের প্রয়োজনীয় প্রোটিন পেয়ে থাকে? এ সূত্র থেকেই কল্‌ৎসোভ একমাত্র সম্ভাব্য ও শুদ্ধ সিদ্ধান্তে পৌঁছন। অবাস্তব নির্বাচন পরিহারের জন্য জটিল অণু নির্মাণে বিদ্যমান অণুর ছাঁচ অনুসৃতিই অবশ্যম্ভাবী পন্থা। কল্‌ৎসোভ একে কেলাসন প্রক্রিয়ার সঙ্গে তুলনা করেন। যেভাবে সাধারণ লবণদ্রবণে বিসরিত সোডিয়াম ও ক্লোরাইড আয়ন বর্ধমান একটি কেলাসের ছাঁচ অনুযায়ী সমাবন্দী হয়, বিদ্যমান প্রোটিন অণুতে প্রতিযঙ্গী এমিনোএসিড যেভাবে বিন্যস্ত থাকে, তেমনি অন্যান্য এমিনোএসিডও তাদের সংযোগবিন্দুর ‘প্রবণতা’ অনুসারে একই বিন্যাসের অনুবর্তী হয়। অবশেষে সমাধান মিলল! যদিও এর শুদ্ধতা তখনও পরীক্ষিত হয় নি তবু রহস্যময় প্রক্রিয়ার এই ছিল প্রথমতম ব্যাখ্যা।

রিপোর্টের শেষে কল্‌ৎসোভ সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যশীল নতুন একটি সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করলেন:

'আত্মীকরণ যদি সত্যিই মন্দীভূত হয়ে কেলাসনে পর্যবসিত হয়, তবে স্বীকার্য যে, প্রোটিন অণুরা আত্যন্তিক তাৎপর্যশীল গুণগত বৈশিষ্ট্যে জীবের অংশভাগী — যে বৈশিষ্ট্য অদ্যাবধি প্রাণীর প্রকট চারিত্র্যরূপে চিহ্নিত। প্রাণী যে কেবল অন্য প্রাণীর ডিম্বকজাত এ সত্যপ্রতিষ্ঠায় বহু কাল ব্যয়িত হয়েছে: *Omne vivum ex ovo, Omnis cellula ex cellula, Omnis nucleus ex nucleo.*

'আমরা এসঙ্গে আরো একটি আপ্তবাক্য যোগ করতে পারি: প্রতিটি প্রোটিন অণু প্রকৃতিমধ্যে অন্যতর সদৃশ প্রোটিন অণু থেকে উদ্ভূত। দ্রবণে প্রক্ষিপ্ত এমিনোএসিড ও অনুচ্ছিন্ন প্রোটিন খণ্ডগুলি এরই চারিদিকে কেলাসিত হয়: *Omnis molecula ex molecula* — অণু থেকে সকল অণু।

'এর অর্থ প্রজনন কেবলমাত্র জীবেরই অনন্য বৈশিষ্ট্য নয়, প্রকৃতির সকল জটিল ভেক্টরিয়াল তন্ত্রের উৎপাদন প্রকরণও সম্ভবত এরই অনুসারী।'

স্বপ্রজননক্ষম অণু!.. খুবই অসম্ভব শোনায়, তাই না? আর তাই তখন খুব কম লোকই তাঁর সঙ্গে একমত হয়েছিলেন। কিন্তু প্রকল্পটি যতই মত্ত মনে হোক এতে জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর ছিল এবং অন্যতর জবাব বিজ্ঞানীদের জানা ছিল না। তাই তাঁরা অনেক পরীক্ষা মাধ্যমে কল্‌ৎসোভের প্রকল্পটি সমর্থনের প্রয়াস পেয়েছিলেন।

সন্দেহজনক নিউক্লিক এসিড

কল্‌ৎসোভের প্রকল্পের প্রমাণ সহজসাধ্য ছিল না, কারণ প্রোটিন রসায়নের তখনো ভ্রূণাবস্থা। কিন্তু সংগৃহীত তথ্যাদির স্বল্পতা সত্ত্বেও এর সমর্থনের আভাস মিলল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, জাইমোজেনের উৎসেচকে রূপান্তর উল্লেখ্য। উৎসেচক জৈবিকভাবে সক্রিয় প্রোটিনজাতীয় পদার্থ, আর জাইমোজেন তার আদিরূপ অর্থাৎ উৎস।

অন্যতম হজমী উৎসেচক ট্রিপ্‌সিন তৈরির তথ্যাবলীও অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। ট্রিপ্‌সিনোজেন এর উৎস। অথচ ট্রিপ্‌সিনের সান্নিধ্যেই নিষ্ক্রিয় ট্রিপ্‌সিনোজেনের সক্রিয় ট্রিপ্‌সিনে রূপান্তরণ ঘটে। কিংবা বলা যায়, ট্রিপ্‌সিনোজেন থেকে ট্রিপ্‌সিন নিজ প্রতিরূপ অনুযায়ী নতুন অণু নির্মাণ করছে।

কিন্তু বিশেষ পরীক্ষার ফলে দেখা গেল যে ঘটনাটি অন্যরূপ। বিভিন্ন প্রাণীর ট্রিপ্‌সিন পরস্পর থেকে কিছুটা পৃথক। গোরু, শূকর ও মেষের ট্রিপ্‌সিন পরস্পর থেকে আলাদা। গোরুর ট্রিপ্‌সিন এবং শূকরের ট্রিপ্‌সিনোজেন একই টেস্ট-টিউবে রাখা হলে ট্রিপসিনোজেন ট্রিপ্‌সিনে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গেল, উৎপন্ন ট্রিপ্‌সিনটি আসলে... শূকরের। এর অর্থ গোরুর ট্রিপ্‌সিন নিজ বৈশিষ্ট্য সংক্রমিত করে নি এবং শূকরের ট্রিপ্‌সিন এমন এক ছাঁচ থেকে উৎপন্ন হয়েছে পরীক্ষার সময় যার কোন অস্তিত্ব ছিল না। প্রথমে বিষয়টি ব্যাখ্যাতীত মনে হয়েছিল। অবশ্য শেষে অণুর আয়তন নির্ণীত হলে দেখা গেল, ট্রিপ্‌সিন অপেক্ষা ট্রিপসিনোজেনের অণু অনেক বড় আর ট্রিপ্‌সিনোজেন থেকে ট্রিপ্‌সিন তৈরি হয় নি, হয়েছে এর আংশিক ভাঙ্গনের ফলে।

প্রক্রিয়াটির সবকিছু আমরা এখন জানি। উৎসেচকের অণু বিরাট হলেও তার কার্যকারিতা অতি ‘সক্রিয় পুঞ্জের’ উপর নির্ভরশীল। অণুর এক প্রান্তে সক্রিয় পুঞ্জের অবস্থান (তাই পুঞ্জ যে বস্তুকে প্রভাবিত করে তার সঙ্গে সে মিলিত হতে পারে না) এবং তা অন্য প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত হলে অণুটি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। যদি অণুটির নির্দিষ্ট অংশবিশেষ ছিন্ন হয়, তবে তা ঋজুতাপ্রাপ্ত হবে, সক্রিয় পুঞ্জের বিমুক্তি ঘটবে এবং নিষ্ক্রিয় ট্রিপ্‌সিনোজেন সক্রিয় ট্রিপ্‌সিনে রূপান্তরিত হবে। সুতরাং কল্‌ৎসোভ প্রকল্পের সঙ্গে এর সম্পর্কহীনতা অতঃপর স্পষ্টতই প্রমাণিত হল।

অন্যতর কিছু কিছু দৃষ্টান্ত থেকে কল্‌ৎসোভের স্বপ্রজননক্ষম অনুর প্রকল্পটি সত্যাখ্যাত বলে অনুমিত হয়েছিল। কিন্তু ঘনিষ্ঠতর গবেষণায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই অনুমানটি ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়।

আমরা যাকিছু বলেছি তা প্রোটিন সম্পর্কে প্রযোজ্য। এর গুরুত্ব অত্যধিক। আণবিক সংযুতিতে যে বংশানুসৃত তথ্যাদি সঞ্চিত থাকার কথা তার পরিমাণ বিপুল। সুতরাং বহুবিধ অণুধর পদার্থের পক্ষেই শুধু তা পরিবহণ সম্ভবপর। তাদের মধ্যেই ‘স্বপ্রজননক্ষম’ অণুর সন্ধান যুক্তিসিদ্ধ। জ্ঞাত সকল পদার্থের মধ্যে একমাত্র প্রোটিনই এই প্রয়োজনীয় বৈচিত্র্যের ধারক। উক্ত বৈশিষ্ট্যে প্রোটিন সত্যিই অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

যা হোক চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি গুরুত্বপূর্ণ জীবতাত্ত্বিক ভূমিকাসীন এক নতুন প্রতিদ্বন্দ্বীর সাক্ষাত মিলল। সে নিউক্লিক এসিড। বহুকাল আগে থেকেই তা জ্ঞাত ছিল। ১৮৬৮ সাল। ফ্রিড্‌রিখ মিশার নামে এক তরুণ

রাসায়নিক সবেমাত্র টিউবিঙ্গেনের বিখ্যাত হপে-জাইলার পরীক্ষাগারে গবেষক জীবন শুরু করেছেন। ময়লা ব্যান্ডেজ পরীক্ষাকালে তিনি পুঁজকোষের নিউক্লিয়াসে রাসায়নিকদের অজ্ঞাত এক পদার্থের সন্ধান পান। নিউক্লিয়াস উদ্ভূত বলেই এর নামকরণ হল 'নিউক্লিইন'।

পরেও অন্যান্য কোষের নিউক্লিয়াস থেকে নিউক্লিইন পৃথকীকরণে তিনি সফল হন। পদার্থটির নিউক্লীয় ভিত্তি সম্পর্কে অতঃপর আর সন্দেহ ছিল না। ১৮৭২ সালে নিউক্লিইনকে অম্ল ও ক্ষারের পৃথকীকরণে তিনি সফল হন। এর অম্লাংশ এখন নিউক্লিক এসিড নামে জ্ঞাত। ক্ষারকে মিশারই প্রোটামিন নামে সনাক্ত করেছিলেন।

কোষ নিউক্লিয়াসে নিউক্লিক এসিড আবিষ্কারের বহু বছর পরও তা রাসায়নিকদের কাছে সিণ্ডারেলার মতোই অনাদৃত রইল। খুব কম ব্যক্তিই এতে উৎসাহী হন। অবশ্য নিউক্লিক এসিড সম্পর্কে তৎকালীন জ্ঞান পর্যাপ্ত কৌতূহল সৃষ্টির অনুকূল ছিল না। তখন মনে করা হত যে, এর সংযুতি ক্ষুদ্রায়তন (প্রোটিনের তুলনায়) এবং তা সদৃশ অণুসমবায়ে গঠিত। অধিকাংশ বিজ্ঞানীই একে সহযোগীর ভূমিকা দান করেছিলেন। তাঁরা মনে করতেন নিউক্লিক এসিডের আবরণী ক্রমোসোমকে ক্ষতিকর বাহ্য প্রভাব থেকে রক্ষা করে। কল্‌ৎসোভও এই মতানুসারী ছিলেন।

অধিকতর গুরুত্বসম্পন্ন প্রক্রিয়ায় এর অংশগ্রহণের প্রমাণ সংগৃহীত হয়েছিল ধীরে ধীরে। যুদ্ধের আগে বেলজিয়মের জাঁ ব্রাশে এবং সুইডেনের ক্যাস্পারসন স্বতন্ত্র গবেষণায় লক্ষ্য করেন যে, কোষের নিউক্লিক এসিডের পরিমাণের উপরই প্রোটিন সংশ্লেষের তীব্রতা নির্ভরশীল। প্রোটিনের সংশ্লেষে নিউক্লিক এসিডের ভূমিকা সম্পর্কে ক্রমে তাঁরা নিঃসন্দেহ হন। কিন্তু খুব কম ব্যক্তিই তাঁদের সঙ্গে একমত হন।

ক্রমোসোম বেষ্টনী ছাড়াও নিউক্লিক এসিড যে অন্যতর গুরুত্বপূর্ণ কাজের অংশভাগী ১৯৪৪ সালের পর কিছুসংখ্যক গবেষণার ফলেই বিজ্ঞানীরা এতে বিশ্বাস স্থাপন করেন।

যে নিউমোকক্কাই নিউমোনিয়ার বীজাণু তা একাধিক প্রকার: আবরণীযুক্ত ও আবরণীহীন। কঠিন খাদ্যমাধ্যমে উৎপাদিত হলে এরা 'অমসৃণ' কলোনি তৈরি করে। অথচ আবরণীযুক্ত সাধারণ নিউমোকক্কাইদের কলোনি পরিচ্ছন্ন, 'মসৃণ'। এই চারিত্র্যগুলি বংশানুসৃত। মসৃণ ও অমসৃণ জাতির সন্ততিরা সর্বদাই যথানিয়মে মসৃণ এবং অমসৃণ হয়ে থাকে।

১৯২৮ সালে একদল বিজ্ঞানী অদৃষ্টপূর্ব বিস্ময়কর কিছু ফলাফল পান। তাঁরা সাধারণ 'মসৃণ' নিউমোকক্কাইদের তাতিয়ে মেরে তা জীবন্ত 'অমসৃণ' নিউমোকক্কাইদের সঙ্গে মিশিয়ে দেন। অতঃপর খাদ্যমাধ্যমে জীবন্ত 'মসৃণ' ব্যাক্টেরিয়া জন্মাল। প্রযুক্ত 'মসৃণ' ব্যাক্টেরিয়ার সবক'টিই যে মারা গিয়েছিল এতে কোনই সন্দেহ ছিল না। অত্যন্ত সতর্কভাবে এবং বার বার তা দেখা হয়েছিল। সুতরাং বিকল্পদুটির একটি অবশ্যম্ভাবী: হয় মৃত 'মসৃণ' ব্যাক্টেরিয়ারা জীবন্ত 'অমসৃণ' ব্যাক্টেরিয়াদের সংসর্গে সঞ্জীবিত হয়েছে অথবা ততোধিক বিস্ময়কর 'অমসৃণরা' মৃত 'মসৃণদের' কাছ থেকে নিজেদের স্থায়ী আবরণী তৈরির ক্ষমতা অর্জন করেছে। রূপান্তরিত নিউমোকক্কাইদের সন্ততিরা সকলেই জন্মাল 'মসৃণ' হয়ে।

১৯৩১ সালে মৃত ব্যাক্টেরিয়ার বদলে কোষহীন নির্যাস ব্যবহার করে একই ফল পাওয়া গেল। 'অমসৃণ' ব্যাক্টেরিয়াযুক্ত খাদ্যমাধ্যমেও 'মসৃণ' ব্যাক্টেরিয়ার নির্যাস যোগ করে একই রূপান্তর ঘটানো সম্ভব হল। সুতরাং দেখা গেল, ব্যাক্টেরিয়ায় এমন বিস্ময়কর উপাদানের (যা পি-টি-এফ অর্থাৎ নিউমোকক্কাই ট্রান্সফর্মেশন ফ্যাক্টর নামে চিহ্নিত হয়েছিল) অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী, যা অন্য ব্যাক্টেরিয়ার বংশানুসৃত চারিত্র্যের নির্দিষ্ট লক্ষ্যমুখী পরিবর্তনসক্ষম। কী এই উপাদান?

দীর্ঘকাল বিজ্ঞানীরা এর উত্তরদানে ব্যর্থ হন। কিন্তু ১৯৪৪ সালে মার্কিন বিজ্ঞানী অসোয়াল্ড অ্যাভেরি এবং তাঁর সহকর্মীরা রহস্যময় পি-টি-এফ পৃথকীকরণে সাফল্য লাভ করেন। দীর্ঘ ও জটিল পৃথকীকরণ ও বিশুদ্ধীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁরা শেষে সমগ্র নির্যাসের সমান ফলপ্রসূ একটি নির্দিষ্ট বস্তুর সন্ধান পেলেন। দেখা গেল তা নিউক্লিক এসিড!

সঞ্চীয়মান প্রমাণপুঞ্জ

অ্যাভেরির চিত্তাকর্ষক আবিষ্কারের প্রেক্ষিতে অনেকেই নিউক্লিক এসিড সম্পর্কে গুরুত্ব সহকারে বিচার-বিবেচনার প্রয়াস পান। অনেক গবেষকের আবিষ্কারেই একই তথ্যাদি পুনরাবৃত্ত হয়। আমি শুধু গবেষণাটির দুটি ধারা উল্লেখ করব।

এর একটি ব্যাক্টেরিওফেজ তথা ক্ষুদ্রতম পরজীবী ব্যাক্টেরীয় ভাইরাস প্রজননের সঙ্গে যুক্ত। সাধারণ অণুবীক্ষণে ওদের দেখা যায় না। এজন্য প্রয়োজন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের। ব্যাক্টেরিওফেজ বা ফেজের গড়ন অত্যন্ত সরল: কুণ্ডলীভূত নিউক্লিক এ্যাসিডের একটি লম্বা সুতা এবং এর চারদিকে প্রোটিনের বেষ্টনী। ব্যাক্টেরিয়া আক্রমণের পক্ষে ফেজের একটি কণাই যথেষ্ট। অতঃপর যা ঘটে তা সত্যিকার নাটকীয়। আধ ঘণ্টা কিংবা অনুরূপ সময়ে ব্যাক্টেরিয়ার মৃত্যু ঘটে, আবরণী বিদীর্ণ হয় এবং পার্শ্বস্থ খাদ্যমাধ্যমে প্রায় শ'খানেক নতুন, পূর্ণদেহী ফেজ ছড়িয়ে পড়ে।

প্রক্রিয়াটি বহু বিজ্ঞানীর ঔৎসুক্য আকর্ষণ করল। সঙ্গত কারণেই তাঁরা আশা করেছিলেন, জীবনরহস্যের কিছু মূল সূত্রের সন্ধানলাভে ব্যাক্টেরিওফেজ গবেষণা তাঁদের সহায়ক হবে। সকল জীবের ক্ষেত্রেই প্রকৃতির নিয়ম অভিন্ন এবং সরলতম উপকরণেই তার নিরীক্ষা সহজতর (মৃত ও জীবিতের সীমান্তরেখায় অবস্থিত ভাইরাস ও ফেজ এই কণিকাদুটি অপেক্ষা সরলতর আর কী হতে পারে?)। পক্ষান্তরে, ফেজের বংশবৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে। একদিনের পরিসরে ব্যাক্টেরিওফেজে যা দেখা যায় হাতির ক্ষেত্রে সেজন্য প্রয়োজন হয় কয়েক শতাব্দীর।

ব্যাক্টেরিয়ার এই সংক্রমণ প্রক্রিয়ার বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্য কী জানা প্রয়োজন? সমগ্র ফেজ নাকি তার অংশমাত্র যা ব্যাক্টেরিয়ার দেহ ভেদ করে? সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য ফেজের কোন্ উপাদান অপরিহার্য? অনেকের মতো

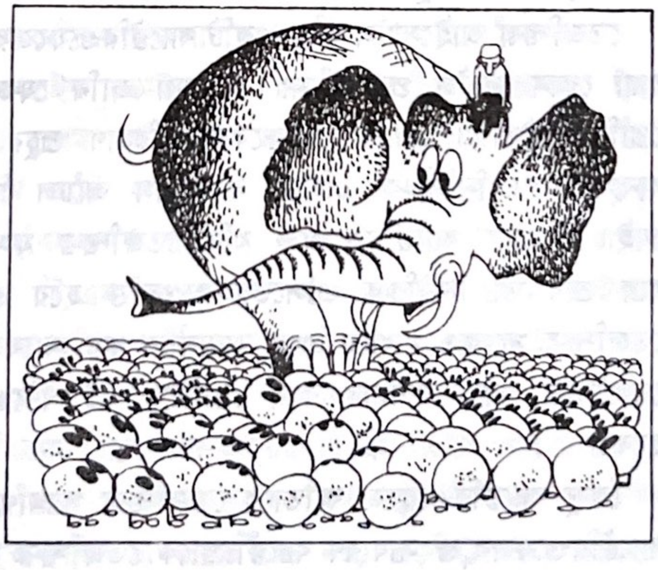

দুজন মার্কিনী — হার্শি ও চেইজ হেঁয়ালিটি সমাধানের চেষ্টা শুরু করেন।

দেখা গেল তা মোটেই সহজ নয়। কারণ, ব্যাক্টেরীয় পরজীবী, তদুপরি এদের অংশগুলির খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণও নাচার। কল্‌ৎসোভের (মেণ্ডেলের কথা না বলাই ভাল) কালে সমস্যাটির সমাধান দুঃসাধ্য ছিল। কিন্তু একালে জীববিদদের পক্ষে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সাহায্য সহজলভ্য। হার্শি ও চেইজ পেলেন পদার্থবিদ্যার আনুকূল্য।

সকল রাসায়নিক পদার্থেরই একাধিক আইসোটপ থাকে। একই পরমাণুসংখ্যক এসব আইসোটপের রাসায়নিক ধর্ম এক কিন্তু ভৌতধর্ম আলাদা। পদার্থবিদরা এখন যেকোন পদার্থের কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় আইসোটপ উৎপাদন করতে পারেন। এসব পরমাণু থেকে তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকীর্ণ হয় এবং যেকোন আধুনিক গবেষণাগারে সহজলভ্য বিশেষ যন্ত্র দ্বারা তা পরিমাপ্য।

যেহেতু কোন পদার্থের আইসোটপ স্বল্পপরিমাণ রেডিও-আইসোটপের সমধর্মী, তাই পদার্থের সাধারণ প্রকারে যুক্ত হলে তা সমুদয় পদার্থেরই ধর্মের অধিকারী, কিন্তু তা থেকে অনুক্ষণ তেজস্ক্রিয় সংকেত নির্গত হয়। ফলত, এর অবস্থান নির্ণয় ও সমগ্র পদার্থে কী ঘটছে তা জানা সম্ভব হয়। আধুনিক বিজ্ঞানে এই তেজস্ক্রিয় বা ‘চিহ্নিত’ পরমাণুর গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা যে হেঁয়ালির কথা আলোচনা করছি তার রহস্যোদ্ধারে এই ‘চিহ্নিত’ পরমাণুর উল্লেখ্য ভূমিকা ছিল।

তেজস্ক্রিয় আইসোটপ দ্বারা একটি ব্যাক্টেরিওফেজের বিভিন্ন অংশ ‘চিহ্নিত’ করা কোন জটিল প্রকল্প নয়। আমরা জানি ফেজ নিউক্লিক এসিড ও প্রোটিনে তৈরি। প্রোটিনে গন্ধকের পরিমাণ প্রচুর এবং ফসফরাস প্রায় অনুপস্থিত। নিউক্লিক এসিডে ফসফরাস অঢেল কিন্তু গন্ধক একেবারেই নেই। সুতরাং ব্যাক্টেরিওফেজে যদি তেজস্ক্রিয় ফসফরাস প্রবেশ করানো যায় তবে তা নিউক্লিক এসিডের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তা থেকে পাওয়া তেজস্ক্রিয় সংকেত মাধ্যমে একে অনুসরণ করা যাবে। ঠিক একই পদ্ধতিতে তেজস্ক্রিয় গন্ধক ব্যবহার করে প্রোটিনে কী ঘটছে তাও জানা সম্ভবপর হবে।

কিন্তু ব্যাক্টেরিওফেজে কীভাবে তেজস্ক্রিয় পরমাণু প্রবেশ করানো যায়? ব্যাক্টেরিওফেজযুক্ত সাধারণ ব্যাক্টেরিয়াকে তেজস্ক্রিয় ফসফরাস ও তেজস্ক্রিয়

গন্ধকসমৃদ্ধ খাদ্যমাধ্যমে বংশবৃদ্ধির সুযোগ দেওয়া হল। ফলত বহুসংখ্যক চিহ্নিত পরমাণুতে তারা নিজেদের বোঝাই করল। অতঃপর তন্মধ্যে ব্যাক্টেরিওফেজের সংক্রমণ ঘটানো হল। এভাবে 'চিহ্নিত' ব্যাক্টেরিয়া থেকে পাওয়া ব্যাক্টেরিওফেজ স্বাভাবিকভাবেই তেজস্ক্রিয়তায় চিহ্নিত হবে। তেজস্ক্রিয় ফসফরাস ব্যবহারে নিউক্লিক এসিড আর তেজস্ক্রিয় গন্ধক ব্যবহারে কেবল প্রোটিনে চিহ্ন পড়বে।

এরপরই শুধু চূড়ান্ত পরীক্ষা চালানো সম্ভবপর। খাদ্যমাধ্যমের অচিহ্নিত ব্যাক্টেরিয়াদের মধ্যে এখন চিহ্নিত ব্যাক্টেরিওফেজ ছেড়ে দেওয়া হল। আক্রান্ত হবার প্রয়োজনীয় সময় পার হলে মুক্ত ব্যাক্টেরিওফেজের সম্ভাব্য সংক্রমণ এড়িয়ে তাদের খাদ্যমাধ্যম থেকে নিষ্কাশিত করে তেজস্ক্রিয়তা নির্ণায়ক যন্ত্রে রাখা হল। দেখা গেল, ব্যাক্টেরিওফেজ তেজস্ক্রিয় ফসফরাসে চিহ্নিত হলেই শুধু সেই ব্যাক্টেরিয়া থেকে রেডিও সঙ্কেত পাওয়া যায়। এখানে তেজস্ক্রিয় গন্ধক ব্যাক্টেরিয়ায় প্রবেশক্ষম নয়। অর্থাৎ সংক্রমণের সময় কেবলমাত্র নিউক্লিক এসিডই ব্যাক্টেরিয়ায় প্রবেশ করে এবং ব্যাক্টেরিওফেজের প্রোটিন আবরণী বাইরে পড়ে থাকে।

কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, ব্যাক্টেরীয় কোষে ফেজ-প্রোটিনের কোন বৈশিষ্ট্য না থাকা সত্ত্বেও ব্যাক্টেরিয়ার মধ্যেই একটি পূর্ণাঙ্গ ফেজ উৎপন্ন হল। তাহলে নিউক্লিক এসিডই কি নির্দিষ্ট প্রোটিন উৎপাদন করে? সিদ্ধান্তটি যত বিস্ময়করই হোক এর অন্যতর কোন ব্যাখ্যা মিলল না। পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫২ সালে। নিউমোকক্কাইয়ের সেই পরীক্ষার মতো এখানেও নিউক্লিক এসিডের বংশাণুধৃত ভূমিকা প্রকটিত ছিল।

প্রসঙ্গত তামাক-মোজাইক ভাইরাসের পরীক্ষাবলীও উল্লেখ্য। ইহাই (সংক্ষেপে টি-এম-ভি) প্রথম আবিষ্কৃত ভাইরাস। ১৮৯২ সালে দ্‌মিত্রি ইভানোভ্‌স্কি সর্বপ্রথম এটি আবিষ্কার করেন। কিন্তু প্রথম আবিষ্কৃত ভাইরাস বলেই নয়, সুবিধাজনক গবেষণা উপকরণ হিসেবেও এর যাথার্থ্য প্রমাণিত হল। তাছাড়া টি-এম-ভি কেলাস আকারে প্রাপ্ত প্রথম ভাইরাস। পরীক্ষাগারে তৈরি প্রথম কৃত্রিম জীবিত পদার্থ এই টি-এম-ভি'ই।

ফেজের মতো টি-এম-ভি'ও প্রোটিনবেষ্টিত একটি নিউক্লিক এসিডমাত্র। ১৯৫৫ সালে মার্কিন বিজ্ঞানী ফ্রেঙ্কেল-কন্‌রাট টি-এম-ভি'কে তার উপাংশ — প্রোটিন ও নিউক্লিক এসিডে পৃথক করেন। ফলত দুটি বিশুদ্ধ রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায় (অবশ্যই তা সংশ্লেষিত নয়, প্রকৃতিজাত)। অতঃপর

বিজ্ঞানী এই উপকরণ মিশ্রিত করে তা তামাক পাতায় ছিটিয়ে দেন। গাছে মোজাইক রোগের বিশিষ্ট লক্ষণাবলী দেখা দিল। এভাবেই পরীক্ষাগারের পরিবেশে সর্বপ্রথম দুটি রাসায়নিক উপাদান থেকে একটি আদিম জীবের সৃষ্টি সম্ভবপর হল।

টি-এম-ভি'র নানা জাতি বর্তমান। তাই এক টি-এম-ভি থেকে নিউক্লিক এসিড ও অন্যটি থেকে প্রোটিন গ্রহণ করে তাদের মিশ্রণ ঘটানোর পরীক্ষাই ছিল এর পরবর্তী পর্যায়। পরীক্ষা সফল হলে দেখা গেল, ভাইরাস সর্বত্রই নিউক্লিক এসিডের উৎসানুসারী চারিত্র্য লাভ করেছে। তাছাড়া এখানে ভাইরাস প্রোটিনের বৈশিষ্ট্যেও কোন রূপান্তর ঘটে না। বলা যায়, পরীক্ষায় পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তই সত্যায়িত হল। অন্য এক বিজ্ঞানী গেরহার্ড শ্রামের আনুষঙ্গিক গবেষণাটিও খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। তিনি তামাক পাতায় সম্পূর্ণ প্রোটিনবর্জিত নিউক্লিক এসিডের প্রলেপ লাগিয়ে টি-এম-ভি উৎপন্ন করেন। অর্থাৎ হার্শি ও চেইজ ব্যাক্টেরিওফেজ পরীক্ষায় যে ফলাফল পেয়েছিলেন এবার টি-এম-ভি'র ক্ষেত্রে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটল।

বংশানুসৃতিতে নিউক্লিক এসিডের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার সমর্থক তথ্যাদি অতঃপর ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হতে থাকে। কোন কোন বিজ্ঞানী ভাবতে শুরু করেন যে, বংশানুসৃতির এই উপাদান থেকেই রহস্যময় জিনের উদ্ভব। কিন্তু অজস্র অতি সদৃশ ক্ষুদ্র অণুসমবায়ে তৈরি জিন প্রত্যয়ের সঙ্গে নিউক্লিক এসিডের সংযুতির সাযুজ্যবিধান কঠিন ছিল।

মিশার ও কল্‌ৎসোভের সময়কার নিউক্লিক এসিডের প্রচলিত ধারণা পরবর্তীকালে বদলাতে শুরু করে। নিউক্লিক এসিডের সংযুতি জানার আগে প্রোটিনের গঠন স্মরণ করা যাক। প্রোটিন সরলতর অণুসমবায় — এমিনোএসিডে গঠিত। আর ঠিক বর্ণমালার মতো এমিনোএসিডের বিন্যাসও রৈখিক, ক্রমান্বয়ী। প্রোটিন ২০ প্রকার পৃথক পৃথক এমিনোএসিড সমবায় নিয়ে গঠিত। কিন্তু উপাদানের পার্থক্যই নয়, এমিনোএসিডের অনুক্রমও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতঃপর সহজবোধ্য যে, এমিনোএসিড থেকেও অগণিত প্রকার প্রোটিনের গ্রন্থনা সম্ভবপর।

নিউক্লিক এসিডও সরলতর অণু সমবায়ে গঠিত। এসব অণুর নাম নিউক্লিওটাইড। নিউক্লিক এসিডের একটি অণু চার প্রকার নিউক্লিওটাইডে গঠিত, এই চতুঃনিউক্লিওটাইড প্রকল্পই দীর্ঘকাল সর্বসমর্থিত ছিল। তাছাড়া এর উল্লেখ্যতর বৈশিষ্ট্য এই যে, সকল নিউক্লিক এসিডের উপাদান প্রায়

অভিন্ন। নিউক্লিক এসিডে সকল নিউক্লিওটাইডই প্রায় সমমাত্রায় বর্তমান। কিন্তু বিশ্লেষণ থেকে এগুলির পরিমাণ কখনই সঠিক ২৫ শতাংশ হয় নি। প্রাথমিক পর্বে ব্যবহৃত বিশ্লেষণ পদ্ধতির জন্যও কিছু ভুল হওয়া সম্ভব।

কোষের নিউক্লিয়াস থেকে পাওয়া নিউক্লিক এসিডের সকল অণু অভিন্ন। নিউক্লিয়াস ছাড়া কোষের অন্যত্রও নিউক্লিক এসিড থাকে। কিন্তু সেখানে এর উপাদান অনেকটা আলাদা এবং শুরু থেকেই সে সম্পর্কে কোন সংশয় ছিল না।

যে নিউক্লিওটাইডে নিউক্লিক এসিড তৈরি তারা নিজেরাই যথেষ্ট জটিল। এদের প্রতিটি ফসফরিক এসিডের অবশেষ, একটি চিনি অণু ও একটি ক্ষার অণুর সমবায়ে গঠিত। নিউক্লিয়াসের নিউক্লিক এসিডে সর্বত্রই সকল ফসফরিক এসিড ও চিনির অণু অভিন্ন। কিন্তু ক্ষার চার প্রকার এবং এদের অন্তর্ভুক্তির নিরিখেই নিউক্লিওটাইডগুলিও চার শ্রেণীতে বিভাজ্য।

কোষপ্লাজ্মের নিউক্লিক এসিড নিউক্লিয়াসের নিউক্লিক এসিড থেকে একটু আলাদা। এর চিনি ভিন্ন এবং চারটি ক্ষারের একটি ঈষৎ রূপান্তরিত (অন্য তিনটি উভয় এসিডেই অভিন্ন)। নিউক্লিয়াসের নিউক্লিক এসিড এখন সংক্ষেপে ডি-এন-এ (desoxyribonucleic acid) এবং কোষপ্লাজ্মের এসিডটি আর-এন-এ (ribonucleic acid) নামে চিহ্নিত।

ডি-এন-এ এবং আর-এন-এ সহ সকল নিউক্লিক এসিড প্রায় সমসংখ্যক চার প্রকার নিউক্লিওটাইডে গঠিত। উন্নততর বিশ্লেষণপদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে ক্রমাগত নতুন সংখ্যা পাওয়া গেলেও নিউক্লিওটাইডের পারম্পর্য আজও প্রায় অপরিবর্তিতই আছে। এমন কি বিশ্লেষণ যখন সম্পূর্ণ নিখুঁত এবং নির্ধারিত সংখ্যা যখন সঠিক না হয়ে সম্পূর্ণ সঠিক, গড় মানে তখনো কিছুটা ভিন্নতা অব্যাহত থাকে।

বিষয়টি সম্পর্কে বিভিন্ন পরীক্ষাগারে কার্যরত কর্মীদের অভিন্ন ভুল এক বিস্ময়কর ব্যাপার। যেমন, একজন বিজ্ঞানীর মতে একটি ব্যাক্টেরিয়ায় এডিনিনের (ক্ষারচতুষ্টয়ের অন্যতম) পরিমাণ সম্ভাব্য ২৫ শতাংশের স্থলে ২০·৫ শতাংশ। পরীক্ষাটির পুনরাবৃত্তি করে দ্বিতীয় জন পেলেন যথাক্রমে ২১·৩, তৃতীয় ও চতুর্থ জন ২১·২ এবং ২০·৩ শতাংশ। (আমি নিজে সংখ্যাগুলি আবিষ্কার করি নি, গবেষণা নিবন্ধ থেকে সংগ্রহ করেছি।) সংখ্যা সঠিক না হলেও তা সবসময়ই ২১ শতাংশের কাছাকাছি। কাজেই ২৫ শতাংশ থেকে এই চ্যুতি মোটেই আপতিকরূপে ব্যাখ্যাযোগ্য নয়।

নিউক্লিক এসিডের, আরো সঠিকভাবে বললে ডি-এন-এ'র সংস্থিতির ভেদনির্ণয়ে দুজন বিজ্ঞানী যথেষ্ট আগ্রহী হন। এদের একজন মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আন্দ্রেই বেলোজেরস্কি অন্যজন নিউ ইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আরউইন চার্গাফ। এঁরা দুজনই রাসায়নিক বিশ্লেষণের নিখুঁততম পদ্ধতি ব্যবহার করে সম্পূর্ণ আলাদা জাতের অসংখ্য নমুনা নিয়ে পরীক্ষা করলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, নিউক্লিক এসিডের বৈশিষ্ট্য জাতিক্রমানুসারে সুনির্দিষ্ট।

প্রত্যেক প্রজাতির নিউক্লিক এসিডের উপাদান নিখুঁতভাবে চিহ্নিত। গিনিপিগের যকৃৎ, প্লীহা, মস্তিষ্ক অথবা পেশী — যেকোন প্রত্যঙ্গ থেকেই এটি পৃথকীকৃত হোক না কেন তার সংস্থিতি সর্বত্রই অভিন্ন থাকে। ইঁদুরদের নিউক্লিক এসিডের বিশ্লেষণ থেকে ভিন্নতর তথ্য পাওয়া গেলেও তাদেরও সকল প্রত্যঙ্গেই তা অনুরূপ। সুতরাং নিউক্লিক এসিডসমূহ যে নানা প্রকার এখন তা সুনির্ধারিত। চতুঃনিউক্লিয়টাইড প্রকল্প যেহেতু বাস্তব তথ্যের বিরোধী তাই অবশ্যত্যাজ্য।

ইতিমধ্যে অ্যাভেরি, হার্শি, শ্রাম ও অন্যান্যরা নিউক্লিক এসিডের বংশানুসৃতিমূলক ভূমিকার বিস্ময়কর ফলাফলের সন্ধান পেয়েছিলেন এবং রাসায়নিক তথ্যাদির সঙ্গে তাঁদের সিদ্ধান্তসমূহের অসঙ্গতিও ততদিনে অবসিত হয়েছিল। রাসায়নিকরা এখন দুই শ্রেণীর জৈবপদার্থ সম্পর্কে অবহিত, যাদের প্রকারভেদের সংখ্যা বিপুল। পদার্থদুটি: নিউক্লিক এসিড আর প্রোটিন। ৮০ বছর আগের তথ্যাদি থেকে পাওয়া জ্ঞানের ভিত্তিতে এখনো আমরা একই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। ১৮৯৬ সালে জার্মান রাসায়নিক আলব্রেখ্‌ট কসেল পুরুষ স্যামন মাছের ডিমের উপাদান পরীক্ষা করেন। এর কোষ নিউক্লিয়াসে ডি-এন-এ এবং প্রোটিন ছিল, যা মিশার ইতিপূর্বে আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু এখানে প্রোটিনের পরিমাণে ৫০ শতাংশ ঘাটতি দেখা গেল আর প্রোটিনটিও ছিল অদ্ভুত ধরনের। এর অণুরা ক্ষুদ্রায়তন এবং এর ৮০—৯০ শতাংশ একটি মাত্র এমিনোএসিড — আর্জিনিনে গঠিত। আবিষ্কারটি বিস্ময়কর, বিশেষত যখন পুরুষ মাছের ডিমেই প্রোটিনটি উৎপন্ন হয়েছে এবং এ দ্বারাই স্ত্রী মাছের ডিম নিষিক্ত ও সমগ্র পৈত্রিক চারিত্র্য সন্ততিতে সঞ্চারিত হবে।

বংশানুসৃতির উপাদান বলে যদি কিছু থাকে তবে তা অবশ্যই পুরুষ মাছের ডিমেও থাকবে। কিন্তু কসেল সেখানে যেসব প্রোটিন পেলেন, গুরুত্বপূর্ণ

কর্মসম্পাদনের পক্ষে তাদের যোগ্যতা প্রশ্নসাপেক্ষ ছিল। বস্তুত প্রোটিন অণুর অসংখ্য বৈচিত্র্য বিধান ও বিপুল পরিমাণ বংশানুসৃত তথ্যাদি পরিবহণের পক্ষে প্রোটামিনের (মিশারের দেওয়া নাম) অভিন্নরূপ উপাদানে কোন নিশ্চয়তা নিহিত ছিল না।

অবশ্য আমরা যদি ১০টি বিভিন্ন এমিনোএসিডের একটি শৃঙ্খলের কথা ভাবি, তবে তা থেকে ৩৬,২৮,৮০০ প্রকার বিভিন্ন বিন্যাস পাওয়া সম্ভব। কিন্তু এই দশটির আটটিই যদি সদৃশ হয় তবে বিন্যাসের সংখ্যা ৯০-এ অবনমিত হবে। তাই দেখা যাচ্ছে যে, পুরুষ মাছের ডিমের প্রোটামিনের পক্ষে সাধারণ প্রোটিনে সঞ্চিত তথ্যের মাত্র ১/৪০,০০০ ভাগ ধারণ করা সম্ভব। যে সকল কোষ সন্তান প্রজননের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় সেগুলির নিউক্লিয়াসে প্রোটামিনের বদলে জটিলতর উপাদানসম্বলিত হিস্টোন বর্তমান। সুদূর অতীতে পূর্বোক্ত সীমিত তথ্যাদির ভিত্তিতে বংশাণুধৃত চারিত্র্য পরিবহণের দায় প্রোটিনের বদলে নিউক্লিক এসিডের উপর আরোপ করা অসম্ভব ছিল।

গোড়া থেকেই ডি-এন-এ'এর অবস্থান কেবলমাত্র কোষ নিউক্লিয়াসেই নির্ধারিত ছিল। পরে দেখা গেল তা থাকে কেবল ক্রমোসোমে। জিনদের অবস্থিতি যদি ক্রমোসোমেই নির্দিষ্ট হয় তবে এরূপ মনে করা কি সঙ্গত নয় যে, জিনের সঙ্গে ডি-এন-এ'র কোন সম্পর্ক থাকা সম্ভব ? কোষে ডি-এন-এ'র পরিমাণ পরিবর্তনের নিয়ম সূত্রবদ্ধ হয়েছিল আগেই। কোন জীবের সকল দ্বিপ্রস্থ কোষেই ডি-এন-এ'র পরিমাণ কঠোরভাবে নির্দিষ্ট। বংশাণুধৃত উপাদানের পক্ষে বৈশিষ্ট্যটি একান্ত অপরিহার্য।

এখন সবকিছুই সুস্পষ্ট মনে হয়। চতুঃনিউক্লিওটাইড তত্ত্বের দীর্ঘকালীন প্রাধান্যের যুগে নিউক্লিক এসিড অনাকর্ষী জৈবরাসায়নিক উপকরণে পর্যবসিত ছিল। জৈবরাসায়নিকদের কাছে সে তখন সিণ্ডারেলা। আর জৈবরসায়নের প্রতি বংশাণুবিদদের ঔৎসুক্য ছিল না, নিউক্লিক এসিডের প্রতি তো নয়ই।

বংশানুসৃতির ক্ষেত্রে নিউক্লিক এসিডের গুরুত্ব যে প্রোটিন অপেক্ষা কম নয়, পঞ্চাশের দশকের শুরুতে এরূপ বহু তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল। কম গুরুত্বপূর্ণ বলার কারণ এই যে, প্রোটিনকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলার মতো লোক সেকালে বেশী ছিল না। সেজন্য প্রয়োজন ছিল নিউক্লিক এসিডের সংযুতির ব্যাখ্যা ও জীবদেহে তার কার্যাদি সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞান সংগ্রহ। কিন্তু বংশাণুবিদ্যার বিরাট আবিষ্কারের আসন্ন সম্ভাবনা সম্পর্কে তখনই অনেকে নিঃসন্দেহ ছিলেন।

রাণী হলেন সিণ্ডারেলা

স্বপ্রজননক্ষম সেই অণু

১৯৫৩ সালে লণ্ডনে প্রকাশিত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সাময়িকী ‘নেচার’এর ১৭১ খণ্ডের একটি সংখ্যায় ‘সম্পাদকের কাছে পত্র’ শিরোনামে (যেখানে সাম্প্রতিকতম আবিষ্কার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত সংবাদ ছাপা হয়) একটি ছোট নিবন্ধ ‘ডিসোক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিডের মহাণু সংস্থিতি প্রসঙ্গে’ প্রকাশিত হয়। এটিতে সই ছিল এফ. এইচ. সি. ক্রিক এবং জে. ডি. ওয়াটসন। ছোট নিবন্ধটির জন্যই এঁদের নাম বংশানুসৃতি ও নিউক্লিক এসিডে কৌতূহলী সকল বিজ্ঞানীর কাছে তখনই পৌঁছে গেল।

কেন এই প্রবন্ধের এত খ্যাতি এবং এর লেখকরাই-বা কী সিদ্ধি অর্জন করেছিলেন? নাম দেখে মনে হয় এর আলোচ্য বিষয় ডি-এন-এ’র সংযুতি। কীভাবে কাজটি নিষ্পাদিত হল সাধারণ পাঠকের কাছে তা সংক্ষেপে বর্ণনা করা অসম্ভব। কিন্তু এর মৌলিক প্রক্রিয়া এরূপ: কোন কেলাসের মধ্য দিয়ে যখন এক্স-রে অতিক্রম করে তখন কেলাসের পরমাণুর অবস্থানমতো এক্স-রে চিত্রে একধরনের বিন্দুর বিন্যাস চিহ্নিত হয়। ছবিটি কিন্তু অণুর কোন ‘প্রতিকৃতি’ নয়। এক্স-রে চিত্রের অর্থোদ্ধার এবং অণুবিন্যাস নির্ণয়ের জন্য জটিল অঙ্ক, গভীর ও বিস্তৃততর বিশেষ জ্ঞান এবং পর্যাপ্ত কল্পনাশক্তির প্রয়োজন। কিন্তু ডি-এন-এ’এর ছবি তোলার সুনির্দিষ্ট সমস্যাই জটিল ও বহুবিধ।

এক্স-রে ব্যবর্তনে ডি-এন-এ অণুর সংযুতি নির্ণয়ের চেষ্টা শুরু হয়েছিল চল্লিশের দশকের প্রথমার্ধে, কিন্তু ছবিগুলির আত্যন্তিক জটিলতা ও অস্পষ্টতার জন্য কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উত্তরণ সম্ভব হয় নি। কিন্তু ব্রিটিশ বিজ্ঞানী উইল্‌কিন্স ও তাঁর সহকর্মীদল অনেক দিনের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে এর চমৎকার আলোকচিত্র গ্রহণে সক্ষম হন। কিন্তু এদের অর্থোদ্ধারে তাঁরা সফল হন নি। অতীতের ওস্তাদরা এক্স-রে ব্যবর্তনে আলোকচিত্র গ্রহণ করলেও এর অর্থোদ্ধারে বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। আধুনিক বিজ্ঞানের

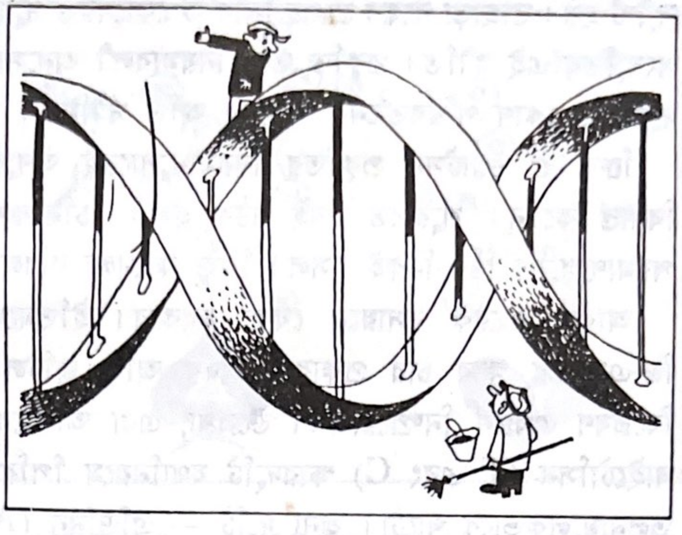

বিশেষীকরণের উৎকর্ষতার প্রেক্ষিতে এই ব্যর্থতায় বিস্ময়ের কিছু নেই। ওয়াটসন ও ক্রিকই সর্বপ্রথম ছবিগুলির অর্থোদ্ধার করেন।

তাঁদের মতে ডি-এন-এ অণুর চেহারাটি কী? হেলিক্সের আকারে ঘোরানো মই-ই এর সেরা তুলনা। ইতিমধ্যেই আমরা জেনেছি যে, নিউক্লিক এসিড নিউক্লিওটাইডে তৈরি এবং প্রতিটি নিউক্লিওটাইডের তিনটি অংশ: একটি চিনি, একটি ফস্‌ফেট ও একটি ক্ষার। নিউক্লিওটাইডগুলি দীর্ঘ শৃঙ্খলে যুক্ত। সুতরাং শৃঙ্খলের মূল বাহুতে চিনি ও ফস্‌ফেট অণু একান্তরবিন্যস্ত ও ক্ষার একপাশে যুক্ত। ঘূর্ণিত মইয়ের সঙ্গে তুলনা করলে বলা যায় যে, চিনি-ফস্‌ফেট শৃঙ্খলসমূহ এর কিনার বা বাজু আর দুই শৃঙ্খলের যোজক ক্ষার যেন সিঁড়ি। সাধারণভাবে এই হল ডি-এন-এ অণুর গড়ন।

কিন্তু এর সর্বাধিক আকর্ষী বৈশিষ্ট্য অন্যতর। এক্স-রে ব্যবর্তনের ছবি থেকে ডি-এন-এ অণুর কেবল দৈত হেলিক্স চারিত্র্যই নয়, এর ব্যাস, দুই কুণ্ডলীর মধ্যবর্তী দূরত্বও নির্ণীত হয়েছে। বলা বাহুল্য পরিমাপটি অতি সূক্ষ্ম। ডি-এন-এ অণুর পরমাণু সংযোগ রাসায়নিকদের জানা ছিল। তাই উক্ত রাসায়নিক তথ্যাদির সঙ্গে বর্তমান এক্স-রে ব্যবর্তন চিত্রের সাযুজ্য পরীক্ষা তাঁদের কাছে জরুরি বিবেচিত হয়েছিল।

ফলাফল সঙ্গতিপূর্ণ হবার অর্থ ডি-এন-এ অণুর সংযুতি শুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়েছে, আর অসঙ্গতির অর্থ মডেলটি বাস্তব অবস্থার অনুবর্তী নয়। কিন্তু অণুর মধ্যে সকল পরমাণুর সমন্বয়সাধন কঠিন কাজ। নিয়মানুসারে কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে থাকলেই পরমাণুর মধ্যে পারস্পরিক রাসায়নিক বন্ধ

সৃষ্টি হয়। তাছাড়া বন্ধের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোণেরও গুরুত্ব অত্যধিক। পদার্থের সংযুতির এই রীতি। প্রকৃতি তার নিয়মাবলী অনুসরণে আপোসহীন। এই দূরত্ব ও কোণ পরিবর্তনের পরিসর অতি সীমিত।

ক্রিক ও ওয়াটসন প্রকৃতির নিয়মানুসারেই অণুর মইয়ে পরমাণুসমূহ বিন্যস্ত করেন। শুরুতে সবই ঠিক হল। চিনি-ফসফেটে তৈরি বাজুতে পরমাণুগুলি ঠিক-ঠিকই বসল। কিন্তু ঝামেলা বাঁধল সিঁড়িতে এসে।

আবার বারেক রসায়নে ফেরা দরকার। ইতিমধ্যেই আমরা জানি যে ডি-এন-এ'র ক্ষার চার প্রকার। এদের অতি জটিল সূত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এখানে নিষ্প্রয়োজন। উল্লেখ্য, এরা আকারে বিভিন্ন। থাইমিন ও সাইটোসিন (T এবং C) ক্ষারদুটি যথানিয়মে পিরিমিডিন শ্রেণীভুক্ত এবং তুলনামূলকভাবে খাটো। অন্য দুটি — এডিনিন (A) এবং গুয়ানিন (G) পিউরিন শ্রেণীভুক্ত এবং পিরিমিডিনের প্রায় দ্বিগুণ।

দেখা গেল, 'মইয়ের সিঁড়ি' তৈরির জন্য পিউরিন ও পিরিমিডিনের ক্ষার কোনটিই উপযুক্ত নয়। পিউরিনদুটির জন্য হেলিক্সের ভেতর স্থানাভাব প্রকট অথচ পিরিডিনদুটি পরস্পর থেকে এতে দূরে থাকে যে, তারা কোন রাসায়নিক বন্ধ তৈরিরই উপযুক্ত নয়। একটি পিউরিনের সঙ্গে কেবল একটি পিরিমিডিন যুক্ত হলেই হেলিক্সের ব্যাসের সঙ্গে মাপটি সঠিক হয়। অতঃপর দেখা গেল যে, সংযোগকারী পরমাণুরা অর্ধেক ক্ষেত্রেই অণুর বিপরীত প্রান্তে অবস্থিত এবং এজন্য তারা বন্ধ সৃষ্টিতে অক্ষম। শুধুমাত্র দু'জোড়ার ক্ষেত্রেই সকল চাহিদাপূরণ সম্ভব ছিল: A এবং T আর G এবং C। রাসায়নিক তথ্যাদির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ না হলে তা অবিশ্বাস্য মনে হত। উপরোল্লেখিত আন্দ্রেই বেলোজের্স্কি ও আরউইন চার্গাফের পরীক্ষা থেকে দেখা গিয়েছিল যে, ডি-এন-এ'র সকল নমুনায়ই A ও T এবং G ও C সমপর্যায়ে অবস্থিত। সবকিছুই সুবিন্যস্ত হল। ক্রিক ও ওয়াটসন নিজেদের নির্ভুলতা সম্পর্কেও নিশ্চিত হলেন।

আমরা এখানে যাকিছু বলেছি তা সবই গুরুত্বপূর্ণ ও কৌতূহলোদ্দীপক (অন্তত বিশেষজ্ঞদের কাছে)। কিন্তু ক্রিক ও ওয়াটসন কেবল এতটুকু করলে তাঁদের পক্ষে আজকের খ্যাতি লাভ অসম্ভব হত।

এঁদের গবেষণার পূর্ণ তাৎপর্য বোঝার জন্য আসুন আমরা এভাবে যুক্তি খাড়া করি (যেন কখনই না ভুলি যে, ডি-এন-এ'র দুই হেলিক্সে A সর্বদাই T-র এবং G সর্বদাই C-র বিপরীতে অবস্থিত)। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ডি-এন-এ'র

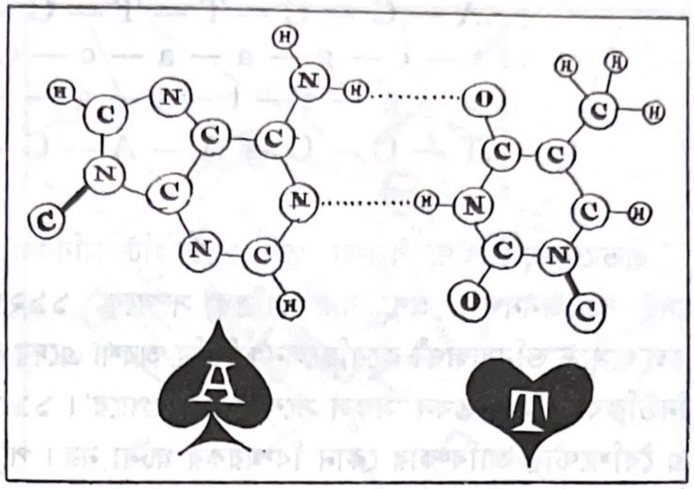

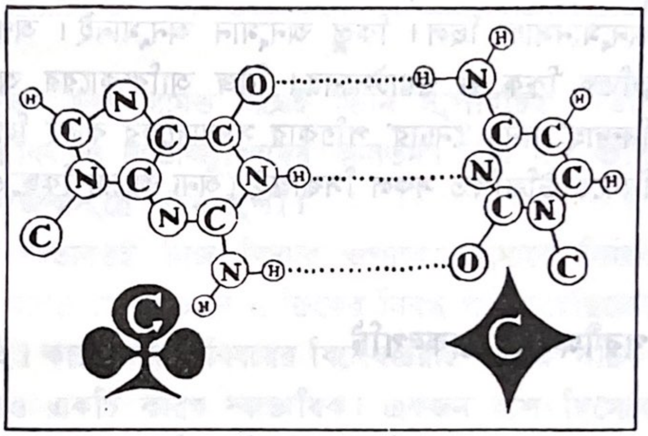

মধ্যে ক্ষারের একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ক্রমিক শৃঙ্খল কল্পনা করা যাক: ...A — G — C — T — T — G — G...। জোড়া তৈরির নিয়ম স্মরণ করে বলা যায় যে, অন্য শৃঙ্খলে ক্ষারের অনুক্রম হবে: ...T — C — G — A — A — C — C...। সুতরাং অণুর প্রতিষঙ্গী অংশ অবশ্যই হবে:

...A — G — C — T — T — G — G...
...T — C — G — A — A — C — C...

এখন আমরা কল্পনা করি যে, হেলিক্সদ্বয় উন্মুক্ত হয়ে আলাদা কুণ্ডলীতে বিভক্ত হল এবং তাদের প্রতিটির কাছে জন্ম নিল নতুন হেলিক্স। নিম্নলিখিত সমাবন্ধন এক্ষেত্রে সহজলক্ষ্য (পুরানো ও নতুন শৃঙ্খলের পার্থক্য দেখানোর জন্য নবজাত ক্ষারসমূহ ছোট হরফে চিহ্নিত যদিও এরা সম্পূর্ণ অভিন্ন):

...A — G — C — T — T — G — G...
...t — c — g — a — a — c — c...
...a — g — c — t — t — g — — g...
...T — C — G — A — A — C — C...

এভাবে দুটি অণু পাওয়া গেল, প্রত্যেকটি অবিকল প্রথমটির মতো। এটি সেই স্বপ্রজননক্ষম অণু যার অস্তিত্ব সম্পর্কে ১৯২৭ সালেই নিকোলাই কল্‌ৎসোভ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তিনি অবশ্য এদের প্রোটিনই ভেবেছিলেন, নিউক্লিক এসিড তখন 'সকল সন্দেহের পরপারে'। ১৯৫৩ সালে ডি-এন-এ'র এ বৈশিষ্ট্যের আবিষ্কার কোন বিস্ময়কর ঘটনা নয়। পূর্বোক্ত তথ্যাদি জানার পর ডি-এন-এ অণুর নিজস্ব সংযুতি থেকেই এর আশ্চর্য স্বপ্রজনন ক্ষমতা অনুমানসাধ্য ছিল। কিন্তু অনুমান অনুমানই। অণুর এই ক্ষমতা প্রমাণের কৃতিত্ব ক্রিক ও ওয়াটসনের। নিজ আবিষ্কারের অবমূল্যায়নের জন্য তাঁরা নিন্দার্হ নন। 'নেচার' পত্রিকার সম্পাদকের কাছে লিখিত তাঁদের স্বল্পায়তন নিবন্ধে উল্লিখিত সকল সিদ্ধান্তই (অন্য আরো কিছুও) বিবৃত ছিল।

পরীক্ষণীয় প্রকল্পটি

আণবিক বংশাণুবিদ্যা আধুনিক বিজ্ঞানের তরুণতম ও 'হাল ফ্যাশনের' একটি শাখা। এর বিকাশ, বংশাণুসঙ্কেতের (জেনেটিক কোড) অর্থোদ্ধার ও বংশানুসৃতির অণুসংগঠনের অ-আ, ক-খ প্রতিপাদন — মানবপ্রজ্ঞার তুঙ্গীভূত সাফল্যের অন্যতম নজির। 'নেচার'এ ক্রিক ও ওয়াটসনের নিবন্ধ প্রকাশের তারিখটিকেই এর জন্মদিন বলা যায়।

বংশানুসৃতির অ-আ, ক-খ বলা হল এজন্য যে এতে বংশাণুবিদ, জৈবরাসায়নিক, কেলাসবিশেষজ্ঞ ও গাণিতিক সহ বহু বিষয়ের গবেষকদের মনই আলোড়িত হয়েছিল এবং তাঁরা ছিলেন গ্রেট ব্রিটেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, জাপান এবং অন্যান্য বহু দেশের মানুষ।

আমেরিকার কালোরাডো রাজ্যের এক ছোট শহর বোল্ডারের অধিবাসী জনৈক উন্নাসিক নভোবস্তুবিদ না থাকলে জীবন্ত অণুর সঙ্কেত ভাঙার

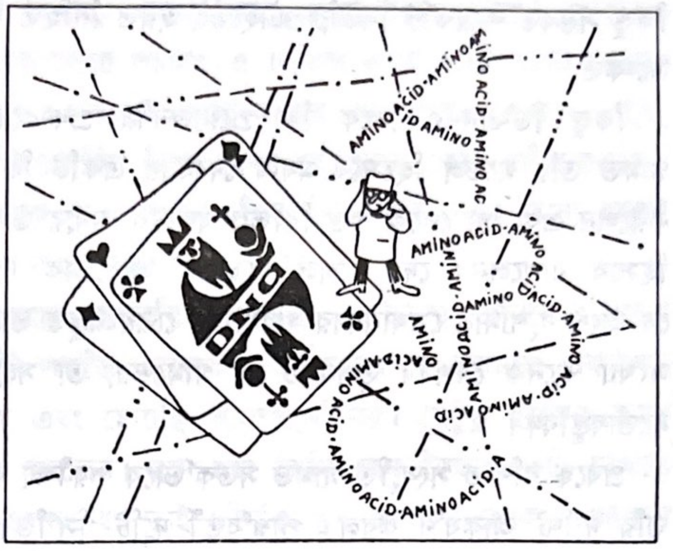
DNA
AMINO ACID·AMINO AMINO ACID·AMINO AC
AMINO ACID·AMINO ACID·AMINO
AMINO ACID·AMINO ACID·AMINO ACID·A

ব্যাপারটি অন্য রকম হত। জর্জ গামভ নামেই তিনি সুপরিচিত। তিনি আমেরিকার মুখ্য পদার্থবিদ ও নভোবস্তুবিদদের অন্যতম। তাঁর নাম প্রতি পাঠ্যগ্রন্থেই চোখে পড়ে। জন্মসূত্রে তিনি রুশী।

তত্ত্বীয় পদার্থবিদরা স্বভাবতই নিজ বিদ্যার ওপারে বহুদূরে বিবিধ বিষয়ে কৌতূহলী হন। গামভ যে ওয়াটসন ও ক্রিকের নিবন্ধ পাঠ করেছিলেন এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কারণ, সকল বিষয়ের বিশেষজ্ঞরাই 'নেচার' পত্রিকা পড়ে থাকেন। এর আরও একটি কারণ স্বাভাবিক। একজন রুশ হিসেবে গামভ হয়ত তাঁর কালে কল্‌ৎসোভের প্রবন্ধাবলী পাঠ করেছিলেন। যা হোক, প্রবন্ধটিতে তিনি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। ডি-এন-এ অণুতে স্বপ্রজনন ক্ষমতার অস্তিত্ব ক্রিক ও ওয়াটসন তাঁদের নিবন্ধে উল্লেখ করেন। কিন্তু স্বপ্রজনন ক্ষমতাই তো শেষকথা নয়। প্রোটিনেরও এ ক্ষমতা থাকলে অবশ্য অন্য কথা ছিল। কিন্তু কীভাবে স্বপ্রজননক্ষম ডি-এন-এ অণু প্রোটিন গঠনে সাহায্য করে? অবশ্য অ্যাভেরীর পরীক্ষা, বাক্টেরীয়ফেজ নিয়ে হার্শির গবেষণা এবং অন্যান্য বহু তথ্য থেকে এর সম্ভাব্য রূপান্তরণরীতি প্রমাণিত হয়েছিল। যদি ডি-এন-এ অণুর সংযুতির মধ্যেই তার স্বপ্রজনন ক্ষমতা দৃঢ়লগ্ন থাকে, তবে জটিল প্রোটিন অণুর সংযুতি নির্ণয়ের ক্ষমতাও কি ওখানেই নিহিত নয়।

অবশ্য প্রোটিনের চেয়ে ডি-এন-এ অণুর সংযুতি সরলতর। প্রোটিন ২০টি এমিনোএসিডে তৈরি। কিন্তু ডি-এন-এ'র নিউক্লিওটাইড সংখ্যা মাত্র চার।

কিন্তু সম্ভবত কয়েকটি নিউক্লিওটাইডেই হয়ত নিহিত আছে একটি প্রোটিনের সংকেত?

কিন্তু ডি-এন-এ থেকে কি প্রয়োজনীয় প্রকারভেদের উৎপত্তি সম্ভব? গামভ তাঁর মডেল হিসেবে মধ্যম দৈর্ঘ্যের একটি ডি-এন-এ অণুকে বাছাই করলেন এবং তা থেকে কত বিভিন্ন ধরনের অণুর উৎপত্তি সম্ভব তার একটা হিসাব রাখলেন। দেখা গেল, বৃহত্তম আধুনিক দূরবীক্ষণে মহাজগতের যে অংশ দৃশ্যমান সেখানকার পরমাণুর চেয়ে বস্তুত তাদের সম্ভাব্য সমাবন্ধনের সংখ্যা অনেক বেশী। তুলনাটি যে গামভের, তা সহজেই অনুমেয়। তিনি নভোবস্তুবিদ।

প্রবন্ধে বর্ণিত সংযুতি গামভ সতর্কভাবে পরীক্ষা করলেন। দুটি উপাদান তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। পার্শ্ববর্তী দুটি 'সিঁড়ি'র দূরত্ব ৩·৪ আংস্ট্রম (১ আংস্ট্রম=এক সেণ্টিমিটারের ১০ কোটি ভাগের এক ভাগ)। কিন্তু এই দূরত্বটি প্রোটিন অণুর দুটি প্রতিবেশী এমিনোএসিডের দূরত্বের সমান। একে আপতিক সংযোগ বলা যায় না। পক্ষান্তরে একটি প্রোটিন শৃঙ্খলকে একটি ডি-এন-এ শৃঙ্খলের পাশে রাখলে একটি নিউক্লিওটাইড (চার প্রকার) ও একটি এমিনোএসিড (২০ প্রকার) সমাপতিত হয়। সম্ভবত এমিনোএসিড ও নিউক্লিওটাইড ১:১ অনুপাতে অবস্থিত নয়, এগুলি 'প্রাবরক'।

সহজেই পথ খুঁজে পাওয়া গেল। সংক্ষেপে তা এরূপ। তিন অক্ষরের তিনটি শব্দ নেয়া যাক, যেমন **সকল, হরজ, নমন** এবং এগুলিকে একসঙ্গে লেখা হোক **সকলহরজনমন**। এখন শব্দগুলি মন দিয়ে পরীক্ষা করুন। যদি যেকোন তিনটি ধারাবাহিক অক্ষর নেয়া হয়, তাহলে আমরা তা থেকে পেতে পারি: **সকল, কলহ, লহর, হরজ, রজন, জনম, নমন**। এমিনোএসিডের সংকেতও সম্ভবত এভাবেই চিহ্নিত অর্থাৎ এগুলি প্রাবরিত। দ্বিতীয় হেলিক্স পরীক্ষাকালে গামভ অন্যতর একটি বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করলেন। উপর ও নিচের যে দুটি ক্ষার 'সিঁড়ি' তৈরি করে সেগুলির সহযোগে চারটি ক্ষারের বিসমকোণী সমভুজ সামান্তরিকের আকারবিশিষ্ট একটি রম্বিক গ্রন্থি পাওয়া যায় এবং চারটি ক্ষারের দূরত্ব প্রোটিনস্থ এমিনোএসিডের ফাঁকের সমান। যত 'রম্বিক' ডি-এন-এ'র পক্ষে উৎপাদন সম্ভব তার সংখ্যা সঠিক ২০ যা প্রোটিনস্থ এমিনোএসিডের সমসংখ্যক। আরো একটি আকস্মিক সংযোগ!

গামভের ধারণানুযায়ীই যদি সবকিছু সঠিক হয়, তবে বংশাণুধৃত সংকেতের অর্থোদ্ধার, ডি-এন-এ'র নিউক্লিওটাইড ও প্রোটিনস্থ এমিনোএসিডের

পারম্পর্যের নিয়মাবলী নির্ণয়, তেমন কিছু কঠিন সমস্যা নয়। প্রাবরিত সংকেতে এমিনোএসিডের ক্ষেত্রে স্বাগত ও নিষিদ্ধ এমন দুটি পার্শ্ব-অবস্থান থাকা স্বাভাবিক সুতরাং সংকেতের অর্থোদ্ধারের জন্য আমাদের এখন শুধু প্রয়োজন অল্প কয়েকটি প্রোটিন নিয়ে দেখা যে, কোন কোন এমিনোএসিড পাশাপাশি থাকে বা থাকে না। এমিনোএসিড বিন্যাসের নিয়ম জানা হলেই সংকেত উদ্ধারে আর কোন প্রতিবন্ধ থাকবে না।

১৯৫৪ সাল। সবেমাত্র ফ্রেডারিক সেঞ্জার প্রোটিনস্থ এমিনোএসিডের অনুক্রম নির্ণয়ের একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। যে ফলাফল প্রকাশিত হল তা ছিল প্রাথমিক এবং মোটেই সুসম্পূর্ণ নয়। যেটুকু হাতের কাছে ছিল গামভ তাই গ্রহণ করলেন। মনে হল তিনি যেন কিছু একটা দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু দারুণ তথ্যাভাব। তাই দীর্ঘকালের জন্য না হোক, তখনকার মতো অপেক্ষা ছাড়া তিনি নিরুপায়।

তবে বেশী দিন তাঁকে অপেক্ষা করতে হয় নি। যে সকল গবেষণাগার প্রোটিন বিশ্লেষণের কাজে তখন উন্মুখ, সেঞ্জারের পদ্ধতি সেখানে গৃহীত হয়েছিল। ১৯৫৭ সালে ক্রিকের অন্যতম প্রতিভাবান সহকর্মী সিড্‌নি ব্রেনার সকল প্রকাশিত তথ্যাদি সংগ্রহ করে এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, গামভ প্রস্তাবিত রম্বিক সংকেত কিংবা অন্যতর কোন প্রাবরক সংকেত বাস্তব তথ্যের বিরোধী। প্রোটিনে কোন নিষিদ্ধ অঞ্চল নেই।

গামভ ভুল করেছিলেন। তৎসত্ত্বেও তাঁর গবেষণাটির মৌলিক গুরুত্ব স্বীকার্য, যদিও তাঁর কাছে মূলত এটি আনুষঙ্গিক বিষয়মাত্র।

কেবলমাত্র সংকেতের অর্থোদ্ধার সমস্যাটি উপস্থাপনেই গামভের কাজের মূল গুরুত্ব সীমিত নয় (অবশ্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ!), একটি পরীক্ষণীয় প্রকল্প গ্রন্থনাও তাঁর অন্যতম প্রধান কীর্তি। এরই ফলে জানা গেল যে রম্বিক সংকেতই শুধু ভুল নয়, সংকেত নিজেও কখনই প্রাবরিত হয় না।

তাত্ত্বিকেরা দায়িত্ব পেলেন

বংশাণুসংকেতের অর্থোদ্ধার প্রায়শই রহস্যময় লিপি ব্যাখ্যার সঙ্গেও তুলনীয়। বস্তুত এদের সাদৃশ্য বাস্তব এবং তা কোনক্রমেই বাহ্যিক নয়। গুপ্তলিপি ব্যাখ্যার সমস্যাবলী দুই শ্রেণীতে বিভাজ্য: জ্ঞাত ভাষার লিপি কিংবা প্রাচীন বিস্মৃত ভাষার লিপি।

অর্থোদ্ধারের ক্ষেত্রে জ্ঞাত ভাষার সচেতন গুপ্তলিপি অপেক্ষা ভাবসঙ্গোপন-অনীহ অজ্ঞাত ভাষার লিপি বহুগুণ জটিল। এই দুই শ্রেণীর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আলাদা পদ্ধতি ব্যবহার্য।

প্রথম শ্রেণী নিয়েই শুরু করা যাক। কল্পনা করা যাক, কেউ যেন কোন গোপন বর্ণমালা আবিষ্কার করেছে। তার গুপ্তলিপির প্রতিটি অক্ষরই এমন প্রতীকে চিহ্নিত যে, সে মনে করে গুপ্তলিপি লিখিত কাগজটি (অর্থাৎ নির্দেশিকা) হাতে না পেলে কোন মানুষের পক্ষেই এর অর্থোদ্ধার সম্ভবপর নয়। কিন্তু আসলে তা নয়। এই গুপ্তলিপির অর্থোদ্ধার তেমন কিছু কঠিন নয়। প্রয়োজন শুধু একটি দীর্ঘ লিপির।

ঠিক এ পদ্ধতিতেই শব্দে ব্যবহৃত বর্ণের পৌনঃপুন্য, তাদের সর্বাধিকসংখ্যক সমাবন্ধনের ব্যবহার ইত্যাদি অনুসরণের নীতির ভিত্তিতে সংকেতের অর্থোদ্ধার করা হয়।

কিন্তু অজ্ঞাত ভাষার লিপিপাঠ? প্রাচীন মিসরের চিত্রলিপিতে ব্যবহৃত বর্ণমালাই এর প্রকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত। বিখ্যাত এই শিলালিপিটির পাঠোদ্ধার অসম্ভব বিধায় একসময় তা পরিত্যক্ত হয়েছিল। ১৮০২ সালে জনৈক বিশেষজ্ঞ লিখেছিলেন যে, চিত্রলিপিটির পাঠোদ্ধারের চেষ্টা অনেক আগেই পরিত্যক্ত হয়েছে। কিন্তু ভবিষ্যদ্বক্তা হিসেবে তাঁর দৈন্য শীঘ্রই প্রমাণিত হল। ১৮২২ সালে তরুণ ফরাসী জাঁ ফ্রাঁসোয়া শাঁম্পলিয়ন ঐতিহাসিক ঘোষণা উচ্চারণ করলেন: 'আমি পেরেছি!'

বিস্ময়কর এক শিলাফলক আবিষ্কারের ফলেই বহু শতাব্দীর পুরানো সেই রহস্যভেদ সম্ভব হল। নেপোলিয়নের মিসর অভিযানকালে (সঠিক তারিখ ২ রা আগষ্ট, ১৭৯৯) বুশার নামে সৈন্যবাহিনীর জেনারেল স্টাফের অফিসার রসেটা (প্রাচীন রশিদ ফোর্ট) থেকে সাত কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ফোর্ট জুলিয়েনের রক্ষাব্যবস্থা দৃঢ়তর করার জন্য তাঁর অধিনস্থদের নির্দেশ দান করেন। জনৈক সৈন্যের কোদালে কঠিন কিছু ঠেকল। সেই 'কিছুটি' মাটি থেকে বার করে দেখা গেল যে, তা প্রতীকাচ্ছন্ন এক খণ্ড কালো আগ্নেয়শিলা। ভালভাবে পরীক্ষার পর দেখা গেল শিলাফলকটিতে (এখন রসেটা শিলা নামে খ্যাত) তিনটি লিপি রয়েছে। উপরের লিপিটি অনেকদিনের পরিচিত হলেও তখনও অজ্ঞাত, মধ্যবর্তীটি সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং শেষেরটি গ্রীক লিপি।

নেপোলিয়নের কয়েকজন অফিসার গ্রীক জানতেন। তাঁরা তখনই গ্রীক লিপিটি পড়লেন। লিপিটি ছিল খৃঃ পূঃ ১৯৬ সালে ৫ম টলেমি

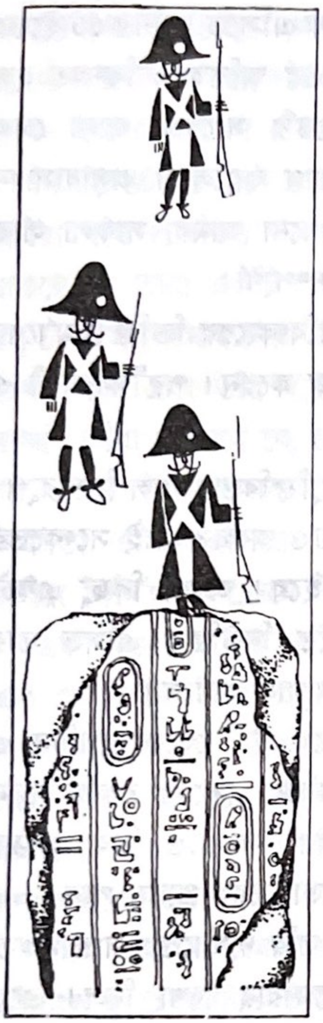

ইপিফানিস কর্তৃক মেমফিসের পুরোহিতদের মন্দিরগুলির সুবিধার্থে মঙ্গলসাধনের কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁদের প্রদত্ত একটি খোদাই করা অনুশাসন যার বলে 'রাজা ও তাঁর পূর্বপুরুষদের মিসরীয় পবিত্র স্থানে দেয় সম্মানসূচক অধিকার বৃদ্ধি পাবে'। তাছাড়া আরও নির্দেশ ছিল যে, এই অনুশাসন এতদঞ্চলীয় অধিবাসীদের প্রাচীন 'ধর্মীয়, দেশী ও গ্রীক লিপিতে' একটি স্মৃতিফলকে উৎকীর্ণ হচ্ছে। এর অর্থ এই তিনটি লিপিই সমার্থবোধক। পণ্ডিতরা বহু শতাব্দী ধরে এমন স্বপ্নই দেখেছিলেন। দ্বিভাষিক রচনামাত্রেই দুই ভাষায় লিখিত সমান্তরাল রচনা এবং এর একটি জানা থাকে। এখানে বিবৃতিটি দ্বিভাষিক নয়, ত্রিভাষিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও চিত্রলিপিটির পাঠোদ্ধার সহজ ছিল না। রসেটা শিলা ও পরে মিসরীয় চিত্রলিপির মর্মোদ্ধারের কাহিনী আমি বর্ণনা করব না। এখানে স্মর্তব্য যে, রসেটা শিলার আবিষ্কারের ফলেই মিসরীয় লিপির পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়েছিল।

আজ অন্যান্য বহু প্রাচীন ও অজ্ঞাত লিপিও পঠিত হয়েছে। আমরা যদি এগুলির পাঠোদ্ধারের ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে দেখব দ্বিভাষিক লিপির আবিষ্কার প্রায় সর্বত্রই নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করেছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, জানা ভাষার লিপির অর্থোদ্ধারে ভাষাসংযুতির নীতিনির্ভর পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ প্রযোজ্য। কিন্তু অজ্ঞাত ভাষার লিপিপাঠে দ্বিভাষিক রচনার সাহায্য প্রয়োজন। বংশাণুসংকেত স্পষ্টতই দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত, কারণ আমরা ডি-এন-এ'র 'ভাষা' সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। বস্তুত এজন্য একটি দ্বিভাষিক রচনা অপরিহার্য। যে উপাত্ত থেকে প্রোটিনের এমিনোএসিড এবং ডি-এন-এ'র নিউক্লিওটাইড উভয়ের অনুক্রম নির্ণীত, তা থেকেই সেটি পাওয়া সম্ভবপর। কিন্তু! আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন প্রোটিনে

এমিনোএসিডের অনুক্রমনির্ণয় শুরু হলেও নিউক্লিক এসিডে নিউক্লিওটাইডের অনুক্রম অজ্ঞাত ছিল। আর যখনই বংশাণুসংকেতের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হল এবং নিউক্লিওটাইড ও এমিনোএসিডের পারম্পর্যের সংযোগ জানা গেল বিজ্ঞানীরা তখনই এর অর্থোদ্ধারে সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। অসাধ্যসাধন করেছেন তাঁরা। নিউক্লিক এসিডের লিপিপাঠে এখনো আমরা সাফল্য লাভ করি নি, কিন্তু বংশাণুসংকেতের পাঠোদ্ধার আজ সুসম্পূর্ণ।

সাফল্যটি রাতারাতি অর্জিত হয় নি। বিরাট আবিষ্কারের ভিত্তি নির্মাণের জন্য দলে দলে লোক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কাজ করেন। পরীক্ষাকারী ও তাত্ত্বিক উভয়ই এই কর্মযজ্ঞের শরিক।

তাত্ত্বিকরাই প্রথমে কাজ শুরু করলেন। তাঁদের যুক্তিবিস্তার ছিল নিম্নরূপ: যেহেতু দ্বিভাষিক কোন রচনা হাতে নেই এবং ভাষাও অজ্ঞাত তাই সংকেতের ভাষাটি যেন জানা, তা ভেবেই আমাদের এগুতে হবে। অবশ্য কিছু একটা অবলম্বন প্রয়োজন যাতে যে 'ব্যাকরণের' ভিত্তিতে নিউক্লিক এসিড তার প্রোটিন-নির্মাতা 'শ্রমিকদের' আদেশ পাঠায় তা অনুমান করা যায়।

আমরা জানি গামভ ঠিক কাজ করেছিলেন। যে 'ইট' থেকে প্রোটিন ও নিউক্লিক এসিড উভয়ই তৈরি তাদের পারস্পরিক অভিন্ন দূরত্বের তথ্যটি তিনি 'আঁকড়ে ধরেছিলেন' এবং তাঁর অনুমিত 'রম্বিক' সংখ্যাও ছিল সঠিক প্রয়োজনানুগ — সেই ২০। অতঃপর তিনি সংকেতোদ্ধারের প্রয়াস পান।

কিন্তু সংকেত উদ্ধারে গামভ ভুল করেছিলেন। তাঁর দৃষ্টান্তের সংক্রামকতা অচিরেই প্রমাণিত হল। একই ধরনের কাজের জোয়ার দেখা দিল। এতে সমস্যার সমাধান না হলেও ব্যর্থ হল না কোনটিই। কারণ, এদের প্রতিটি প্রচেষ্টা ক্রমেই লক্ষ্যের সমীপবর্তী হচ্ছিল। আমি এদের একটিই শুধু বর্ণনা করব যার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য এবং তা সদর্থক ও নঞর্থক উভয়তই।

গামভের অনুগামীরা তাঁরই মতো একই ভুলের শিকারে পরিণত হয়েছিলেন। দেখা গেল, সংকেত প্রাবরিত হয় না। প্রতিবেশী এমিনোএসিডের সংকেত লিখিত হয় অসম্পর্কিত নিউক্লিওটাইড পুঞ্জে। নতুনতর জটিলতার শুরু এখানেই। একটি এমিনোএসিডের সংকেতলিখনের জন্য ক'টি নিউক্লিওটাইড প্রয়োজন? নিউক্লিওটাইডের সংখ্যা চার ও এমিনোএসিডের কুড়ি। তাই একটি নিউক্লিওটাইড দিয়ে মাত্র চারটি এমিনোএসিডের সংকেতলিখন সম্ভব। যদি একটি এমিনোএসিডের জন্য দুটি নিউক্লিওটাইড ধরা যায় তবে সম্ভাব্য ১৬টি সমাবন্ধ পাওয়া যাবে এবং তা পর্যাপ্ত নয়। যদি

তিনটি নিউক্লিওটাইড নেয়া যায় তবে সমাবন্ধের সংখ্যা হবে ৬৪ এবং তা যথেষ্ট। এর অর্থ প্রতিটি এমিনোএসিডের জন্য নির্ধারিত নিউক্লিওটাইডের সংখ্যা কমপক্ষে তিন (বিজ্ঞানীরা একে ট্রিপলেট বা ত্রয়ী বলেন)।

নিউক্লিওটাইড ত্রয়ী একটি এমিনোএসিডের তিন গুণ স্থান অধিকার করে। ত্রয়ীরা যদি প্রাবরিত না হয় তবে এমিনোএসিড পরস্পর থেকে এত দূরে থাকবে যে, তারা একটি প্রোটিনশৃঙ্খলে যুক্ত হতে পারবে না। ১৯৫৭ সালে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের একটি প্রস্তাব প্রকাশিত হল। এর রচয়িতা ফ্রেন্সিস ক্রিক স্বয়ং এবং তাঁর দুই সহকর্মী গ্রিফিথ ও অর্‌জেল। সমাধানটি অতি সরল। তাঁরা বললেন যে, ত্রয়ীর সঙ্গে এমিনোএসিডের সম্পর্ক মোটেই প্রত্যক্ষ নয়, এজন্য বিশেষ অণু ('অভিযোজক') প্রয়োজন, যার এক প্রান্ত প্রোটিনের নির্মাতা এমিনোএসিডে এবং অন্য প্রান্ত নিউক্লিক এসিডে যুক্ত, যেখানে ত্রয়ীরা নির্দিষ্ট অনুক্রমে বিন্যস্ত। এজন্য 'অভিযোজক' অবশ্য দীর্ঘায়ত হবে।

এক বছরের মধ্যেই 'অভিযোজক' প্রকল্পের যাথার্থ্য সত্যায়িত হল। নতুন এক প্রকার নিউক্লিক এসিড খুঁজে পাওয়া গেল যা প্রথমে দ্রাব্য আর-এন-এ নামে চিহ্নিত হল। এর বর্তমান সাধারণ নাম পরিবাহী আর-এন-এ। দেখা গেল, ক্রিক ও তাঁর সহকর্মীরা তাঁদের কল্পিত 'অভিযোজকের' উপর যে কর্মভার আরোপিত করেছিলেন পরিবাহী আর-এন-এ'র অণুরা ঠিক তাই সম্পাদন করছে।

প্রথম প্রশ্নের সমাধান থেকে প্রত্যক্ষ উদ্‌গত অন্যতর একটি প্রশ্নের মীমাংসাও প্রবন্ধটিতে নির্দেশিত ছিল। গামভের রম্বিক সঙ্কেতটি প্রাবরক শ্রেণীর ছিল বলেই পর্যাপ্ত অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ, তার পক্ষে ভুল স্থানে গেঁথে যাওয়া সম্ভবপর যার ফলে যে প্রোটিনের প্রয়োজন নেই, তাই তৈরি হবে কিংবা কোনটিই তৈরি হবে না।

তাহলে এর সমাধান কী? সম্ভবত এখানে 'যতিচিহ্নের' ('কমা') অস্তিত্ব সহজেই অনুমেয় যার ফলে একটি ত্রয়ীর শুরু ও অন্যটির শেষ সুচিহ্নিত থাকবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত রাসায়নিক তথ্যাদি ছিল 'কমা' অস্তিত্বের বিরুদ্ধে। ক্রিক, গ্রিফিথ ও অরজেলের নিবন্ধের নাম ছিল 'কমাবিহীন সঙ্কেত'। নিউক্লিক এসিডে লিপিবদ্ধ একক অর্থবহ তথ্য 'পঠন' প্রসঙ্গে তাঁরা নিম্নোল্লেখিত ধারণাটি উপস্থাপিত করেন: সঙ্কেত এমনভাবে তৈরি হবে যে, এর ভুল 'পঠনের' কোন অবকাশ থাকবে না।

হিসাব অনুসারে দেখা যায় যে, এধরনের সঙ্কেত নির্মাণ সম্ভব। এর

সবিশেষ আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে সঠিক বিশটি 'শব্দের' (ঠিক যেক'টি প্রয়োজন!) এক 'শব্দতালিকা' পাওয়া যায়। প্রকল্পটি আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসম্মত মনে হয়েছিল। আর ক্রিকও তখন খ্যাতির উচ্চাসনে। তাছাড়া 'অভিযোজক' প্রকল্পের সত্যতা প্রমাণিত হবার পর এর যাথার্থ্য সম্পর্কে সন্দেহও অনেকাংশে দূর হল। কিন্তু দেখা গেল প্রকল্পটি অশুদ্ধ। কিন্তু স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গেই এ ধারার গবেষণায় বেগ সঞ্চারিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য তা ভ্রান্ত পথে।

পর্যাপ্ত পরিমাণ তাত্ত্বিক গবেষণা সত্ত্বেও শুধুমাত্র এদের বদৌলতেই সমস্যার সমাধান হল না। এখানে পরীক্ষারত বিজ্ঞানীদেরও বক্তব্য ছিল। এমন কি ডি-এন-এ যে স্বপ্রজননক্ষম এবং প্রোটিনের সংযুতিনির্ধারক এসব মৌল প্রস্তাবের সত্যতা তখনো প্রমাণিত নয়। তাছাড়াও প্রয়োজন ছিল সংকেতের অর্থোদ্ধারের জন্য পরীক্ষামূলক কোন পদ্ধতি অবিষ্কার।

মানুষের তৈরি নিউক্লিক এসিড

আপনারা কি বাস্কদের কথা জানেন? অতি প্রাচীন জনগোষ্ঠীর বংশধর এরা এবং তাদের সংখ্যা দশ লক্ষের বেশী নয়। স্বাধীনতাপ্রিয় এই জনগোষ্ঠীর একজন প্রতিনিধি অণুজীববিদ্যায় উল্লেখ্যসংখ্যক মৌলিক অবদান সংযোজিত করেছিলেন।

তাঁর নাম সেভেরো অচয়া। উত্তর স্পেনের আস্টুরিয়া প্রদেশে লুয়ার্কা গ্রামে তাঁর জন্ম, ১৯০৫ সালে। ১৯৩৬ সাল অবধি তিনি তাঁর স্বদেশেই কাজ করেছেন। তিনি তখন মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীরবৃত্ত বিভাগের অধ্যক্ষ। জেনারেল ফ্রাঙ্কোর ফ্যাশিস্ট বিদ্রোহের পর তিনি চিরদিনের জন্য দেশত্যাগ করেন। প্রথমে গেলেন জার্মানির হাইডেলবার্গে, মায়ারহফের পরীক্ষাগারে, ১৯৩৭ সালে গ্রেট ব্রিটেনে এবং শেষে ১৯৪১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। নিজের অসুবিধা সত্ত্বেও অচয়া যে কাজ করেছিলেন তার গুরুত্ব তুলনাহীন। আমরা তাঁর বিশেষীকৃত গবেষণাগুলির অধিকাংশই এড়িয়ে যাব। আমাদের কাহিনী শুরু হবে ১৯৫৫ সাল থেকে। তাঁর নাম তখন জৈবরসায়নবিদ মহলে শ্রদ্ধাভরে উচ্চারিত।

কৃত্রিম পুনরুৎপাদন ব্যতিরেকে কোন প্রাকৃতিক প্রকরণকেই সুপরিজ্ঞাত বলা যায় না। সংশ্লেষ মাধ্যমে নিউক্লিক এসিড উৎপাদনের গৌরব অর্জন করেন

সেভেরো অচয়া। ১৯৫৫ সালে তাঁর গবেষণায় সহযোগী মারিয়ান গ্রুনবার্গ-মানাগোর সঙ্গে একযোগে কাজ করে তিনি ব্যাক্টেরীয় কোষ থেকে এক অজ্ঞাত নতুন উৎসেচক আলাদা করেন। এটি ছিল বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এর উপস্থিতিতে একক নিউক্লিওটাইডরা দীর্ঘ শৃঙ্খলে যুক্ত হয়ে অবিকল স্বাভাবিক আর-এন-এ'সদৃশ পলিমারে পর্যবসিত হত। অবশ্য সেজন্য অসাধারণ নিউক্লিওটাইড অপরিহার্য ছিল এবং এদের সংযোজনে শক্তি ব্যয় হত অনেক। জৈবপ্রক্রিয়ার শক্তি সাধারণত ফসফেটবন্ধে সঞ্চিত থাকে এবং অতিরিক্ত ফসফেট পুঞ্জধর নিউক্লিওটাইডই আর-এন-এ তৈরিতে প্রযুক্ত হয়। তারা বিচ্ছিন্ন হলেই প্রয়োজনীয় শক্তিক্ষরণ ঘটে।

সন্দেহ নেই, একটি উল্লেখ্য বিজয়। কারণ, নিউক্লিক এসিডের উপর সক্রিয় আধিপত্য বিস্তারে মানুষের এটিই প্রথম পদক্ষেপ। আবিষ্কারটির জন্য ১৯৫৯ সালে অচয়া নোবেল পুরস্কার পেলেন। কিন্তু কথিত গুরুত্বের চেয়ে তাঁর কাজ ছিল অধিকতর তাৎপর্যশীল। তাঁর গবেষণা বংশাণুসংকেতের অর্থোদ্ধারে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল আমরা শীঘ্রই তা জানতে পারব।

আরো গবেষণার ফলে জানা গেল, যে ব্যাক্টেরিয়া থেকে প্রথম উৎসেচকটি আবিষ্কৃত হয়েছিল এর অস্তিত্ব শুধু ব্যাক্টেরিয়া বিশেষেই সীমিত নয়। প্রাকৃতিক নিয়মের সর্বজনীনতা বিধায় তা ছিল একান্ত প্রত্যাশিত। কিন্তু এ তো কেবল আর-এন-এ মাত্র। এ পদ্ধতিতে ডি-এন-এ সংশ্লেষের চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছিল। কিন্তু টেস্ট-টিউবে ডি-এন-এ উৎপাদনের জন্য আর দীর্ঘকাল আমাদের অপেক্ষা করতে হয় নি। প্রক্রিয়াটি বহুলাংশে আর-এন-এ'র অনুরূপই ছিল। কিন্তু এর খুঁটিনাটির একটি দিক নীতিগতভাবে আলাদা ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এখানে নতুন ডি-এন-এ অণুর গ্রন্থনায় উপস্থিত ডি-এন-এ অবয়বকে উপকরণস্বরূপ (প্রাইমিং) ব্যবহার করা প্রয়োজন। অন্যথা সংশ্লেষ নিষ্ক্রীয় থাকে। অথচ সামান্য পরিমাণে তা যোগ করলেই সংশ্লেষ শুরু হয়।

ক্রিক ও ওয়াটসনের প্রকল্প অনুসারে ডি-এন-এ স্বপ্রজননক্ষম। কিন্তু প্রাইমিং-এর অন্যতর ভূমিকা থাকাও সম্ভব। আর্থার কর্নবার্গ ও তাঁর সহযোগীরা পদ্ধতিটির আবিষ্কারক। তাঁরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এর উৎপাদ পরীক্ষা করে দেখলেন যে, নতুন ডি-এন-এ সকল বৈশিষ্ট্যেই প্রাইমিং-এর অনুরূপ।

শেষ অবধি কার্যত অণুর স্বপ্রজনন ক্ষমতা এবং তার বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণিত হল। কল্‌ৎসোভের 'অণু থেকেই প্রত্যেক অণু' সেই বিখ্যাত ঘোষণার প্রায়

ত্রিশ বছর পর তা সত্যায়িত হল। আর অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের সম্ভাব্য অধিকারী হিসেবে ডি-এন-এ'কে সনাক্ত ও জীবনপ্রক্রিয়ার উৎস হিসেবে তাকে চিহ্নিত করেন ক্রিক ও ওয়াটসন মাত্র এর তিন বছর পর।

সুতরাং তাত্ত্বিকদের একটি ভবিষ্যদ্বাণী প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা সত্যায়িত হল। ডি-এন-এ যে স্বপ্রজননক্ষম তা দেখানো গেল। নিউক্লিক এসিড যে প্রোটিন অণুর স্বকীয় চারিত্র্য নির্ধারণ করে কেবল তা প্রমাণই করাই বাকী রইল। তবু সমাধানটি বিলম্বিত হয়েছিল। অবশ্য অনেক বিজ্ঞানীই প্রোটিন সংশ্লেষে নিউক্লিক এসিডের বিবিধ ভূমিকার কোন না কোন 'আভাস' পেয়েছিলেন। কিন্তু এর কোনটিই প্রামাণ্য ছিল না। অতঃপর ১৯৬১ সালে এর অবিসংবাদিত প্রথম প্রমাণ মিলল। দুনিয়াজোড়া সকলে তখন দুটি স্বতন্ত্র প্রমাণের কথা জানলেন। দুটি সংবাদই মস্কোয় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক জৈবরসায়ন কংগ্রেসে প্রথম ঘোষিত হয়।

তামাক-মোজাইক ভাইরাসের প্রতি বহুদিন থেকেই বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। জার্মান উদ্ভিদবিজ্ঞানী মেল্‌খার্স'ও তাতে আগ্রহী হন। গত যুদ্ধের আগে থেকেই বার্লিনের শহরতলী ডালেমের জীববিদ্যা ইনস্টিটিউটে তিনি তা নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। ১৯৪২ সালে তিনি ভাইরাসটির একটি আকর্ষী মিউটেশন বর্ণনা করেন। পরে তিনি ও রাসায়নিক গেরহার্ড শ্রাম (যিনি পরে বিশুদ্ধ নিউক্লিক এসিডের সাহায্যে তামাক-মোজাইক ব্যাধির সংক্রমণ ঘটান) একযোগে এর প্রজননপ্রক্রিয়া পরীক্ষা করেন। তামাকগাছের কোষ থেকে ভাইরাসটি কীভাবে তার নির্মাণোপকরণ সংগ্রহ করে তেজস্ক্রিয় ফসফরাসের সাহায্যে চিহ্নিতকরণ ব্যবস্থায় তাঁরা তা নির্ধারণে সচেষ্ট হন। তবে তা ছিল সূচনামাত্র।

যুদ্ধের পরে মেল্‌খার্স ও শ্রাম মধ্যযুগীয় শহর টিউবিঙ্গেনে বসবাস শুরু করলেন। সেখানে বিভিন্ন ইনস্টিটিউটে কর্মরত থাকলেও তাঁরা তাঁদের যৌথ গবেষণা আবার শুরু করলেন। শ্রাম তাঁর তরুণ সহকর্মী গিরারের সঙ্গে আর-এন-এ'র উপর নাইট্রাস এসিডের বিক্রিয়া পরীক্ষা করছিলেন। পদার্থ হিসেবে নাইট্রাস এসিড অতি সরল। তাই এর কার্যকারিতার প্রকৃতি বিশ্লেষণ কঠিন হল না। দেখা গেল, আর-এন-এ'র উপর এর প্রভাব অতি সামান্য। এর প্রভাবে আর-এন-এ'র অন্যতম ক্ষার সাইটোসিন ইউরাসিল-এ এবং অন্যটি এডিনিন, গোয়ানিনে রূপান্তরিত হল। আর-এন-এ'র উপর নাইট্রাস এসিডের প্রভাব এতটুকুই, এর বেশী নয়। এসব সঠিক রাসায়নিক তথ্যাবলী।

যে তামাক-মোজাইক ভাইরাসের উপাদান মূলত আর-এন-এ, তার উপর নাইট্রাস এসিডের প্রভাব লক্ষ্য করা অবশ্যই আকর্ষী প্রস্তাব। পরীক্ষাগুলি নিষ্পাদিত হল এবং এতে ভাইরাসের অত্যুগ্রতা বহুলাংশে খর্বিত হল। কিন্তু পরিবর্তিত বংশানুসৃত চারিত্র্যের বহু মিউটেশনাক্রান্ত ভাইরাসের উদ্ভবই ছিল এর সর্বাধিক আকর্ষণীয় ঘটনা। দেখা গেল, আর-এন-এ'র পরিবর্তনে ভাইরাসের বংশানুসৃত চারিত্র্যেরও পরিবর্তন ঘটে।

মেল্‌খার্সের ল্যাবরেটরিতেই পরিবর্তনের স্বরূপগুলি পরীক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু সেজন্য প্রয়োজন প্রচুর শ্রমের, আর তাতে বাজে খরচ না হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল। মেল্‌খার্স তাঁর কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত করেছিলেন কর্মীদলের তরুণ পদার্থবিদ ভিট্‌মানের উপর (সমকালীন অধিকাংশ অণুজীববিদদের মতো তাঁকেও প্রাক্তন পদার্থবিদ বলাই অধিক সঙ্গত)। তামাক-মোজাইক ভাইরাসকে (অথবা এ থেকে পৃথকীকৃত আর-এন-এ) নাইট্রাস এসিডে প্রভাবিত করে তামাকগাছে তার সংক্রমণ ঘটানো হত। নানাভাবে চিত্রিত মোজাইক যথাসময়ে পাতায় দেখা দিত। খালি চোখে দেখা গেলেও এসব চিহ্নের প্রতিটিই এক-একটি ভাইরাস কণা থেকে উৎপন্ন হত এবং একটি চিহ্নের সকল ভাইরাসই ছিল অভিন্ন। মিউটেশনের ফলে ভাইরাস পরিবর্তিত ধরনের মোজাইক উৎপন্ন করত। এভাবে পরিবর্তিত চিহ্নের প্রতিটিই আলাদাভাবে কেটে এবং বারবার গাছে সংক্রমণ ঘটিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ ভাইরাস সংগৃহীত হত, যাতে এদের পুঙ্খানুপুঙ্খ রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা ভাইরাস-প্রোটিনে এমিনোএসিডের সঠিক বিন্যাসনির্ণয় সম্ভবপর হয়। কিন্তু এই প্রোটিনের অণুতে এগুলির সংখ্যা ছিল ১৫৮। সুতরাং তা অসাধ্যসাধন বৈকি। তবু ফলাফল হল খুবই সন্তোষজনক।

দেখা গেল, যে সকল ভাইরাসে বংশানুসৃত পরিবর্তন সঞ্চারিত হয়েছে তাদের প্রোটিনও বদলে গেছে এবং সাধারণত মাত্র একটি এমিনোএসিডই রূপান্তরিত হয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে এমিনোএসিড থ্রিয়োনিন উল্লেখ্য। স্বাভাবিক ভাইরাস প্রোটিনে এর অবস্থানক্রম ৫৯। কিন্তু বিশেষ একটি মিউটেশনগ্রস্ত ভাইরাসে আইসোলিউসিন এর স্থলবর্তী হয় অথচ উভয় প্রকারেই অন্য ১৫৭টি এমিনোএসিডের অবস্থানগত কোনই পরিবর্তন ঘটে না। মাত্র এই একটি তথ্য থেকেই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উত্তরণ সম্ভব।

প্রথমত, পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হল যে বংশানুসৃত পরিবর্তনই উভয় প্রকার ভাইরাসের পরিবর্তনের কারণ। দ্বিতীয়ত, প্রোটিন অণুর সামান্যতম

পরিবর্তন বাহ্য চারিত্রের পরিবর্তন ঘটানোর জন্য যথেষ্ট। তৃতীয়ত (এবং এটাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত), যেহেতু নাইট্রাস এসিডের প্রভাবে আর-এন-এ'র একপ্রকার ক্ষার অন্যদের স্থলবর্তী হয় ও এরই ফলে পরিবর্তন ঘটে প্রোটিনে, কাজেই দেখা যাচ্ছে, প্রোটিনে এমিনোএসিডের অনুক্রম নিউক্লিক এসিডে নিউক্লিওটাইডের অনুক্রম দ্বারাই নির্ণীত হয়। এভাবেই পরীক্ষাসিদ্ধ হল গামভের প্রকল্প।

গামভের প্রকল্প ছিল ডি-এন-এ সম্পর্কে, আর-এন-এ সম্পর্কে নয়। অবশ্য উচ্চতর প্রাণীকোষের প্রোটিন ও ডি-এন-এ'যুক্ত ক্রমোসোমই কেবল তখনকার আলোচ্য বিষয় ছিল। ভাইরাস তো সরলতম জীবন্ত সত্তা, এর কোষ পর্যন্ত নেই। জড় ও প্রাণের সীমান্তরেখায় এর অবস্থান। স্বাভাবিকভাবেই এতে নিউক্লিয়াস নেই, ক্রমোসোমও নেই। এখানে নিউক্লিক এসিডের আলাদা আলাদা অণু ক্রমোসোমের ভূমিকা পালন করে। অধিকাংশ উদ্ভিদ ভাইরাসই ডি-এন-এ'হীন, কিন্তু অন্যত্র ডি-এন-এ যে ভূমিকা পালন করে এখানে আর-এন-এ তারই স্থলবর্তী।

মস্কো কংগ্রেসেই তামাকের মোজাইক ভাইরাস সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার ফল ভিট্‌মান প্রকাশ করেছিলেন।

নিরেনবার্গের মহাসাফল্য

কিন্তু নিরেনবার্গের রিপোর্টই মস্কো কংগ্রেসে সর্বাধিক আলোড়ন সৃষ্টি করে। সেই ১৯৫৭ সালে আন্দ্রেই বেলোজেরস্কি ডি-এন-এ এবং আর-এন-এ'র তুলনামূলক বিশ্লেষণের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন (তিনি নিউক্লিক এসিডের চতুঃনিউক্লিওটাইড প্রকল্পের ভ্রান্ততা প্রমাণিত করেছিলেন)। কাজটির দায়িত্ব তাঁর প্রতিভাবান ছাত্র আলেক্সান্দর স্পিরিনের উপর ন্যস্ত ছিল। বহুসংখ্যক ব্যাক্টেরিয়া পরীক্ষার পর স্পিরিন দেখলেন ডি-এন-এ সংস্থিতির ব্যাপক পার্থক্য সত্ত্বেও এদের সবগুলিতেই আর-এন-এ মোটামুটি অভিন্ন। মোটামুটি, কিন্তু সম্পূর্ণ অভিন্ন নয়। তাছাড়া একই ব্যাক্টেরিয়ায় ডি-এন-এ ও আর-এন-এ'র সংস্থিতির সাদৃশ্যও উল্লেখ্য। কিন্তু কেন?

বেলোজেরস্কি ও স্পিরিনের ব্যাখ্যা নিম্নরূপ। বিশ্লিষ্ট আর-এন-এ একটি মিশ্রণ; এর প্রধান অংশ সকল ব্যাক্টেরিয়াতেই অভিন্ন, কিন্তু এর ক্ষুদ্রতর অংশ

ডি-এন-এ'র সংস্থিতির প্রতিষঙ্গী। অত্যন্ত কৌতূহলী ফল। এখানে লক্ষণীয় যে, ডি-এন-এ'বাহী ক্রমোসোম নিউক্লিয়াসবাসী অথচ প্রোটিনের সংশ্লেষস্থল কোষপ্লাজ্‌মে অবস্থিত। যদি ডি-এন-এ'র সমসংস্থিতিযুক্ত কোন আর-এন-এ থাকে তবে তা নিউক্লিয়াস থেকে কোষপ্লাজ্‌মে বার্তাবহের ভূমিকা পালন করতে পারে।

অচিরেই বেলোজেরস্কি — স্পিরিন প্রকল্প সত্যায়িত হল। ১৯৬১ সালে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হল যে আর-এন-এ নিউক্লিয়াসেই তৈরি এবং এতে ডি-এন-এ'র সংস্থিতি ও নিউক্লিওটাইডবিন্যাস অনুকৃত হয়। একে বার্তাবাহী আর-এন-এ বলা হল।

অতঃপর জীবন্ত কোষে প্রোটিন সংশ্লেষের গতি সাধারণভাবে প্রতীয়মান হতে লাগল। ক্রমোসোমস্থ ডি-এন-এ'র মধ্যেই প্রোটিন সংস্থিতির সঙ্কেত চিহ্নিত থাকে এবং এর অঙ্গীভূত নিউক্লিওটাইডের অনুক্রমরূপে তা 'লিপিবদ্ধ' হয়। এ তথ্য বার্তাবাহী আর-এন-এ মাধ্যমেই কোষপ্লাজ্‌মে পরিবাহিত হয়। আর-এন-এ অণু নিউক্লিয়াস ত্যাগ করে রাইবোসোম নামক একপ্রকার বিশেষ ক্ষুদ্র কণায় আসঞ্জিত হয়। রাইবোসোমপৃষ্ঠই এমিনোএসিড থেকে প্রোটিনের গ্রন্থনস্থল। এখানে এমিনোএসিড পরস্পর যুক্ত হবার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তিঘাতে 'সক্রিয়' হয়। অতঃপর এগুলি পরিবাহী আর-এন-এ অণুর সঙ্গে যুক্ত হয়, যা তাদের যথাস্থানে সংস্থাপিত করে। এসকল প্রত্যয় ১৯৬১ সালেই সত্য মনে হচ্ছিল, যদিও পূর্ববর্ণিত প্রকরণের সঠিক চূড়ান্ত কোন সাক্ষ্য তখনো হস্তগত হয় নি।

জীবন্ত কোষের বাইরে প্রোটিন সংশ্লেষের প্রয়োজনীয় শর্তাবলী অনুকরণের চেষ্টা করেন নিরেনবার্গ। এমিনোএসিড, পরিবাহী আর-এন-এ, প্রয়োজনীয় উৎসেচক, রাসায়নিক শক্তির উপকরণ, রাইবোসোম — এসব কিছুর একটি সম্পূর্ণ পূরক তিনি নেন। দেখা গেল, মিশ্রণটিকে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় দীর্ঘকাল রাখলেও এতে কোন প্রোটিনেরই সংশ্লেষ ঘটে না, কিন্তু আর-এন-এ'র বৃহদায়তন অণু যোগ করলেই দ্রুত প্রোটিনের সংশ্লেষ শুরু হয়। ভাইরাস বা ইস্টের আর-এন-এ ব্যবহারেও সমান সুফল পাওয়া গেল।

কিন্তু নিরেনবার্গের রিপোর্টের এটুকুই শেষ কথা নয়। অচয়ার পদ্ধতি প্রয়োগ করে জৈবরাসায়নিকরা তখন সংশ্লেষিত আর-এন-এ সংগ্রহে সক্ষম হয়েছিলেন। নিরেনবার্গ প্রাকৃতিক আর-এন-এ'র বদলে কৃত্রিমটি যোগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। 'ঘরে তৈরি' আর-এন-এ'র সান্নিধ্যেই গঠিত হল

UUUUUUUUUUUUUUU

প্রোটিন। প্রসঙ্গত, সংশ্লেষিত আর-এন-এ ও প্রাকৃতিক আর-এন-এ'র ঈষৎ পার্থক্য উল্লেখ্য। প্রাকৃতিক আর-এন-এ'তে চারটি নিউক্লিওটাইডই প্রায় সমপরিমাণে বর্তমান। কিন্তু নিরেনবার্গ ব্যবহৃত আর-এন-এ ছিল পলিইউরিডাইলিক এসিড, অর্থাৎ কেবলমাত্র ইউরাসিলের U একক নিউক্লিওটাইডলগ্ন আর-এন-এ।

কথান্তরে বলা যায়, প্রোটিনের সংশ্লেষস্থলে তাঁরা যে বার্তাবহ পাঠিয়েছিলেন তার দেয়া বার্তা ছিল একঘেয়ে, অনেকটা এরকম — UUUUUUUUUU UUUUU...

তা সত্ত্বেও প্রোটিন তৈরি হচ্ছিল।

ঠিক যেমনটি সংবাদ পাঠানো হয়েছিল এও হল তেমনি — একেবারে অভিন্নরূপ। এর সব এমিনোএসিডই হুবহু এক অথচ এদের ২০টির সবক'টিই টেস্ট-টিউবে ছিল আর যেকোনটিকেই পছন্দ করা চলত। কিন্তু এবার প্রয়োজন ছিল কেবল একটিমাত্র এমিনোএসিড — ফেনাইল্যালানিন-এর। প্রোটিনের সূত্র তিন অক্ষরে চিহ্নিত, আর হাইফেন দ্বারা পৃথকীকৃত এমিনোএসিডের প্রতীকে তা লেখাই নিয়ম।* সুতরাং নিরেনবার্গ ও মাথেয়াই-এর পরীক্ষালব্ধ প্রোটিনের সূত্র phe-phe-phe-phe-phe...

---

* যেমন অ্যালানিন — ala, থ্রিয়োনিন — thr, গ্লাইসিন — gly, সিস্টেইন — cys, ফেনাইল্যালানিন — phe ইত্যাদি। অ্যালানিন, গ্লাইসিন ও সিস্টেইনধারী একটি প্রোটিনের সূত্রলেখ: ala-gly-cys.

এধরনের কোন বস্তু প্রকৃতির ভাণ্ডারে নেই, যেমন নেই একঘেয়ে UUUUU... জাতীয় কিছুর অস্তিত্ব।

নিরেনবার্গের পরীক্ষার ফল বিজ্ঞানীদের কাছে খাঁটি 'রসেটা শিলা' হয়ে উঠল। প্রকৃতির ভাণ্ডারে এমন শিলা নেই, তাই বিজ্ঞানীদেরই তা তৈরি করতে হল। এখন তাঁরা আর-এন-এ এবং প্রোটিন উভয় ভাষার দ্বিভাষিক এক লিপির খোঁজ পেলেন। তা অনেকটা এরূপ:

. . . UUUUUUUUUUUUUUU . . .
. . . phe-phe-phe-phe . . .

এদের তুলনা করলে স্পষ্ট দেখা যায় যে, ফেনাইল্যালানিন একাধিক U অনুক্রমের একটি সংকেত। কিন্তু সংকেত ত্রয়ী বিধায় বংশাণুবিদ্যার জৈবরাসায়নিক অভিধানে প্রথম লিপিভুক্ত বিষয় হিসেবে যে কেউ নির্দ্বিধায় লিখতে পারেন: UUU — ফেনাইল্যালানিন।

তখনই কংগ্রেসে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, এ লক্ষ্যেই বংশাণুসংকেতের অর্থোদ্ধার প্রত্যাসন্ন।

নিউক্লিক এসিডই যে বংশানুসৃত তথ্যের ভাণ্ডার অতঃপর সেসম্পর্কে আর কারও কোন সন্দেহ ছিল না। পরিত্যক্ত ব্যাণ্ডেজ থেকে তরুণ মিশার কর্তৃক একটি নতুন উপাদান নিউক্লিইন আবিষ্কারের পর আজ শতাধিক বৎসর অতিক্রান্ত। চার বছর পর মিশার তা থেকে নিউক্লিক এসিড পৃথক করেছিলেন। বহু দশক ধরে সে ছিল বিজ্ঞানে উপেক্ষিতা। কিন্তু মান্যতমেরাও আজ প্রাক্তন এই সিণ্ডারেলার পাণীপ্রার্থী। নিউক্লিক এসিড আজ 'পয়লা নম্বর পদার্থ'।

বংশানুস্মৃতির অ-আ, ক-খ

নববর্ষে অপ্রত্যাশিত উপহার

ফ্রেন্সিস ক্রিকও মস্কো কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এখানে কোন প্রবন্ধ পাঠ করলেন না। এতে কেউ অবাক হয় নি। ইতিমধ্যে অনেক কিছুই তো তিনি করেছেন: ডি-এন-এ মহাণুর সংস্থিতি, 'অভিযোজক' প্রকল্প, 'কমাবিহীন সংকেত'... কিন্তু দেশে ফিরে গিয়ে সহযোগীদের নববর্ষ উপলক্ষে তিনি চমৎকার একটি 'উপহার' দিলেন। উপহারটি ছিল এল. বার্নেট, এস. ব্রেনার এবং আর. জে. ওয়াটস্-টবিনের সঙ্গে লিখিত ও ১৯৬১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর 'নেচার'এ প্রকাশিত তাঁর একটি নতুন নিবন্ধ।

দীর্ঘ ও বিশেষজ্ঞের পক্ষেও দুর্বোধ্য এই প্রবন্ধটির সিদ্ধান্তগুলি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক ছিল। তাঁরা বংশাণুসংকেতের সংযুক্তি সম্পর্কে বলেছিলেন। এখানে ত্রয়ীর অর্থ আলোচিত হয় নি। কিন্তু তা তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। এর কারণ, ফেনাইল্যালানিনের UUU ত্রয়ীধৃত সংকেত তখনো অনুমানের স্তর উত্তীর্ণ হয় নি। পূর্বোক্ত সংকেত যে UU দ্বয়ী, UUUU চতুষ্টয়ী অথবা U-র অন্য যেকোন সংখ্যায় চিহ্নিত নয় নিরেনবার্গ ও মেথেয়াইয়ের সিদ্ধান্তে এর কোন নিশ্চয়তা ছিল না।

ত্রয়ীর প্রকল্প সর্বাধিক সম্ভাব্য হলেও তা তখনো প্রমাণসিদ্ধ হয় নি। ক্রিক ও তাঁর সহযোগীরা ঘোষণা করলেন যে তাঁরা তা প্রমাণ করেছেন। তাঁরাও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে সংকেতগুলো প্রাবরিত নয় (গামভের সংকেত প্রাবরিত ছিল)। এছাড়াও সংকেতটি বিকৃত অর্থাৎ একটি এমিনোএসিডের সংকেত একটিমাত্র ত্রয়ীর বদলে একাধিক বিভিন্ন ত্রয়ী দ্বারা চিহ্নিত হতে পারত। শেষে তাঁরা নিউক্লিক এসিডের অভিন্ন পঠন নিশ্চিত করা সম্পর্কেও আলোচনা করেছিলেন। ক্রিক আগেই তাঁর 'কমাবিহীন সংকেত' সমস্যার সমাধান নির্দেশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর বর্তমান নিবন্ধে তিনি সেই 'কমাবিহীন সংকেত' প্রকল্পটি প্রত্যাখ্যান করলেন। 'কমাবিহীন সংকেত'

প্রত্যাখ্যান বোধহয় বিজ্ঞানে ক্রিকের শ্রেষ্ঠতম অবদান এবং নিরপেক্ষ আত্মবিশ্লেষক সৎ বিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর পরিচিতির নির্ধারক।

বস্তুত দেখা গেল যে সঙ্কেত পঠনের সমস্যা যত জটিল মনে হয়েছিল আসলে তা সেরূপ নয়। কল্পনা করুন শব্দের মধ্যে কোন ফাঁক না রেখেই একটি বই ছাপা হয়েছে। তাহলেকিবিভিন্নপাঠকতাবিভিন্নভাবেপড়বেন? অভ্যাস ছাড়া তা পড়া অবশ্য কষ্টকর, তবু এতে কেউই কোন ভুল করবেন না। কেন? কারণ, আমরা শুরু থেকে স্বাভাবিক ক্রমানুসারে তা পড়ছি। আর ঠিক এভাবেই প্রোটিন সংশ্লেষ সমস্যার সমাধান হল। একটি নির্দিষ্ট আরম্ভস্থল থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন পুঞ্জের নির্দিষ্ট দূরত্ব অবধি এগিয়ে এ তথ্যাদি পঠিত হয়েছিল।

সঙ্কেত যে আসলে ত্রয়ীচিহ্নিত শুধু একথাই এখানে আমি বলব। প্রোফ্লাভিন নামক একটি রাসায়নিক উপাদানে ব্যাক্টেরিওফেজে মিউটেশন সৃষ্টি করে ক্রিক ও তাঁর সহকর্মীরা পরীক্ষাটি পরিকল্পনা করেছিলেন। আর-এন-এ'র উপর প্রোফ্লাভিনের ক্রিয়া অনেকটা ভিন্নতর। নাইট্রাস এসিড যেমন এক ক্ষারকে অন্য ক্ষারে রূপান্তরিত করে, প্রোফ্লাভিনে তা হয় না। একক নিউক্লিওটাইড 'অপসারণ' অথবা 'সংযোজন' মাধ্যমে মিউটেশন উৎপাদনই এর বৈশিষ্ট্য। ক্রিক ও তাঁর সহকর্মীদল এক ও অভিন্ন জিনে বহুসংখ্যক মিউটেশন উৎপাদন করেন এবং তাদের সংকরণেই সবচেয়ে বিস্ময়কর ফলাফল পেলেন। কখনো সম্পূর্ণ অভিন্ন ক্রিয়ায় দুটি মিউটেশন থাকা সত্ত্বেও সংকরণের ফলে বাহ্যত স্বাভাবিক সন্তান উৎপন্ন হয়। অথচ অন্য সময় কিছুই হয় না।

কিন্তু আমরা যদি একটি ডি-এন-এ অণুতে দুটি মিউটেশনের সমাবন্ধন ঘটাই তাহলে কী হবে? দেখা গেল, সমাবন্ধন প্রক্রিয়াটি অবিকল ক্রমোসোম ক্রসিং-ওভারের অনুরূপ, শুধু তা ডি-এন-এ'র অণুপর্যায়ে সংঘটিত। এই নতুন অণুতে এক অণুর 'মস্তক' ও অন্যটির 'পুচ্ছ' সংগ্রথিত হয় এবং দুই সংযোগ ও বিয়োগের মধ্যস্থলে ক্রসিং-ওভারের উদ্ভব ঘটে। 'সংযোগী' ও 'বিয়োগী' এই দুই মিউটেশনের সম্ভাব্য সমাবন্ধনের ফলে স্বাভাবিক অবস্থার পুনরাবর্তন ঘটে। উভয় মিউটেশনই যদি কেবল 'সংযোগী' অথবা 'বিয়োগী' হয় তবে সে সমাবন্ধনের ফলে তাদের মতোই পরিবর্তিত এক ব্যাক্টেরিওফেজের উৎপত্তি ঘটবে।

কিন্তু তিনটি সংযোগীর সমাবন্ধন ঘটলে (সঙ্কেত আসলে ত্রয়ী) পরীক্ষা করা হল এবং দেখা গেল যে, তিনটি সংযোগী অথবা তিনটি বিয়োগীর

সমাবন্ধনে দৃশ্যত সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আকৃতির ব্যাক্টেরিওফেজ উৎপন্ন হয়। বংশাণুসঙ্কেতের ত্রয়ী বৈশিষ্ট্য অতঃপর সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হল! 'পাঠ' পঠনের জন্য ধারাবাহিকভাবে পুঙ্খানুক্রমিক একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব অনুসরণ সম্পর্কিত ক্রিকের নতুন ধারণাও আনুষঙ্গিক পরীক্ষা দ্বারা সত্যায়িত হল। একই উদ্ভাবনী দক্ষতায় দেখানো হল যে, একটি নির্দিষ্ট আরম্ভস্থল থেকে শুরু করেই পাঠটি নিষ্পন্ন করা হয়েছে।

প্রথম জিন মিউটেশনের ফলে দ্বিতীয় জিনের প্রভাবিত না হওয়াকে 'দাঁড়ির' অস্তিত্বের অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ বলা যায়। কিন্তু এই যথেষ্ট নয়। বিজ্ঞানীরা আরো প্রত্যক্ষ প্রমাণ সংগ্রহে উদ্যোগী হলেন। তাঁরা এমন একটি মিউটেশন ব্যবহার করলেন যেখানে প্রথম জিনের শেষাংশ ও দ্বিতীয় জিনের আরম্ভ অন্তর্ভুক্ত।

দেখা গেল, প্রথম জিনের অ্যাক্রিডিন মিউটেশন দ্বিতীয়টিকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিরুদ্ধ করে। দুটি মিউটেশন সমাবন্ধনের ক্ষেত্রে যেখানে একটি সংযোগী ও অন্যটি বিয়োগী সেখানে স্বাভাবিক কার্যাদি বিঘ্নিত হয় না। যে নির্দিষ্ট দাঁড়ির পর থেকে ত্রয়ী অবশ্যপাঠ্য তাদের অস্তিত্ব এভাবেই প্রমাণিত হয়েছিল।

বংশাণুসঙ্কেতের মৌল বৈশিষ্ট্যাবলীর অধিকাংশ সিদ্ধান্তই ক্রিক ও তাঁর সহযোগীদের নিবন্ধটির অন্তর্ভুক্ত ছিল। যদিও কোন ত্রয়ীরই অর্থোদ্ধার করা হয় নি তবু এতেই স্থাপিত হয়েছিল 'বংশানুস্মৃতির অ-আ, ক-খ' তৈরির ভিত্তি। এরূপ কোন 'অভিধানের' অস্তিত্ব না থাকলেও (যদিও একমাত্র UUU ত্রয়ীর অর্থ নিরেনবার্গ উদ্ধার করেছিলেন), এর 'ব্যাকরণ' ইতিমধ্যেই সুসম্পূর্ণ হয়েছিল!

একটি রোমাঞ্চকর ঘটনা!

১৯৬১ সালে প্রকাশিত মেল্‌খার্সের সহকারী ভিট্‌মানের প্রবন্ধের নাম ছিল 'বংশাণুসঙ্কেত অর্থোদ্ধারের সম্ভাব্য পন্থা'। এখানে যে কয়েকটি ত্রয়ীর অর্থোদ্ধার করা হয়েছিল, তা ভিটমানের একক পরীক্ষার ফল নয়। তিনি নিরেনবার্গের UUU ত্রয়ীধৃত ফেনাইল্যালানিনের সঙ্কেত দিয়ে তাঁর কাজ শুরু করেছিলেন। নাইট্রাস এসিডকৃত মিউটেশন উৎপাদন পরীক্ষায় (আমরা জানি যে এতে C U-তে এবং A G-তে রূপান্তরিত হয়) সিরিন

ও লিউসিন ফেনাইল্যালানিন দ্বারা এবং প্রোলিন, সিরিন ও লিউসিন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হল। কিন্তু এর বিপরীত পরিবর্তন সংঘটিত করা গেল না। পরিলেখানুসারে তা এভাবে উপস্থাপিত করা যায়:

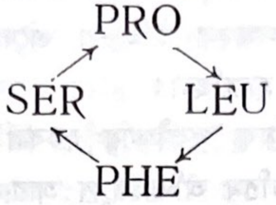

কিন্তু আমরা জানি যে একদিকে ফেনাইল্যালানিন UUU ত্রয়ী দ্বারা সঙ্কেতচিহ্নিত এবং অন্যদিকে নাইট্রাস এসিড পরীক্ষায় U কেবলমাত্র C থেকেই উৎপন্ন। ফলত বলা যায় যে, সিরিন ও লিউসিনের জন্য চিহ্নিত সঙ্কেতের প্রতিটি ত্রয়ীর মধ্যে একটি C এবং দুটি U-র বিভিন্ন বিন্যাস অবশ্যম্ভাবী।

যুক্তি বিস্তারক্রমে আরো এগিয়ে গিয়ে এমন দাবী উত্থাপন সম্ভব, যে ত্রয়ীতে প্রোলিনের সংকেত চিহ্নিত তা দুটি C এবং একটি U দ্বারা গঠিত। সুতরাং উপরোক্ত পরিলেখে চিহ্নিত এমিনোএসিডের পারস্পরিক রূপান্তর নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যাসাধ্য:

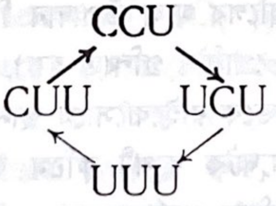

ত্রয়ীর এই উপাদানবিন্যাস অবশ্য স্বেচ্ছাভিত্তিক। ভিট্‌মানের প্রবন্ধে সর্বমোট নয়টি এমিনোএসিডের ত্রয়ীসংস্থিতি উল্লেখিত হয়েছে। আশা, কয়েক বছরের মধ্যেই সবক'টি এমিনোএসিডের ত্রয়ীনির্ণয় সম্ভবপর হবে।

সৌভাগ্য, সেজন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষার প্রয়োজন হয় নি।

আজ বিজ্ঞানোন্নতির দ্রুত গতির প্রেক্ষিতে নিবন্ধাবলী প্রকাশনা এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং সবক'টি এমিনোএসিডের ত্রয়ী আবিষ্কারের সংবাদ যদি অবিজ্ঞানী কোন পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয় তবে বিস্ময়ের অবকাশ থাকে না।

১৯৬২ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি 'নিউ ইয়র্ক টাইমস'এর প্রথম পৃষ্ঠায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়: 'জীববিদ্যার দ্রুত অগ্রগতির প্রেক্ষিতে এ বছরের মধ্যেই বংশানুসৃতির রাসায়নিক রহস্যাবলী আবিষ্কারের সম্ভাবনা আছে।' এ সংখ্যায় ছিল বংশাণুসংকেতের একটি সারণী এবং এতে বিশটি এমিনোএসিডের ত্রয়ী সংকেতের ইঙ্গিত। এদের তিনটির জন্য কয়েকটি ত্রয়ী সংকেতও নির্দেশিত হয়েছিল।

নিরেনবার্গ তাঁর প্রাথমিক পরীক্ষায় কেবল U অথবা C, কেবল A অথবা কেবল G চিহ্নিত কৃত্রিম অভিন্নরূপ আর-এন-এ ব্যবহার করেছিলেন। UUUUUU... সংস্থিতির আর-এন-এ প্রোটিনে ফেনাইল্যালানিন অন্তর্ভুক্ত করে এবং CCCCCC... প্রোটিনে প্রোলিন আসঞ্জিত করে। কিন্তু এর পরিমাণ এতই কম হয় যে, একে ভুল হিসেবেও সনাক্ত করা সম্ভব। প্রোটিন সংশ্লেষে অন্য দুটি কৃত্রিম আর-এন-এ'র ভূমিকা একেবারেই শূন্য। CCC, AAA, এবং GGG-তে সম্ভবত প্রোটিনের কোন সংকেত নিহিত নেই।

কয়েকটি ল্যাবরেটরিতে একই সঙ্গে নিরেনবার্গের গবেষণা অনুসৃত হলেও প্রথম সাফল্য অর্জিত হল অচয়ার গবেষণাগারে। কৃত্রিম আর-এন-এ তৈরি সম্পর্কে তাঁদের প্রাগ্রসর অভিজ্ঞতাই এর কারণ।

নিরেনবার্গের প্রথম পরীক্ষার পর কী করা প্রয়োজন ছিল? আরো জটিল সংস্থিতির আর-এন-এ কাজে লাগানো অতঃপর জরুরী ছিল। প্রথম পরীক্ষার মতো এবারও যৌগের মূল উপাদান ছিল রাইবোসোম (যে কণার উপর এমিনোএসিড থেকে প্রোটিন গ্রন্থিত হয়), এমিনোএসিড ও পরিবাহী আর-এন-এ'র (এমিনোএসিডকে রাইবোসোমে স্থানান্তরিত করে) সম্পূর্ণ এক-এক প্রস্থ পূরক এবং অনুঘটক রূপী কৃত্রিম আর-এন-এ। বলা প্রয়োজন পরীক্ষাটি এতই আণুবীক্ষণিক পর্যায়ের যে এর প্রোটিন সংশ্লেষ বিশ্লেষণের জন্য তেজস্ক্রিয়তায় চিহ্নিত অণু অপরিহার্য ছিল। প্রতিটি পরীক্ষা তাই বিশ প্রকারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতিটির জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল একটি তেজস্ক্রিয়তা-চিহ্নিত এমিনোএসিড এবং অন্যান্য ছিল সাধারণ। এই মিশ্রণ একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কিছুকাল রাখার পর প্রোটিনকে ট্রাইক্লোরেসেটিক এসিড দ্বারা অধঃক্ষিপ্ত করা হয়। একই সঙ্গে মুক্ত এমিনোএসিডও দ্রবণে থাকে। তন্মধ্যে যেক্ষেত্রে অধঃক্ষেপ তেজস্ক্রিয় সেখানে কোন এমিনোএসিড কী পরিমাণে প্রোটিনের অঙ্গীভূত হয়েছে, তদ্দ্বারা তা নির্দেশিত হয়।

দৃষ্টান্ত হিসেবে অচয়া ল্যাবরেটরির অন্যতম প্রথম প্রচেষ্টা পরীক্ষা করে

দেখা যাক। তাঁরা ৫টি U এবং একটি C-যুক্ত একটি কৃত্রিম আর-এন-এ'কে অনুঘটকরূপে ব্যবহার করলেন। কী ঘটেছে দেখার আগে এর সম্ভাব্য ফলাফল বিশ্লেষণ করা যাক। কৃত্রিম আর-এন-এ'র উপাদান অনুক্রম অজ্ঞাত এবং সম্ভবত তা এলোমেলো।

আপতিক ঘটনার মুখোমুখি সম্ভাবনাতত্ত্বের সাহায্য অপরিহার্য। এই তত্ত্বানুসারে ৩, ২, ১, ০ U-যুক্ত ত্রয়ীর আপতন ৫৩, ৫১, ৫২, এবং ৫০-এর আনুপাতিক। কথান্তরে UUU সংস্থিতির প্রতি ১০০টি ত্রয়ীর মধ্যে ২০টি করে ২U এবং ১C ত্রয়ী (অর্থাৎ ২০ CUU, ২০ UCU এবং ২০ UUC), ৪টি করে ১U এবং ২C-যুক্ত ত্রয়ী ও কেবল একটি CCC ত্রয়ী (আরও সঠিকভাবে ০·৮ শতাংশ) হবে।

পরীক্ষা থেকে কী দেখা গেল? ১০০ শতাংশ আসঞ্জিত ফেনাইল্যালানিন নিয়ে ফল পাওয়া গেল: ফেনাইল্যালানিন ১০০ শতাংশ, সিরিন ২৫ শতাংশ, লিউসিন ২০ শতাংশ এবং প্রোলিন ৮ শতাংশ।

ঠিক এমনটিই আশা করা গিয়েছিল। হিসাব একেবারে সমান সমান হল না। পরিমাপ পদ্ধতির মান নীচু ছিল। আর পরীক্ষামাত্রেই ত্রুটি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ফল যেহেতু কেবল ১০০, ২০, ৪ এবং ০·৮ শতাংশ হয়েছে তাই বলা যায় ৮ শতাংশের অঙ্কটিই প্রত্যাশিত ৪ শতাংশের নিকটতম। প্রাপ্ত সংখ্যা পরীক্ষা করে সহজেই দেখা যায় যে, phe = UUU (ইতিমধ্যেই জানা); ser = ২U, ১C; leu = ২U, ১C; pro = ১C, ২C। ভিট্‌মান নাইট্রাস এসিড ব্যবহার করে তামাক-মোজাইকের ভাইরাসে মিউটেশন উৎপাদনের পরীক্ষায় ঠিক একই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। রীতিমতো বিস্ময়কর। যখন দুটি বিভিন্ন পদ্ধতির ফল অভিন্ন হয় তখন তার নির্ভরযোগ্যতা স্বীকার্য। ঠিক এভাবেই ২০টির সকল এমিনোএসিডের ত্রয়ীধৃত সঙ্কেতের সংস্থিতি কৃত্রিম আর-এন-এ ব্যবহারক্রমে নির্ণীত হয়েছিল।

অচয়া ও তাঁর সহকর্মীদের সঙ্কলিত ক্ষুদ্র সারণীটি অচিরেই বিশ্বের বৈজ্ঞানিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল। বলা বাহুল্য, উদ্দীপনার সঙ্গত কারণ ছিল — সকল এমিনোএসিডের ত্রয়ী সঙ্কেত তখন সুসম্পূর্ণ। শুধু বাকী রইল এদের অন্তর্গত উপাদানসমূহের অনুক্রম নির্ধারণ। আর তখন বংশাণুসঙ্কেত সমস্যার সমাধান হবে চিরকালের জন্য!

একটি নিয়মের সন্ধানে

খোলা জানালা দিয়ে পাখীদের কাকলী ও শিশুদের কলকণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। বসন্তের প্রথম বৃষ্টিধৌত ধরিত্রী উন্মীলিত মুকুল, কচি পান্নারঙ ঘাস, প্রথম ফুল আর অজস্র উজ্জ্বল মুখে বর্ণিল। এখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনুবীক্ষণে চেয়ে থাকা খুবই অস্বাস্থ্যকর। মন তখন উধাও হয় দূরদূরান্তরে।

আমি অনুবীক্ষণের আলো নিবিয়ে, স্লাইড সরিয়ে লাইব্রেরির দিকে পা বাড়াই। এমন দিনে নতুন সাময়িকীর পাতায় চোখ বুলানোই বরং ভাল। কিন্তু পড়ার ঘরে যাবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই বসন্ত উধাও। আমি যেন এক অজানা জগতে প্রবেশ করলাম। সেখানে সময়ের অস্তিত্ব নেই, দিনক্ষণ যেন স্বপ্নলীন। কেউ যখন নিজ কাজে নিমগ্ন হয় তখনই এমনটি ঘটে। আমি যখন আবার প্রতিবেশের চেতনা ফিরে পেলাম তখন বিশাল এই শিল্পনগরীতে তাপদগ্ধ ধূলিময় গ্রীষ্ম।

‘জাতীয় বিজ্ঞান আকাদমির কার্যবিবরণী (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)’তে ১৯৬২ সালের মার্চ মাসের সংখ্যায় সেভেরো অচয়া ও তাঁর সহযোগীদের লেখা নিবন্ধটি আমার চোখে পড়েছিল। ‘নিউ ইয়র্ক টাইমস’এ প্রকাশিত রচনাটি এখানে পুঙ্খানুপুঙ্খ এবং বিস্তৃততর পরিসরে বর্ণিত হয়েছিল।

কোন ভাল বৈজ্ঞানিক গবেষণানিবন্ধ পড়ার সময় কখনো এমন একটি অনুভূতির তাড়না অনুভব করা যায় যে কেন আমি এটি করলাম না। কিন্তু ক্রিকের ব্যাক্টেরিওফেজ এবং ভিট্‌মানের তামাক-মোজাইক ভাইরাস সম্পর্কিত পরীক্ষার মতো এ প্রবন্ধেও কোন হিংসার উদ্রেক ঘটে নি, বরং প্রশস্তি উচ্ছ্রিত হয়।

আমি ধীরে ও সযত্নে প্রবন্ধটি পড়ি এবং সহসা লক্ষ্য করি যে, মার্কিন জৈবরাসায়নিকদের তথ্যাদিতে এমন কিছু প্রয়োজনীয় নিয়ম ছিল যা লেখকরা লক্ষ্য করেন নি। এখন সকল ত্রয়ীর সংস্থিতিই নির্ধারিত (তখন তাই অনুমিত হয়েছিল) এবং বাকী কেবল (তাও মনে করা হয়েছিল) ‘শব্দের’ ‘বর্ণ’সমূহের অনুক্রম নির্ণয়। মনে হল, যে নিয়ম আমার চোখে পড়েছে হয়ত তা সমস্যা সমাধানের সহায়ক হবে।

সেই সাময়িকীতেই বংশাণুসঙ্কেতের অর্থোদ্ধার সম্পর্কে আরো একটি নিবন্ধ দেখলাম। এর লেখক জিওফ্রি জুবী ও হেনরি কোয়েস্ট্‌লার (মার্কিন

বিজ্ঞানীদের মধ্যে কোয়েস্ট্লারই সর্বাধিক আকর্ষী ব্যক্তিত্ব)। কিন্তু তদবধি বংশাণুসঙ্কেত সম্পর্কে তিনি কোন কাজই করেন নি। দেখলাম, মিউটেশনজনিত কারণে প্রোটিনের এমিনোএসিড প্রতিস্থাপনের তথ্যাদির ভিত্তিতে তিনি সুকৌশলে তার অর্থোদ্ধারে সচেষ্ট হয়েছেন। নাইট্রাস এসিডের সাহায্যে ভাইরাসে মিউটেশন উৎপন্ন করে ভিটমানও একই চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ভিটমানের তথ্যাদির বাইরেও আরও বহুকিছু ছিল এবং জুবী ও কোয়েস্ট্লার তাই সংগ্রহ করে সেগুলির অর্থোদ্ধার করেছেন।

তাঁরা এর অর্থোদ্ধার করেছিলেন অচয়ার ল্যাবরেটরি থেকে তথ্যাদি জানার আগেই। অথচ উভয় প্রবন্ধ এক সাময়িকীর একই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। দুটির তুলনা করা মাত্রই দেখা গেল জুবী ও কোয়েস্ট্লারের সঙ্কেতোদ্ধার পুরোপুরি ভুল! তা সত্ত্বেও তাঁরা একটি উল্লেখযোগ্য কার্য সম্পাদন করেছিলেন। তাঁদের ধারণাবলী সারগর্ভ ও পদ্ধতিটিও চমৎকার ছিল। সমস্যা সমাধানের ব্যর্থতার জন্য তাঁরা দায়ী নন, কাজের সীমিত উপকরণ এর কারণ।

কিন্তু আমার মনে হল, যদি উভয় প্রবন্ধের তথ্যাদি একত্র করে তা বিশ্লেষণ করা হয় তবে ত্রয়ীর 'বর্ণাবলীর' অনুক্রমনির্ণয় হয়ত-বা সম্ভবপর হতে পারে। বিষয়টি সাধারণ অঙ্কের এবং প্রয়োজন শুধু একটিমাত্র সন্ধ্যা।

আমি একনাগাড়ে দুই সপ্তাহ অক্লান্তভাবে কাজ করে চললাম। প্রবন্ধদুটির তথ্যাদি আমার কাছে অপ্রতুল মনে হল। প্রয়োজন দেখা দিল নতুন তথ্যের। বিশ্লেষণের সময় আমি অপ্রত্যাশিত লুকানো প্রতিবন্ধের মুখোমুখি হলাম কিন্তু শেষে সমস্যাটির সমাধান হল।

'বর্ণাবলীর' অনুক্রম নির্ণয়ে আমার সাফল্যের উল্লাস ক্ষণজীবী হল। প্রথমেই দেখলাম আমি অপ্রতিদ্বন্দ্বী নই। অনুরূপ কয়েকটি প্রবন্ধও একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। চেক রীক্লিক, মার্কিনী স্মিথ এবং অন্যান্যরা স্বভাবতই একই ধারণার অনুবর্তী হয়েছিলেন। স্বতঃসিদ্ধ বলেই হয়ত আমার মতো যারা কোন দিন সক্রিয়ভাবে বংশাণুসঙ্কেত নিয়ে কোন কাজই করে নি, তাদের কাছেও বিষয়টি পরিস্ফুট হয়েছিল।

আর সবচেয়ে বড় কথা সমস্যাটি শুরুতে যত সহজ মনে হয়েছিল আসলে তত সহজ ছিল না।

তত সহজ নয়

বংশাণুসঙ্কেতের আত্যন্তিক গুরুত্বের প্রেক্ষিতে যাঁদের পক্ষেই নিরেনবার্গ ও অচয়ার পরীক্ষাবলী পুনর্মূল্যায়নের সুযোগ ছিল তাঁরা সকলেই কাজে নেমে পড়লেন। প্রথমে অবশ্য নিরেনবার্গ ও তাঁর সহযোগীরাই সকল এমিনোএসিডের ত্রয়ীধৃত সঙ্কেতগুলির অর্থোদ্ধার করে একটি প্রবন্ধ লিখলেন। মনে হয় নিরেনবার্গের পরীক্ষাগারে কাজটি শুরু হয়েছিল অচয়ার আগেই (অচয়ার ল্যাবরেটরির ব্যবস্থাবলী এর চেয়ে উন্নততর ছিল), কিন্তু শেষ হল বেশ কিছু পরে। উভয় পরীক্ষার ফলাফলই প্রায় পুরোপুরি অভিন্ন হল। সুলক্ষণ: বৈজ্ঞানিক ফলাফলের সমাপতন তাদের শুদ্ধতার সাক্ষ্যস্বরূপ।

অন্যান্যরাও একই পরীক্ষা করলেন। তাঁরা যখন নিরেনবার্গ পদ্ধতি পুরোপুরি অনুসরণ করলেন, ফল হল অভিন্ন। কিন্তু পদ্ধতি আলাদা হলেই দেখা গেল ফল হয় ভিন্নতর। সেটা কুলক্ষণ।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, মার্কিন বিজ্ঞানী ডেভিস, গিলবার্ট ও গরিনির পরীক্ষাবলী উল্লেখ্য। তাঁরা নিরেনবার্গের পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করেছিলেন শুধু একটিমাত্র পার্থক্যের সংযোগ ঘটিয়ে: রাইবোসোমের উপর তাঁরা স্ট্রেপ্টোমাইসিন প্রয়োগ করেছিলেন। কেন তা করা হয়েছিল বলা কঠিন। হয়ত 'দেখি কী হয়' এমন কিছু থেকেই এর শুরু। কিন্তু ফল হল কৌতুকপ্রদ। তাঁরা গবেষণা শুরু করেন একেবারে প্রথম ধাপ থেকে: পলিইউরিডাইলিক এসিড (UUUUUUU...) নিয়ে। এমতাবস্থায় একটিমাত্র এমিনোএসিড থেকেই প্রোটিন সংশ্লেষিত হয় এবং তা ফেনাইল্যালানিন। কিন্তু এখানে ফেনাইল্যালানিন ছাড়াও আইসোলিউসিন, সিরিন ও লিউসিন পাওয়া গেল। তাছাড়া এখানে ফেনাইল্যালানিন অপেক্ষা অনেক সময় আইসোলিউসিনের পরিমাণ ছিল বেশী।

স্ট্রেপ্টোমাইসিন বিখ্যাত এণ্টিবায়োটিক, ব্যাক্টেরিয়ারোধী। অবশ্য কিছু কিছু জাতের জীবাণু স্ট্রেপ্টোমাইসিন-সহিষ্ণু। বিজ্ঞানীরা ঐ জীবাণুর রাইবোসোমও পরীক্ষা করেছিলেন; তখনো কোন ব্যত্যয় মেলে নি — কেবলমাত্র ফেনাইল্যালানিনই আসঞ্জিত হয়েছিল। স্ট্রেপ্টোমাইসিনের রোগনিরামক প্রভাবের ভিত্তিও হয়ত এই।

কিন্তু যদি একই অবস্থায় তথ্যপাঠে বিভিন্নতা ঘটে তবে টেস্ট-টিউব পরীক্ষায় যে জীবন্ত কোষের অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল তার নিশ্চয়তা কোথায়? স্ট্রেপ্টোমাইসিনের মতো অন্যতর কার্যকরী ঔষধে একই ফল পাওয়া গেলে অবস্থা এত প্রতিকূল হত না। কিন্তু নতুন পরীক্ষা থেকে দেখা গেল যে, এমন কি কোন কোন লবণসংযোগ, মাধ্যমের অম্লতার পরিবর্তন, তাপমাত্রা ইত্যাদি সাধারণ উপাদানের দ্বারাও ত্রয়ীর অর্থ প্রভাবিত হয়। তাই সহজেই অনুমেয় যে এই নতুন ধরনের পরীক্ষাগুলির মধ্যবর্তী পার্থক্য অপেক্ষা কোষমুক্ত অবস্থা ও স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যবর্তী পার্থক্য বহুগুণ বেশী।

অতঃপর পূর্বোক্ত ফলাফলের ভিত্তিতে নিরেনবার্গ ধারার সকল গবেষণা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণের পর্যাপ্ত কারণ সৃষ্টি হয়েছিল। আলোড়নকারী এবং সত্যিকার গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের জয়োল্লাসের পর এল নৈরাশ্য। বংশাণুসঙ্কেত অর্থোদ্ধারের এক বছর পর যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল ভিট্‌মান তা পর্যালোচনা করেছিলেন। নিরেনবার্গের পদ্ধতি পর্যালোচনায় এর সন্দেহজনক ফলাফল সম্পর্কে বহু যুক্তি তিনি উপস্থাপিত করেন। মাসকয়েক পরে ক্রিকও একটি পর্যালোচনা সম্পূর্ণ করেন। কিন্তু ক্রিক তখন আণবিক বংশাণুবিদ্যার সর্বজনস্বীকৃত নেতা এবং তাঁর মতামতের মূল্য অত্যধিক। সেকালে জ্ঞাত সকল ত্রয়ীকে (প্রতিটি এমিনোএসিডের জন্য একটি এবং কয়েকটির জন্য একাধিকসংখ্যক ত্রয়ী আবিষ্কৃত হয়েছিল) তিনি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন: সম্ভাব্য, সম্ভব ও সন্দেহজনক (একটিও নির্ভরযোগ্য নয়)। ২৪টির মধ্যে আটটিই শুধু ‘সম্ভব’ চিহ্নিত ছিল।

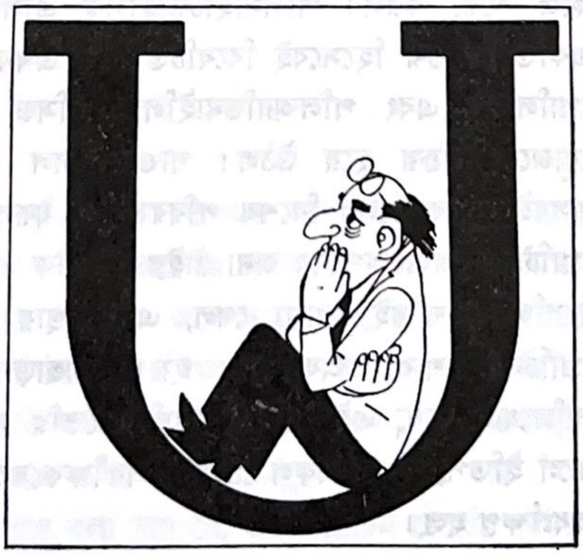

জৈবরাসায়নিকরা নিজেদের পরীক্ষা অব্যাহত রাখলেন। তাত্ত্বিকদের আনকোরা প্রকল্পসমূহ প্রায়ই তাঁদের ফলাফলের ভিত্তিতে তখন বারবার প্রত্যাখ্যাত হচ্ছিল।

আগেই বলা হয়েছে, একক ইউরাসিলধৃত (UUUUU...) কৃত্রিম আর-এন-এ ফেনাইল্যালানিন অণুসংযোগে প্রোটিন তৈরি উদ্দীপিত করেছিল। অথচ একই সংস্থিতির অন্যান্য পলিমারের (CCCCC..., AAAAA..., এবং GGGGG...) ক্ষেত্রে কিছু ঘটে নি। প্রথমটি (CCCCC...) কিছুসংখ্যক প্রোলিনকে নিগমভুক্ত করে বলে অনুমিত হলেও তা একই সঙ্গে পরীক্ষাগত ত্রুটি হিসেবেও বিবেচ্য ছিল। লক্ষণীয় যে, সকল এমিনোএসিডের প্রতিটি ত্রয়ীর ক্ষেত্রেই U অন্যতম অপরিহার্য উপাদান। এ কোনক্রমেই আপতিক নয়। কেবল U এবং অন্য কোন বর্ণ নয় কেন, তা নিয়ে তাত্ত্বিকেরা অনেক কিছু ভাবলেন। এর ব্যাখ্যা মেলা কঠিন হল না। বস্তুত ক্রমোসোমের ডি-এন-এ (যা বংশানুসৃত তথ্যাদির নিষ্ক্রিয় রক্ষক) এবং তথ্যবহন ও প্রোটিন সংশ্লেষে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী আর-এন-এ'এর নাইট্রাস ক্ষারমালা (বর্ণমালা) অনেকটা আলাদা। ডি-এন-এ'তে তারা এডিনিন (A), গুয়ানিন (G), সাইটোসিন (C) এবং থাইমিন (T)। কিন্তু আর-এন-এ'র মধ্যে একই A, G এবং C থাকা সত্ত্বেও সেখানে U T-র স্থলবর্তী। যদি U আর-এন-এ'স্থ 'বর্ণ' হয় এবং ডি-এন-এ'তে অনুপস্থিত থাকে তবে সঙ্কেতে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনুমেয়।

যে সকল পলিমার পূর্বে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ছিল কিছুকাল পরে তারাও কাজ শুরু করল। পলিসাইটিডাইলিক এসিড (CCCCC...) যা আগে একান্ত নিষ্ক্রিয় হিসেবেই বিবেচিত ছিল এখন তা পর্যাপ্ত তৎপরতার সঙ্গে প্রোলিনের এবং পলিঅ্যাডিনাইলিক এসিড (AAAAA...) লাইসিনের যোজনে সক্রিয় হয়ে উঠল। পাওয়া গেল U-বর্জিত অনেক ত্রয়ী এবং এসবই কৃৎকৌশলের বিশেষ পরিবর্তনের ফলে। প্রথম পরীক্ষায় সংশ্লেষিত প্রোটিনের অধঃক্ষেপণের জন্য ট্রাইক্লুরাসেটিক এসিডের লঘুতর দ্রবণ ব্যবহৃত হয়েছিল। শীঘ্রই বোঝা গেল, এমতাবস্থায় অধিক ফেনাইল্যালানিনযুক্ত প্রোটিনই শুধু অধঃক্ষিপ্ত হয়। তাছাড়া পর্যাপ্ত পরিমাণ U-এর সান্নিধ্যেই শুধু এই ধরনের প্রোটিন তৈরি সম্ভব। অন্য পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে ইতিপূর্বে যে সকল প্রোটিন পরীক্ষকদের নজরে আসে নি এবার তাও অধঃক্ষিপ্ত হল।

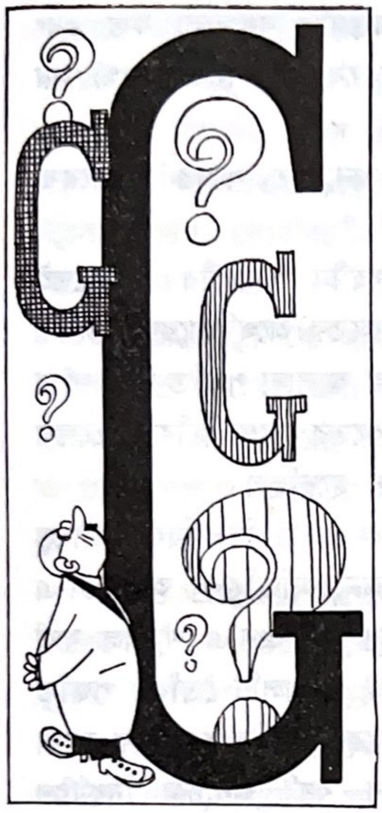

কিন্তু U সমস্যা সমাধানের সঙ্গে সঙ্গেই G-র প্রশ্ন দেখা দিল, কারণ পলিগ্নয়ানাইলিক এসিড GGGGG...) তখনো নিষ্ক্রিয় এবং তুলনামূলকভাবে G-হীন ত্রয়ীর সংখ্যাও বেশী ছিল না। অধঃক্ষেপণ কৃৎকৌশল এখানে নাচার। আর এক মস্তিষ্কপীড়ক সমস্যা। দেখা গেল, এসব বংশাণুসংকেতের সঙ্গে সঙ্গতিহীন ঘটনাবলী। আর-এন-এ'র যে অংশ G-সমৃদ্ধ, তা ডি-এন-এ'র মতো পরস্পরের সঙ্গে দুই হেলিক্স তৈরিতে সক্ষম। ফলত আর-এন-এ'র অনুরূপ অংশ অবরুদ্ধ ও প্রোটিন সংশ্লেষে অংশগ্রহণে তা ব্যর্থ হয়।

বংশাণুসংকেতের সমস্যা সমাধানে যে সকল সন্দেহ ও জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল তার সবকিছুর উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। দুটি বিষয় এখানে সুস্পষ্ট। প্রথমত, কয়েক মাসের মধ্যেই সমস্যার সমাধান সম্পর্কে যে সর্বজনীন প্রত্যাশা দেখা দিয়েছিল তা নৈরাশ্যে পর্যবসিত হল। দ্বিতীয়ত, দেখা গেল বংশাণু-রসায়নের অ-আ, ক-খ পড়ার পক্ষে নিরেনবার্গের পদ্ধতি এককভাবে পর্যাপ্ত নয়। ক্রমে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, এর শুদ্ধ সমাধান তিন পথের একটিতে নিহিত আছে।

তিনটি পথ

নিরেনবার্গ পদ্ধতির দুটি ত্রুটি ছিল। প্রথমত, প্রণালীটি কৃত্রিম এবং জীবন্ত কোষের প্রোটিন সংশ্লেষ যে এই নিয়মলগ্ন এখানে তার কোন নিশ্চয়তা বিধৃত নেই। দ্বিতীয়ত, অজ্ঞাত লিপির অর্থোদ্ধারে উল্লিখিত সমান্তরাল দ্বিভাষিক পাঠ্যবস্তুর অপরিহার্যতার কথা স্মরণীয়। নিরেনবার্গ পদ্ধতি দ্বিভাষিক কিন্তু অপ্রতুল। অচয়ার পদ্ধতিতে তৈরী আর-এন-এ'র ক্ষারসমূহ এলোমেলোভাবে সমাবদ্ধ হয়েছিল এবং এদের অনুক্রমও জানা যায় নি। তাই লিপিপাঠ পদ্ধতির অনুকরণে বলা যায় যে, এর 'প্রোটিন টেক্সট' পর্যাপ্ত

ছিল না, শুধু 'নিউক্লিক এসিডের লিপির' অন্তর্গত বর্ণমালা কত এবং কী কী এটুকুই জানা গিয়েছিল। এমন তুলনা যে তত নির্ভরযোগ্য নয় তা অনস্বীকার্য।

এই অবস্থা সামনে রেখে আমরা আমাদের অনুসৃত পথের সীমারেখা নির্ধারণ করতে পারি।

প্রথম ও সর্বাগ্রে প্রয়োজন, কেবলমাত্র কোষহীন প্রণালীর ভিত্তিতেই নয়, জীবন্ত কোষের পরীক্ষা মাধ্যমেও বংশাণুসঙ্কেতের অর্থোদ্ধারের সম্ভাবনা আবিষ্কার করা। অবশ্য নিরেনবার্গের তথ্যাদি থেকে আলাদা পদ্ধতি আবিষ্কার ছাড়া অতঃপর গত্যন্তর ছিল না। বর্তমান সঙ্কেতের সঙ্গে জীবন্ত তন্ত্রের পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের তুলনাই পর্যাপ্ত বিবেচিত হয়েছিল।

অন্য পন্থাদুটি জ্ঞাত বর্ণমালার অনুক্রমভিত্তিক একটি দ্বিভাষিক পাঠ্যবস্তু সংগ্রহ সম্পর্কিত। একদিকে, নির্দিষ্ট 'বর্ণ' অনুক্রমভিত্তিক আর-এন-এ সংশ্লেষের প্রয়াস প্রয়োজন। অন্যদিকে, অতি ক্ষুদ্র আর-এন-এ শৃঙ্খল যথা একক ত্রয়ীর (রাসায়নিকরা বহুকাল আগে থেকেই শৃঙ্খলটি তৈরির পদ্ধতি জানেন) এমিনোএসিড একত্রীকরণ ও তা আবিষ্কারের পদ্ধতি আমাদের শেখা দরকার। এবং সবশেষে, প্রাকৃতিক আর-এন-এ'র 'বর্ণ' অনুক্রম নির্ধারণ পদ্ধতিও অবশ্যজ্ঞাতব্য। কিন্তু কাজটি অত্যন্ত দুরূহ এবং এ পন্থায় সমস্যার আশু সমাধান সহজলক্ষ্য নয়।

পন্থাত্রয়ের প্রত্যেকটিতেই গবেষণা অনুসৃত হয়েছে, সাফল্য অর্জিত হয়েছে। কত দ্রুত জটিলতাগুলি উত্তরণ সম্ভবপর হয়েছে তা রীতিমতো বিস্ময়কর।

উপরে প্রথম যে পথটির কথা বলা হয়েছে আমিও সে ধারায় কিছু কাজ করেছি।

অধিকাংশ পরীক্ষক বিজ্ঞানীদের তথ্যেই কিছু পরিমাণ তথ্যাংশ ছিল যা তাঁরা নিজেরা উদ্ভাবন করেন নি। প্রসঙ্গটি মূলত তাঁদের গবেষণার গাণিতিক দিক সম্পর্কেই প্রযুক্ত। যদিও স্বীকার্য যে, নিখুঁত বিজ্ঞান গণিতনির্ভর, তবু দুর্ভাগ্যবশত অনেক বিজ্ঞানীই সত্যটি গ্রহণে মন্থর, বিশেষভাবে জীববিদ্যা ও রসায়নে। গণিত অবহেলার জন্য এসব বিজ্ঞানের অনেক পরীক্ষামূলক সিদ্ধান্তেই বিকৃতি অথবা অগভীর পর্যবেক্ষণের অবকাশ থাকে। বংশাণুর সঙ্কেতোদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্ত মূলত জৈবরাসায়নিক। আমি পেশাধারী গাণিতিক নই। তবু জৈবরসায়নের যে

পর্যায়ে গবেষণাগুলি নিষ্পন্ন হয়েছিল সেখানে গণিত সম্পর্কিত আমার পরিমিত জ্ঞানই পর্যাপ্ত ছিল।

আমার কাজের বিশদ বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। বহু সমস্যাসংশ্লিষ্ট এই কাজ মূলত গণিতভিত্তিক এবং বোধগম্য ও আকর্ষণীয় করে তা বর্ণনা করা দুঃসাধ্যপ্রায়। কোষবিহীন প্রণালীর তথ্যাবলী পরিহার করে সঙ্কেত অর্থোদ্ধারের পদ্ধতি নির্ণয়ই আমার গবেষণার চূড়ান্ত সাফল্য রূপে চিহ্নিতব্য। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে, আমার পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য পরীক্ষাসমূহ ইতিমধ্যে পরিচালিত হয়েছিল এবং এগুলির ফলাফল বৈজ্ঞানিক সাময়িকীতে ছাপাও হয়েছিল। এই পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে বংশাণু সঙ্কেতের একেবারে স্বতন্ত্র ও প্রায় সম্পূর্ণ অর্থোদ্ধার করা সম্ভব হল। এসব তথ্য বিশেষভাবে অচয়া ও নিরেনবার্গের ফলাফলের অনুরূপ হয়েছিল।

অন্যান্য তাত্ত্বিকরা অপেক্ষাকৃত স্বল্প জটিল কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁরা নিরেনবার্গ — অচয়া সঙ্কেতের জীবন্ত প্রণালী থেকে সংগৃহীত তথ্যাবলী তুলনা করছিলেন। এখানে সাযুজ্যের মধ্যেই নিহিত ছিল সঙ্কেত উদ্ধারের শুদ্ধতা এবং কোষহীন প্রণালী ও জীবন্ত কোষ উভয়টিতে প্রোটিন সংশ্লেষের অভিন্ন নিয়মানুগত্যের প্রমাণ।

কিন্তু এই যথেষ্ট নয়। এতে নিরেনবার্গ — অচয়া সঙ্কেতের শুদ্ধতাই শুধু প্রমাণিত হয়, কিন্তু এর অর্থোদ্ধার অসম্পূর্ণই থাকে। সুতরাং নতুন জৈবরাসায়নিক পন্থা আবিষ্কারের প্রতীক্ষাই অতঃপর ভবিতব্য। কিন্তু দীর্ঘদিন অপেক্ষার আর প্রয়োজন হয় নি।

বংশাণুসঙ্কেতের অর্থোদ্ধারে নতুন সাফল্যই ছিল ১৯৬৫ সালে নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ আন্তর্জাতিক জৈবরাসায়নিক কংগ্রেসের রোমাঞ্চ এবং তা করেছেন নিরেনবার্গ। কিছু পরে প্রকাশিত হয় 'আর-এন-এ'র সঙ্কেত শব্দাবলী ও প্রোটিন সংশ্লেষ' নামে প্রবন্ধ। এর লেখক মার্শাল নিরেনবার্গ ও ফিলিপ লিডার।

নিরেনবার্গ, অচয়া ও অন্যদের প্রথমদিকের পরীক্ষাবলীর পদ্ধতিসমূহ স্মরণ করা যাক। সেসবই ছিল পরোক্ষ। এমিনোএসিডদের প্রোটিনে সংযোজনের জন্য জ্ঞাত সংস্থিতির অজ্ঞাত 'বর্ণ' বা ক্ষার-অনুক্রমচিহ্নিত কৃত্রিম আর-এন-এ ছাঁচ হিসেবে তখন ব্যবহৃত হয়েছিল। সুতরাং কেবলমাত্র সাধারণ সংস্থিতির তুলনা ও ফলাফলের পরিসংখ্যানমূলক বিশ্লেষণে তাঁরা বাধ্য হয়েছিলেন। আর তা ছিল অতি জটিল ও ক্লান্তিকর। অন্যদিকে, ট্রাইক্লরাসেটিক অথবা

টাংস্টেন এসিড দ্বারা অধঃক্ষিপ্ত এমিনোএসিডের দীর্ঘতর শৃঙ্খলই শুধু এ পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর ছিল।

প্রক্রিয়ার পূর্বাহ্ন নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ রাইবোসোম থেকে প্রোটিনের শৃঙ্খল আলাদা হবার আগেই তা জানার পদ্ধতি শিক্ষণ নিরেনবার্গের নতুন পরীক্ষার লক্ষ্য ছিল। অতঃপর তা থেকে তখন বার্তাবাহী আর-এন-এ'র নাতিদীর্ঘ অণুসমূহে এমিনোএসিডের আসঞ্জন নির্ধারণ সম্ভব হত। চিন্তাটি একমাত্র নিরেনবার্গের মনেই আসে নি, অন্যেরাও তা করেছিলেন। কিন্তু কেউই সফল হন নি। অনেক নিবন্ধে রাইবোসোমে পরিবাহী আর-এন-এ'র আসঞ্জন বর্ণিত হয়েছিল কিন্তু প্রক্রিয়াটির কার্যকারিতা তখনো সুবোধ্য হয় নি।

যে অসংখ্য ভুলভ্রান্তির মধ্য দিয়ে তাঁরা শেষ বিশ্লেষণে উপনীত হয়েছিলেন নিরেনবার্গ ও লিডারের প্রবন্ধে তার কোন উল্লেখ ছিল না। কিন্তু স্পষ্টতই সাফল্যটি সহজে অর্জিত হয় নি। প্রযুক্ত পদ্ধতির মর্মসার এই।

শুরুতে নিরেনবার্গের প্রথম কাজের মতো এবারও সবকিছুই ঠিকভাবেই এগিয়েছিল। চিহ্নিত এমিনোএসিড তাদের 'বাহকে' (পরিবাহী আর-এন-এ) আসঞ্জিত হয় এবং বার্তাবাহী আর-এন-এ'পূর্ণ রাইবোসোমে তা মিশে যায়। শুরু হল রাইবোসোমে এমিনোএসিড সংযুক্তির পালা... কী ঘটছে তা জানার এ-ই সুবর্ণ মুহূর্ত। কিন্তু কীভাবে?

সম্ভবত তাঁরা দৈবের (পদ্ধতিটির কোন তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আপাতত নেই) আনুকূল্য লাভ করেছিলেন। যখন পোষক মিশ্রণ সেলুলোজ-নাইট্রেটের মধ্য দিয়ে পরিস্রুত হয় তখন রাইবোসোম ও এমিনোএসিডসহ বাহকগুলি ফিলটারে থিতিয়ে পড়ে। এখানে ফিলটার ব্যবহৃত হলেও পরিস্রাবণ অপরিহার্য ছিল না, কারণ ফিলটারের ছিদ্র ছিল রাইবোসোম অপেক্ষা শতগুণ বড়। সম্ভবত ফিলটার উপকরণে এসব কণারা আটকে ছিল। রাইবোসোম এতে সবচেয়ে দৃঢ়ভাবে আসঞ্জিত হয়। ফিলটার লবণাক্ত দ্রবণে ধৌত করা হলে পরিবাহী আর-এন-এ এবং মুক্ত এমিনোএসিড অপসৃত হয় এবং রাইবোসোম যথাস্থানে অবস্থান করে। কোন্ এমিনোএসিড রাইবোসোমে আসঞ্জিত হয়েছে তা জানা তখন সহজ। কারণ, এমিনোএসিড তেজস্ক্রিয়তায় চিহ্নিত ছিল।

যে পালিইউরিডাইলিক এসিড নিয়ে নিরেনবার্গ তাঁর পরীক্ষা আরম্ভ করেছিলেন এবারও তা নিয়েই কাজ শুরু করলেন। কিন্তু এবার দীর্ঘ শৃঙ্খল সংগ্রহ নিষ্প্রয়োজন ছিল। প্রতি রাইবোসোমে একটিমাত্র এমিনোএসিড আসঞ্জিত হলেও তেজস্ক্রিয় সঙ্কেতের মাধ্যমে তা জানা সম্ভব হত। বিজ্ঞানীরা

বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের শৃঙ্খল ব্যবহার করে আশ্চর্য ফল পেলেন: দুই নিউক্লিওটাইডের মতো দীর্ঘ শৃঙ্খল নিষ্ফল প্রমাণিত হল। কিন্তু নিউক্লিওটাইডত্রয়ী (UUU) রাইবোসোমে ফেনাইল্যালানিনের ব্যাপক আসঞ্জন উদ্দীপিত করল। চার অথবা পাঁচ U-র শৃঙ্খলেও ফল হয় ত্রয়ীরই অনুরূপ। বংশাণুসঙ্কেত যে ত্রয়ীধৃত এবার তার প্রথম বাস্তব প্রমাণ মিলল। ইতিপূর্বে অনেক গবেষকই ত্রয়ী সঙ্কেতের পক্ষে বহু প্রমাণ উপস্থাপিত করেছিলেন, কিন্তু সবই ছিল অপ্রত্যক্ষ।

কেবলমাত্র A অথবা C শৃঙ্খল নিয়ে অনুরূপ বহু পরীক্ষায় অভিন্ন ফল পাওয়া গিয়েছিল। প্রমাণিত হয়েছিল যে AAA ও CCC সঙ্কেত যথাক্রমে লাইসিন ও প্রোলিনের।

দ্বিতীয় প্রবন্ধের বিষয় ছিল বিভিন্ন 'বর্ণ'এর একটি ত্রয়ী সম্পর্কে। এক G ও দুই U-যুক্ত নিউক্লিওটাইডত্রয়ীর সকল প্রকারভেদ – GUU, UGU, UUG বিজ্ঞানীদের হস্তগত এবং সদৃশ পরীক্ষায় এগুলোর যাথার্থ্য নির্ণীত হয়েছিল। তাঁরা ভেলিন নামক এমিনোএসিডের আসঞ্জন পরীক্ষা করে দেখলেন যে, কেবলমাত্র GUU-র উপস্থিতিতেই এর সংযোজন ঘটে এবং অন্য দুটি প্রকার সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়।

একটি নতুন পথ উন্মুক্তির প্রেক্ষিতে অন্যতর আবিষ্কার কেবল কৃৎকৌশলের মুখাপেক্ষী ছিল। নিরেনবার্গ ও তাঁর সহকর্মীরা সকল সম্ভাব্য ত্রয়ীর চূড়ান্ত অভীক্ষার জন্য একের পর এক পরীক্ষানুষ্ঠানে রত হলেন...

কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই বংশাণুসঙ্কেতের প্রত্যক্ষ অর্থোদ্ধারের আরও একটি নতুন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হল। বিজ্ঞানীরা সুনির্দিষ্ট 'বর্ণ'-অনুক্রমবিশিষ্ট আর-এন-এ সংশ্লেষে সফল হলেন। সত্যি, সোজা পথে ব্যর্থ হয়ে শেষ অবধি ঘুরা পথেই হদিস মিলল।

মার্কিন নাগরিক ভারতীয় রসায়নবিদ খোরানা ও তাঁর একদল সহকর্মী কয়েক বছর ধরেই ডি-এন-এ (লক্ষণীয় আর-এন-এ নয়) ও তার উপাংশ সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। শেষে তিনি এমন একটি পদ্ধতি খুঁজে পেলেন যার সাহায্যে নিউক্লিওটাইডের যদৃচ্ছানুক্রমিক সংযোজন সম্ভব। এ সাফল্যের পর প্রকৃতি অনুকরণের চেষ্টা তাঁর পক্ষে আর অসম্ভব ছিল না।

আপনাদের অবশ্যই মনে আছে যে, ডি-এন-এ দুই হেলিক্সের সমষ্টি। যে বাহুদুটিতে হেলিক্সদ্বয় গঠিত তারা ভিন্ন এবং পরস্পরের সম্পূরক। কেবল

দুই শৃঙ্খলবিধৃত অণুই জৈবিক পর্যায়ে সক্রিয়। সুতরাং খোরানা এমন দুটি শৃঙ্খল তৈরির চেষ্টা শুরু করলেন যাদের 'বর্ণ' বিন্যাস নিখুঁতভাবে পরস্পরসম্পূরক। দেখা গেল, যথাযথ পরিবেশে মিশ্রিত দুটি শৃঙ্খল দুই হেলিক্সে সমাবদ্ধ হয়!

এভাবেই জ্ঞাত 'বর্ণ'-আনুক্রমিক একটি ডি-এন-এ অণু সংশ্লেষিত হল। কীভাবে টেস্ট-টিউবে ডি-এন-এ এবং আর-এন-এ'র সংশ্লেষ সম্ভব তা ইতিমধ্যেই জৈবরাসায়নিকদের জানা ছিল (আর-এন-এ'র 'বর্ণ'-অনুক্রম ছাঁচের ডি-এন-এ'এর অবিকল অনুকৃতি)। খোরানা তাই করলেন।

এখন এমন সব আর-এন-এ অণু পাওয়া গেল যার শুধু 'বর্ণ' নয়, 'বর্ণ'-অনুক্রমও জ্ঞাত। সুতরাং এখন বাকী রইল ১৯৬১ সালে মস্কোতে নিরেনবার্গ যে পরীক্ষার রিপোর্ট পেশ করেছিলেন তারই পুনঃপরীক্ষণ। পরীক্ষায় অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হল। নিরেনবার্গ যেভাবে বিভিন্ন ত্রয়ীসঙ্কেতের বৈশিষ্ট্যাবলী প্রত্যক্ষ করেছিলেন খোরানাও তেমনি বিভিন্ন আর-এন-এ শৃঙ্খল সন্নিবেশে তৈরী প্রোটিন সম্পর্কে অনুসন্ধান শুরু করলেন।

উভয় লক্ষ্যেই সমান্তরাল গবেষণা দ্রুত এগিয়ে গেল। দেখা গেল, নিরেনবার্গের প্রথম ও দ্বিতীয় পদ্ধতির যেমন, তেমনি খোরানার পদ্ধতিরও ত্রয়ীসমূহের সঙ্কেত সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্যের সিদ্ধান্তগুলি অভিন্ন এবং জীবন্ত প্রণালীর পরীক্ষালব্ধ তথ্যাদি বিশ্লেষণের সঙ্গে এগুলোর সাদৃশ্যও সহজলক্ষ্য।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। প্রারম্ভিক পর্যায়ের সকল পরীক্ষাই অনুষ্ঠিত হয়েছিল অন্ত্রজ ব্যাক্টেরিয়া নিয়ে *(E. coli)* কোষমুক্ত প্রণালীতে। এখন শুরু হল উচ্চতর প্রাণীকোষসহ অন্যপ্রকার কোষের পৃথকীকৃত প্রণালীর পরীক্ষা। বংশাণুসঙ্কেত এ গ্রহের প্রাণী ও উদ্ভিদরাজ্যের জন্য অভিন্ন প্রমাণিত হল। অথবা সতর্কতরভাবে বলা যায়, বংশাণুসঙ্কেতের সর্বজনীনতার কোন ব্যত্যয় অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নি।

বংশাণুসঙ্কেতের অর্থোদ্ধার বস্তুত সম্পূর্ণ হয়েছিল। দেখা গেল, সম্ভাব্য ত্রয়ীসংখ্যা ৬৪ এবং এদের ৬১টি প্রোটিনে সুনির্দিষ্ট এমিনোএসিডের নিগমভুক্তির নিয়ন্ত্রক। কিন্তু প্রোটিন সংশ্লেষে অংশীদার বিভিন্ন প্রকার এমিনোএসিডের সংখ্যা ২০। সুতরাং প্রায় সকল এমিনোএসিডেরই সঙ্কেত যে একাধিক ত্রয়ীধৃত সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। প্রতি এমিনোএসিডের জন্য নির্দিষ্ট ত্রয়ীর সংখ্যা বিভিন্ন। এদের মধ্যে মাত্র দুটি ক্ষেত্রেই ত্রয়ীর সংখ্যাটি এক। এই এমিনোএসিডগুলি যে মেথিওনিন ও ট্রিপটফেন

তা সহজেই অনুমেয়। এরা দুর্লভতমের অন্তর্ভুক্ত। সিরিন, আর্জিনিন এবং লিউসিনের মতো অতি সাধারণ এমিনোএসিডও ছ'টি বিভিন্ন প্রকার ত্রয়ীতে সংকেতবদ্ধ।

এই তো গেল ৬৪টির ৬১টি। কিন্তু বাকী তিনটি? এদের অর্থ কি এখনও জানা যায় নি? এদের দুটির অর্থ নির্ভুলভাবে নির্ণীত হয়েছে। এগুলো 'নিরর্থক' ত্রয়ীবিশেষ। অবশ্য উক্ত অর্থহীনতা কেবল এমিনোএসিডের সঙ্কেত বন্ধনেই প্রযোজ্য। আসলে তারাও পর্যাপ্ত অর্থবহ। এদের কাজ 'যতিচিহ্নের'। এদের দ্বারাই প্রোটিন শৃঙ্খলের শুরু ও শেষ চিহ্নিত। শেষতম ত্রয়ীর (UGA) অর্থ আজও অনির্ণীত। কিন্তু অদ্যাবধি সংগৃহীত সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে বলা যায় তা নিরর্থকদেরই দলভুক্ত।

প্রকৃতির এক জটিলতম রহস্য — বংশানুসৃতির রাসায়নিক ভিত্তির যবনিকা এভাবেই উন্মোচিত হল। বংশানুসৃতির রাসায়নিক ভিত্তির আবিষ্কার বিজ্ঞানের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম আবিষ্কারের অন্যতম এবং পারমাণবিক নিউক্লিয়াসের সংযুতি নির্ণয়, মৌলপদার্থের পর্যায়সারণী এবং আপেক্ষিক তত্ত্ব ইত্যাদির সঙ্গে তুলনীয়। মানবিক কর্মকাণ্ডের বহুবিধ পর্যায়ে বংশাণুবিদ্যার অগ্রগতির উল্লেখ্য গুরুত্ব আজ সন্দেহাতীত। আমরা এখানে এমন কয়েকটি ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করব যেখানে বংশানুসৃতির কৃৎকৌশল সত্যিকার বিস্ময়কর ফল ফলাবে।

চিকিৎসা। কোন কোন দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় চিকিৎসকের সাধ্যাতীত। ভাইরাস সংক্রামণ, ক্যান্সার ও অনুরূপ অন্যান্য রোগ এর দৃষ্টান্ত। মূলত কোষস্থ ক্রমোসোম সংস্থার বিকৃতির সঙ্গে এগুলো সংশ্লিষ্ট। অতঃপর বংশানুসৃত রোগ নিয়ন্ত্রণ ও মানবজাতির সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান অবশ্যই আশা করব।

কৃষিক্ষেত্র। পূর্বাপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রসূ পদ্ধতিতে নতুন জাতি ও প্রকারের উৎপাদন প্রত্যাশাও এখন সঙ্গত। তাছাড়া নিম্ন শ্রেণীর জীব থেকে মূল্যবান পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদক কোন কোন অভিনব প্রজাতির উদ্ভব ঘটানোও হয়ত অসম্ভব হবে না।

রসায়ন-প্রযুক্তিবিদ্যা। এক্ষেত্রে অতঃপর সুদূরপ্রসারী পুনর্নির্মাণ প্রয়োজন। কারণ, জীবন্ত কোষ স্বাভাবিক তাপ ও চাপমাত্রায় মূলত জল ও বাতাস থেকেই জটিলতম পদার্থ উৎপাদন করে। আজকের পদ্ধতির তুলনায় ব্যবস্থাটির ব্যাপক সুবিধা অতুল্য! এতে একেবারে আনকোরা বস্তুসম্ভার উৎপাদনের আশ্বাস নিহিত। দৃষ্টান্ত হিসেবে অজৈব কাঁচা মাল থেকে সংশ্লেষিত প্রোটিন, চর্বি, শর্করা প্রভৃতি খাদ্যবস্তু এবং ভিটামিন ও ঔষধের কথা সর্বাগ্রে উল্লেখ্য।

বংশানুসৃতি নিয়ন্ত্রিত সম্ভাবনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা এখন বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর আওতাধীন। কিন্তু এগুলো উদ্ভট অতিকল্পনা নয়, বিশ্বাস্য ভবিষ্যদ্বাণী। বংশানুবিদ্যার বিরাট সম্ভাবনাশীল এই আবিষ্কারসমূহ কীভাবে সদ্ব্যবহৃত হয় তার উপরই সর্বকিছু নির্ভরশীল। ভাইরাস দমনের উপকরণ অথবা জীবাণু যুদ্ধের জন্য নতুন ভাইরাস সৃষ্টিতেও এর ব্যবহার সম্ভব। আমাদের আশা, আজকের আবিষ্কারসমূহের আসন্ন ফসল আহরণের কালসীমার মধ্যেই মানবজাতির কাণ্ডজ্ঞান পরিপক্ক হবে, কল্যাণবোধ জয়ী হবে।

তবু কেন বাবার মতন

চতুর্দশ পুরুষ অবধি

এতক্ষণে পাঠকবর্গ প্রায় নিশ্চিত যে তাঁরা প্রবঞ্চিত হয়েছেন। আমরা বইয়ের শেষপর্বে অথচ কেন আমি বাবার মতন এ নিয়ে কথাটি অবধি নেই। দেখুন, বংশানুসৃতির নিয়ম যে সর্বজনীন তা আমরা অনেকবারই বলেছি। এখানে মটরশুঁটি, ফলের মাছি আর মানুষের কোন ভেদ নেই।

সাধারণ বংশাণুবিদ্যার অঙ্গীভূত হলেও মানব-বংশাণুবিদ্যার স্বাতন্ত্র্য সুচিহ্নিত। বিপুলাকৃতি বহু গ্রন্থ ও অগণিত বিশেষ নিবন্ধাবলীতে এর ভান্ডার পরিপূর্ণ। সে বিষয়ে আলাদা একটি জনপ্রিয় বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনা সম্ভব।

শতবর্ষ যুদ্ধের শেষপর্যায়, ১৪৫৩ সালের ক্যাস্টিলিয়নের লড়াই নিয়ে কাহিনীটি শুরু হতে পারে। সে যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি ছিলেন জন ট্যালবট। ঘটনার কয়েক বছর আগে তিনি রাজদত্ত আর্ল অব শ্রুসবেরি উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি যুদ্ধে নিহত হলে তাঁকে শ্রুসবেরির গির্জায় পারিবারিক সমাধিতে শান-শওকতের সঙ্গে সমাহিত করা হয়। প্রায় ৫০০ বছর সেখানে তিনি শায়িত ছিলেন...

১৯১৪ সালে গির্জা মেরামতের সময় কক্ষটি খোলা হলে একটি কৌতুকপ্রদ আবিষ্কারের সন্ধান মিলল। গির্জার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ট্যালবটের বংশধর। তাঁর একটি উপাঙ্গুলি ছিল হাতের প্রথমা ও দ্বিতীয়ার মাঝামাঝি। এটি তাঁর বংশাণুসৃত ত্রুটি এবং পৈত্রিকসূত্রে প্রাপ্ত। কিন্তু উপস্থিত সবাই দেখে অবাক হলেন যে, আর্লের সেই পূর্বপুরুষেরও উপাঙ্গুলি ছিল সেই হাতের প্রথমা ও দ্বিতীয়ার মাঝামাঝি! কিন্তু তাঁর এই দূর পূর্বপুরুষের স্বল্প অবশেষেও উপাঙ্গুলি চিহ্নিত ছিল। চৌদ্দ প্রজন্মেও ত্রুটিটির কোনই পরিবর্তন ঘটে নি।

ঘটনা হিসেবে কাহিনীটি কৌতুকপ্রদ এবং সকলেই এতে চকিত হবেন। একটু ভাবলেই আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছব : উপাঙ্গুলী একটি প্রকট মিউটেশন।

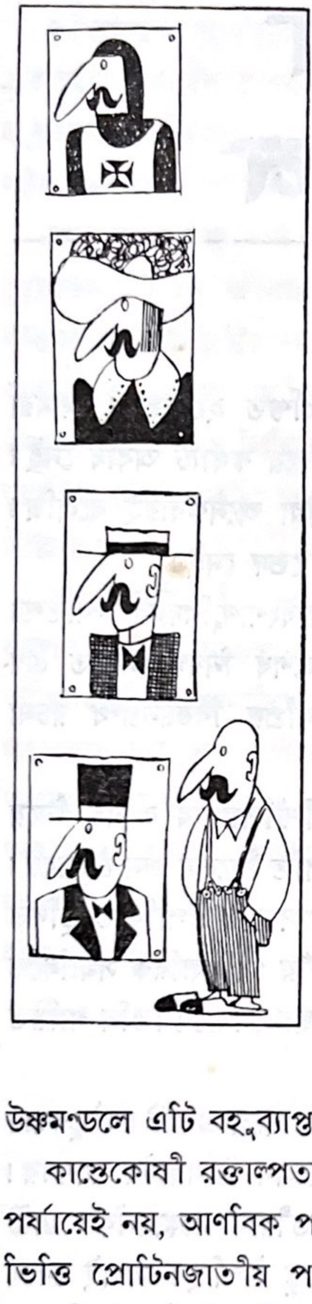

উপাঙ্গুলির অস্তিত্ব কিছুটা অসুবিধাজনক হলেও তা দুষ্প্রাপ্য তথা তাৎপর্যহীন। কিন্তু অতি গুরুত্বপূর্ণ এমন কোন সাধারণ চারিত্র্যের দৃষ্টান্ত উল্লেখও মোটেই কঠিন নয়।

ডাক্তাররা অনেককাল থেকেই কাস্তেকোষী রক্তশূন্যতার কথা জানেন। মারাত্মক এই রোগে রক্তকণিকা কাস্তে অথবা অর্ধচন্দ্রের আকার ধারণ করে। অনেকের ক্ষেত্রেই রোগটি ক্ষতিকর নয় এবং তারা অসুস্থ বোধও করে না। কিন্তু অন্যত্র তা মারাত্মক এবং এতে সাধারণত শৈশবেই মৃত্যু ঘটে। রোগটি থেকে যারা রেহাই পায় তারা রক্তাল্পতায় ভোগে, শরীর তাদের সুগঠিত হয় না, জোড়ায়, পেশীতে, পেটে তারা তীব্র বেদনা অনুভব করে, এমন কি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়াও তাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে এই বংশানুসৃত ব্যাধি একক জিনের পরিবর্তনের ফল এবং তা অবিকল মেণ্ডেলের প্রথম বিধি অনুসারে প্রজন্ম প্রজন্মান্তরে সঞ্চারিত হয়। সমসত্ত্ব কাস্তেকোষী জিনের ক্ষেত্রে রোগটি প্রকট আকার ধারণ করে, কিন্তু অসমসত্ত্বাবস্থায় পরিবর্তন ঘটে কেবলমাত্র রক্তকণিকার আকৃতির। উষ্ণমণ্ডলে এটি বহুব্যাপ্ত ব্যাধির অন্যতম।

কাস্তেকোষী রক্তাল্পতাই প্রথম বংশানুসৃত ব্যাধি যা শুধু জৈবরাসায়নিক পর্যায়েই নয়, আণবিক পর্যায়েও পরীক্ষিত হয়েছে। রোগটির জৈবরাসায়নিক ভিত্তি প্রোটিনজাতীয় পদার্থ হিউমোগ্লবিনের চারিত্র্যপরিবর্তনে নিহিত যা রক্তকণিকার উপাদানবিশেষ। হিউমোগ্লবিনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে এর স্বাভাবিক ও পরিবর্তিত প্রকারের মধ্যে ভেদ অতি সামান্য: ১৫০টি এমিনোএসিডে ধৃত এর অন্যতম শৃঙ্খলে গ্লুটামিন এসিডের অবশেষ ভেলিন-অবশেষ দ্বারা প্রতিস্থাপিত। বংশাণুসঙ্কেত সারণীর দিকে তাকালেই বোঝা যায়, নিউক্লিক এসিড অণুর স্থানবিশেষে একটিমাত্র ক্ষারের প্রতিস্থাপনই এই মিউটেশনের কারণ। সামান্য পরিবর্তনের কী নাটকীয় পরিণতি!

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মানুষের বংশানুসৃতি প্রক্রিয়া পূর্ববর্ণিত রীতিসমূহের অনুবর্তী এবং তা পৃথিবীর সকল জীবিতেই প্রযোজ্য। সংক্ষেপে হলেও মানব-বংশাণুবিদ্যায় প্রযুক্ত পদ্ধতি, এর সমস্যাবলী এবং আধুনিক সমাজে এর গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন।

দাবাখেলার ঘোড়ার চাল

বালতিতে ফুটো করলে অল্পক্ষণের মধ্যেই সবটুকু জল পড়ে যায়। কিন্তু আমাদের চামড়ায় যদি কোন আঁচড় লাগে কিংবা বেশ গভীর হয়ে কেটে যায়, আমরা তেমন বিব্রত বোধ করি না। শরীরের সবটুকু রক্ত যে পড়ে যেতে পারে তা কখনই আমাদের মনে আসে না। কিন্তু দৈবাৎ, লাখের মধ্যে এক হলেও এমন লোক আছে যারা সামান্য আঁচড়েও সঙ্গতভাবেই ভয় পায়। এদের রক্ত বন্ধ করা অত্যন্ত কঠিন এবং একটিমাত্র আঁচড়ও তাদের জন্য জীবান্তক হতে পারে। সকল মানুষের রক্তেই ফাইব্রিনোজেন নামে একধরনের প্রোটিন থাকে যা ফাইব্রিনে রূপান্তরিত হয় এবং জমাট বেঁধে ক্ষতের রক্তক্ষরণ বন্ধ করে। কয়েকটি 'রক্ত তঞ্চনকারী উপাদানের' উপস্থিতিই এর কারণ। দৈবাৎ ব্যক্তিবিশেষে এর কোন একটি উপাদান অনুপস্থিত থাকে। ত্রুটিটি বংশানুসৃত এবং নাম হিমোফিলিয়া।

রাশিয়ার শেষ জার ২য় নিকোলাসের পুত্র আলেক্সির ব্যাধিটি ছিল। স্পেনীয় যুবরাজ আল্‌ফন্সো এবং গন্সালোরও একই রোগে ভুগতেন। একই কারণে ইংলন্ডের ৭ম এডোওয়ার্ডের ভাই লিওপোল্ডের ও প্রাশিয়ার যুবরাজ সিগিস্‌মুন্ডের ভাই ভাল্ডেমার ও হেনরীর মৃত্যু ঘটে। বংশাণুবিদ্যায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে রোগটি 'রাজব্যাধি' মনে হতে পারে।

রাজপরিবারের রীতি অনুসারে যুবরাজরা যে কেবল রাজকন্যাদের পাণীগ্রহণেই বাধ্য ছিলেন প্রসঙ্গত নিয়মটি স্মর্তব্য। বেশীদিন আগের কথা নয় ত্রিশের দশকেই ইংলন্ডের ৮ম এডোওয়ার্ড মিসেস ওয়ালিস সিম্প্‌সনকে বিয়ে করার জন্য সিংহাসন ত্যাগে বাধ্য হন। কিন্তু রাজকন্যাদের সংখ্যা সীমিত এবং ইউরোপের শাসনরত সকল রাজবংশই রক্ত সম্পর্কে পরস্পর ঘনিষ্ঠ (বস্তুত তা সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে রক্তাক্ত যুদ্ধ ও সর্বপ্রকার ষড়যন্ত্রের কোন ঘাটতি ঘটে নি)।

বংশাণুতাত্ত্বিক গবেষণায় রাজা ও রাণী, যুবরাজ ও রাজকন্যারা আকর্ষী উপকরণ। বংশানুসৃত নিয়মাবলীর যাথার্থ্য প্রমাণের জন্য মানুষের মধ্যে পরনিষেক নীতিসিদ্ধ নয়। কিন্তু ইউরোপীয় রাজরাজড়ারা প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করে যেভাবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন তা প্রজনককৃত কর্মকাণ্ডেরই ঘনিষ্ঠ তুলনা। আর সাধারণ মানুষের তুলনায় রাজন্যদের বংশপঞ্জী আমাদের অধিকতর সুপরিজ্ঞাত।

ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের অষ্টম পুরুষ অবধি বংশতালিকাতে ব্যাপারটি সুস্পষ্ট: এখানে হিমোফিলিয়ার দশটি দৃষ্টান্ত আছে এবং এর সবক'টিই পুরুষাশ্রিত। এখানে কোন পুত্রই পিতার কাছ থেকে ব্যাধিটির উত্তরাধিকার লাভ করেন নি। কিন্তু তাঁদের মায়ের ভাইরা প্রায়ই এর শিকারে পরিণত হয়েছেন। মাতুলবংশ থেকে ভাগিনেয়দের মধ্যে! উইলিয়াম বেট্‌সনের ভাষায়: হিমোফিলিয়া সংক্রামিত হয় 'দাবাখেলার ঘোড়ার চালে'। এর অর্থ — দৃশ্যত সম্পূর্ণ সুস্থ মায়ের কাছ থেকে এই জিন বংশধারায় পুত্রে সংক্রামিত হয়। মিউটেশনটি প্রচ্ছন্নভাবে কেবল x-ক্রমোসোমে থাকলেই তা সম্ভবপর।

মানবকোষে যৌন ক্রমোসোমের সংখ্যা দুই। নারীর ক্ষেত্রে এরা সদৃশ দুটি x-ক্রমোসোম, কিন্তু পুরুষে এদের একটি x অন্যটি y। নারীর ক্ষেত্রে অন্যতর একটি সুস্থ জিন (অন্য x-ক্রমোসোমে অবস্থিত) হিমোফিলীয় জিনের ক্ষতিপূরণ করে। কিন্তু পুরুষে ব্যবস্থাটি অনুপস্থিত। অতঃপর 'ঘোড়ার চাল' সহজবোধ্য। পূর্বোক্ত বংশপঞ্জীর ঘনিষ্ঠ পর্যালোচনা থেকে দেখা যায়, হিমোফিলিয়ার প্রথম বাহিকা ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়া। তাঁর কোন পূর্বপুরুষ কিংবা বংশপঞ্জীর কোন পার্শ্বিক আত্মীয় হিমোফিলিয়ায় ভোগেন নি। মনে হয় মিউটেশনটি তাঁর নিজের কিংবা পূর্ববংশের একেবারে ভ্রূণপর্যায়ের শুরুতে উৎপন্ন।

হিমোফিলিয়ার উত্তাধিকার নিয়মাবলী সরল এবং মেণ্ডেলের অনেক আগেই তা জ্ঞাত ছিল। বিগত শতকের শুরুর দিকের বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে এর বর্ণনা আছে। কিন্তু লোককাহিনীতে এর উল্লেখ সুপ্রাচীন। তালমুদে উদ্ধৃত আছে, যেসকল শিশুদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অথবা মাতুলরা রক্তপাতপ্রবণ তাদের সুন্নৎ বিপজ্জনক।

বংশপঞ্জী নিরীক্ষা থেকে মানুষের বহু স্বাভাবিক ও ব্যাধিগ্রস্ত প্রলক্ষণ ও তাদের বংশানুসৃতির নিয়ম নির্ধারণ সম্ভব হয়েছে। মানব-বংশানুসৃতি

নিরীক্ষায় সাধারণভাবে বংশপঞ্জীর গুরুত্ব সর্বাধিক, কিন্তু একমাত্র উপাদান নয়।

ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, যেমন ভাইদের সদৃশ চারিত্র্যলক্ষণও বংশানুসৃতির অকাট্য প্রমাণ নয়। জীবনের সদৃশ শর্তাবলী, প্রতিপালন, শিক্ষালাভ ইত্যাদিও এর কারণ হতে পারে। আর রোগাক্রমণ সাধারণত সংক্রমণজাত হওয়াও সম্ভব। কিন্তু হিমোফিলিয়া, সিম্ফালাঞ্জিয়া (উপাঙ্গুলি) প্রভৃতি চারিত্র্য প্রতিপালন অথবা সংক্রমণের ফল নয়। কিন্তু মানসিক ক্ষমতা, চারিত্রিক প্রলক্ষণ এবং রিউমেটিক ফিভার, ক্যান্সার, শিজোফ্রেনিয়া প্রভৃতি রোগ সম্পর্কে কী বলা যায়?

বংশাণুবিদরা বংশানুসৃতি গবেষণার জন্য প্রকৃতিদত্ত এক আশ্চর্য উপাদান পেয়েছেন। তা যমজ সন্তান। যমজরা দুই প্রকার। তারা কখনও মটরশুঁটির দুটি দানার মতোই অবিকল সমরূপ, তাদের আলাদা করে চেনা কঠিন অথবা তারা সাধারণ ভাই-বোনদের থেকে তেমন কিছু পৃথক নয়। তাদের জন্মগত পার্থক্যই এর কারণ। পূর্বতন যমজরা একই নিষিক্ত ডিম্বাণুজাত। তারা অভিন্ন যমজ। তাদের জিন সংস্থিতি অভিন্নপ্রায় এবং সাদৃশ্যের কারণও এই। পরবর্তী ক্ষেত্রের যমজরা পৃথক ডিম্বাণুজাত। তারা ভ্রাতৃ যমজ।

এক ও অভিন্ন চারিত্র্য কীভাবে এক ও ভিন্ন প্রতিবেশে পালিত অভিন্ন যমজ ও ভ্রাতৃ যমজের প্রত্যেকে বিকশিত হয়, সেই তথ্যানুসন্ধানে বংশাণুবিদরা উৎসাহী। এভাবেই তাঁদের পক্ষে বংশানুসৃতি ও প্রতিবেশের আপেক্ষিক ভূমিকানির্ণয় সম্ভব। অভিন্ন যমজ ও ভ্রাতৃ যমজে ঘটনা সন্নিপাতের সমানসংখ্যা বংশানুসৃতির নিষ্ক্রিয় ভূমিকার প্রমাণ। কিন্তু অভিন্ন যমজে সন্নিপাতের সংখ্যাধিক্য বংশানুসৃতিরই সাক্ষ্য।

যমজের জন্ম দুর্লভ ঘটনা। হাজারে এর সংখ্যা প্রায় দশ। সমগ্র যমজ সংখ্যার মধ্যে অভিন্ন যমজ প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যমজদের মধ্যে শিশুমৃত্যুর হার অধিক। বিজ্ঞানে এদের আত্যন্তিক গুরুত্বের প্রেক্ষিতে অনেক বিজ্ঞানী শুধুমাত্র যমজদের গবেষণায়ই নিবিষ্ট আছেন। যমজতত্ত্ব নামে এটি একটি নতুন বিদ্যারূপে এখন সনাক্ত।

যমজদের গবেষণা থেকে যেসকল বিস্ময়কর তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে তার কয়েকটির উল্লেখ এখানে প্রাসঙ্গিক।

সর্বাধিক সম্ভাব্য নজির নিয়েই শুরু করা যাক। অভিন্ন যমজদের চোখের রঙ, চুলের রঙ, চামড়ার রঙ যথাক্রমে ৯৯·৫, ৯৭ এবং ১০০ শতাংশ ক্ষেত্রে

সদৃশ। ভ্রাতৃ যমজে হারটি যথাক্রমে ২৭, ২৩ এবং ৪৫ শতাংশ। এগুলো যে 'নিশ্চিত' বংশানুসৃত চারিত্র্য তা স্বতঃসিদ্ধ এবং যমজতত্ত্বের আগেই তা জ্ঞাত ছিল।

যমজদের রোগ সংক্রান্ত তথ্যাদির পরীক্ষা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। এজন্য উভয় যমজের রোগাক্রমণ ঘটনা হিসাবে নেওয়া হয়। কিছু রোগের দৃষ্টান্ত দেখা যাক: শিজোফ্রেনিয়ার ঘটনা অভিন্ন যমজে ৬৯ শতাংশ, ভ্রাতৃ যমজে মাত্র ১০ শতাংশ; মৃগীরোগ যথাক্রমে ৬৭ এবং ৩ শতাংশ; বহুমূত্র ৬৫ এবং ১৮ শতাংশ। অতঃপর উপরোক্ত রোগগুলিতে বংশানুসৃত পূর্বশর্তের ভূমিকা স্পষ্টতই প্রমাণিত হয়।

কিন্তু চিত্রটি সর্বত্র সমপরিমাণ স্বচ্ছ নয়। ক্যান্সার আক্রমণের তথ্যাদি পরীক্ষাকালে অভিন্ন যমজ ও ভ্রাতৃ যমজের মধ্যে কোন পার্থক্যই দেখা যায় না। কিন্তু যখনই ভাইদের মধ্যে ক্যান্সার দেখা দেয় তখনই দেখা যায় যে, এর অবস্থান, টিউমার উদ্‌গমের বয়ঃক্রম এবং এর বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি রোগলক্ষণ অভিন্ন যমজেই ঘনিষ্ঠতর। কিন্তু ভ্রাতৃ যমজে এমন সাদৃশ্য দুর্লক্ষ্য। সুতরাং কোন কোন প্রকার ক্যান্সার অবশ্যই বংশানুসৃত পূর্বশর্তনির্ভর। যা হোক, এই মারাত্মক উপাদানের সক্রিয় ভূমিকার দৃষ্টান্ত অত্যল্প।

বিভিন্ন জনসংখ্যাপুঞ্জের মধ্যে তুলনা মানব-বংশাণুবিদ্যার তৃতীয় বহুলব্যবহৃত পদ্ধতি। এখনকার আকর্ষণীয় বিষয় — জীবনের বিভিন্ন শর্তাবলী (জলবায়ু, খাদ্য, প্রাকৃতিক বিকীরণমাত্রা) এবং দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতা। পার্বত্য গ্রামের ক্ষুদ্রায়তন গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক অন্তর্বিবাহ এই শেষোক্ত অবস্থার একটি দৃষ্টান্ত।

সাধারণ বংশাণুবিদ্যায় ক্রমোসোম নিরীক্ষার অবদান কম নয় এবং স্পষ্টতই তা মানব-বংশাণুবিদ্যায়ও প্রযোজ্য। দুর্ভাগ্যবশত, মানুষের ক্রমোসোম পরীক্ষা সহজসাধ্য নয়। এরা সংখ্যায় অধিক, অতি ক্ষুদ্র এবং এদের পারস্পরিক বৈসাদৃশ্যও দুর্লক্ষ্যপ্রায়। এদের ভাল স্লাইড তৈরির সমস্যাও কঠিন এবং এজন্য মানব কোষে ক্রমোসোমের সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক অল্পকাল আগেও অমীমাংসিত ছিল...

গত কয়েক বছরে মানব কোষবংশাণুবিদ্যায় বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, কয়েকটি সাধারণ আবিষ্কারের ফলে গবেষণাপদ্ধতির পর্যাপ্ত উন্নতি ঘটেছে এবং এখন আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের জন্য ভাল স্লাইড পাওয়া মোটেই কঠিন নয়। মানুষের ক্রমোসোম নিরীক্ষার পক্ষে

রক্তই এখন সর্বাধিক ব্যবহৃত উপকরণ। রক্তকোষ অবশ্য বিভক্ত হয় না। কিন্তু এমন এক আশ্চর্য উপাদান আবিষ্কৃত হয়েছে (শিম থেকে উৎপন্ন) যা শ্বেতকণিকার বিভাজন ঘটায়। মানব ক্রমোসোম এখন পরীক্ষাসাধ্য হয়েছে।

মানুষের ক্রমোসোম নিরীক্ষা থেকে অচিরেই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি পাওয়া গেল। প্রথমত, মানুষের স্বাভাবিক কোষের ক্রমোসোম সংখ্যা যে ৪৬ এবং স্ত্রী কোষে দুইটি *x*-ক্রমোসোম এবং পুরুষ কোষে একটি *x* ও একটি *y*-ক্রমোসোম যে বর্তমান তা তর্কাতীতভাবে নির্ণীত। স্মর্তব্য, মানুষ ও ড্রসোফিলার লিঙ্গনির্ধারণের প্রক্রিয়া এক নয়। ফলের মাছির লিঙ্গনির্ধারণ এককভাবে *x*-ক্রমোসোমনির্ভর। এর দুটিতে স্ত্রী ও একটিতে পুরুষের জন্ম। এখানে *y*-ক্রমোসোমের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি সম্পূর্ণ তাৎপর্যহীন। কিন্তু মানুষের পুংলিঙ্গ *y*-ক্রমোসোমের উপস্থিতিতে এবং স্ত্রীলিঙ্গ এর অনুপস্থিতিতেই নির্ধারিত।

ক্রমোসোম আশ্রিত বহু ব্যাধিও এখন আবিষ্কৃত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ডাউন্‌স রোগ উল্লেখ্য। একটি অতিরিক্ত ক্রমোসোমের জন্যই এই জন্মগত জড়ধীগ্রস্ততা। এই রোগীর ক্রমোসোম সংখ্যা ৪৬-এর স্থলে ৪৭। নিবিষ্টতর পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়েছে কোষের ২১ নং ক্রমোসোমযুগ্মে তৃতীয় ক্রমোসোমটি অবস্থিত।

মানুষের ক্রমোসোম শুধু গবেষণাগারেই নয় ক্লিনিকেও এখন পরীক্ষিত হচ্ছে। এদের বিশ্লেষণক্ষম কম্পিউটার উদ্ভাবনের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। মনে হয়, আমাদের স্বাস্থ্য বিবরণীতে ক্রমোসোম সংখ্যার চিত্রভুক্তির দিন আর দূরবর্তী নয়।

চল্লিশের দশকের শেষের দিকে কানাডার বিজ্ঞানী মিউরেই বার দেখলেন যে, স্ত্রী কোষের নিউক্লিয়াসে সহজ রঞ্জকগ্রাহী এমন একটি বস্তু আছে যা পুরুষ কোষে অনুপস্থিত। পরে তাই *x*-ক্রমোসোম রূপে সনাক্ত হয়। যখন কোন কোষে একটিমাত্র *x*-ক্রমোসোম থাকে তখন তা আর দেখাই যায় না, কিন্তু দুটি *x*-ক্রমোসোমের ক্ষেত্রে শুধু একটিই চোখে পড়ে। দৈবাৎ যখন ব্যক্তিবিশেষে এধরনের দুটি বস্তু (বার কথিত বস্তু বা যৌন ক্রমেটিন) দেখা যায় তখন তাদের *x*-ক্রমোসোম থাকে তিনটি। সুতরাং যৌন ক্রমেটিন পরীক্ষা করে যৌন ক্রমোসোমের অস্বাভাবিকত্ব নির্ধারণ সম্ভবপর। মুখঝিল্লির একটু চাঁছনি রঙ করে তা পরীক্ষা করলেই ক্রমেটিন কণিকার সংখ্যা জানা যায়।

যৌন ক্রমেটিন আবিষ্কারের অনেক আগেই একাধিক চারিত্র্যপ্রভাবক জন্মগত বৈকল্যের তথ্যাবলী জ্ঞাত ছিল। দৃষ্টান্ত হিসেবে ক্লাইনফেল্টারস

সিনড্রোম উল্লেখ্য। এর হার প্রতি হাজার পুংশিশুর মধ্যে দুটি। তাদের যৌনগ্রন্থি অনুদ্ভিন্ন, সুতরাং বন্ধ্যা, পা অতি দীর্ঘ, চুল স্বল্প, বিক্ষিপ্ত এবং বুদ্ধি জড়তাপ্রাপ্ত। আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা থেকে দেখা যায় যে, এই লক্ষণাক্রান্তদের কোষে যৌন ক্রমেটিন অবস্থিত অর্থাৎ এরা নারীসদৃশ। স্বভাবত ফলও প্রত্যাশিতই হল: এদের ক্রমোসোম তিনটি, দুটি x ও একটি y-ক্রমোসোম।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যৌন ক্রমেটিনধারী ছেলেই শুধু নয় যৌন ক্রমেটিনহীন মেয়েও অপ্রাপ্য নয়। অবশ্য, এই শেষোক্তরা তুলনামূলকভাবে সংখ্যাল্প, পাঁচ হাজারে একটি। এসব রোগীদের কোষে মাত্র একটি x-ক্রমোসোম থাকে। এরূপ জিনসত্তাই বহু মারাত্মক লক্ষণাক্রান্ত টার্নার—শেরেশেভ্স্কি সিনড্রোমের কারণ। এ রোগটিও প্রথমে ক্লিনিকেই ধরা পড়ে কিন্তু এর ক্রমোসোমলগ্নতা সনাক্ত হয় অনেক বছর পরে।

যৌন ক্রমোসোমের অস্বাভাবিক সংখ্যাজনিত আরও বৈকল্য আছে এবং এদের অনেকেই অন্যতর ক্রমোসোম সংখ্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

সুতরাং মানুষের বংশাণুতাত্ত্বিক গবেষণার বহুবিধ জটিল প্রতিবন্ধ সত্ত্বেও বিজ্ঞানীরা এর পন্থানুসন্ধানে নিরলস। মানুষ পরীক্ষার উপকরণ নয় এবং তাদের ক্রমোসোম নিরীক্ষা অত্যন্ত কঠিন — এটুকুই শেষ কথা নয়। জন্ম ও সাবালকত্ব লাভের মধ্যবর্তী দীর্ঘ সময় এবং দম্পতি প্রতি অতি সীমিত সন্তান সংখ্যাও এর অতিরিক্ত সমস্যা। মানুষ এক্ষেত্রে ড্রসোফিলার সম্পূর্ণ উল্টো! কিন্তু বংশাণুধৃত উপকরণ হিসেবে মানুষের গুরুত্ব সর্বাধিক এবং তার বংশানুসৃতির গবেষণা অপরিহার্য। উল্লিখিত ত্রুটি সত্ত্বেও গবেষণার উপকরণ হিসেবে মানুষের যে সকল সুবিধাদি আছে প্রসঙ্গত তাও বিবেচ্য। বস্তুত অন্য কোন প্রজাতির জীবতাত্ত্বিক, শারীরবৃত্তীয় এবং অনাক্রম্যতা সংক্রান্ত তথ্যাদি এত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমরা জ্ঞাত নই। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পার্থক্যনির্ণীত ল্যাবরেটরী উপকরণ হিসেবে মানুষ আর কোন প্রাণীর সঙ্গেই তুলনীয় নয়।

আরোগ্যাতীত নয়

নবজাত সন্তান নিয়ে দুজন মহিলা এই প্রশস্ত বিছানায় এক সঙ্গে শুয়েছিল। সকালে উঠে তারা দেখল একটি শিশু আর বেঁচে নেই। মোটাসোটা

মহিলাটি ঘুমের ঘোরে ওকে চেপে মেরে ফেলেছে। কিন্তু মৃত শিশুটি কার? প্রত্যেকের দাবী — জীবন্ত শিশুটি তারই। পরম প্রাজ্ঞরূপে খ্যাত রাজা সলোমনের কাছে বিচার প্রার্থনা করে তারা নিজ নিজ পক্ষ সমর্থন করল। প্রাজ্ঞ রাজা তাঁর রায় দিলেন:

'জীবন্ত শিশুটিকে দু'ভাগ করে এদের প্রত্যেককে অর্ধেক দাও।'

রায় শুনে জীবিত সন্তানের মা বলল যে, শিশুটি দ্বিতীয় মহিলাকেই দিয়ে দেওয়া হোক, একে মেরে ফেলা অনুচিত। কিন্তু অন্য মহিলা ছিল শিশুটিকে দু'ভাগ করার পক্ষে।

অতঃপর রাজার রায় সহজবোধ্য। সন্তানটি পেল প্রথম মহিলা।

কিন্তু সত্যিই কি রাজা সলোমন এত প্রাজ্ঞ ছিলেন? এমনো হতে পারে যে, এই স্ত্রীলোকদের কেউই জানে না যে সন্তানটি আসলে কার, শুধু তাদের একজনের মমতাবোধ অন্যের চেয়ে বেশী। সলোমনের সিদ্ধান্তে নিরপেক্ষতার কোন নিশ্চয়তা নিহিত নেই।

একালে এধরনের মতানৈক্যে কোন সলোমনের দ্বারস্থ হওয়া নিষ্প্রয়োজন। অনেক সহজে নির্ভুল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এর সমাধান এখন সম্ভবপর। আজ এজন্য চিকিৎসা-বংশাণুবিদ ডাকলে তিনি শিশু, দুই মহিলা এবং তাঁদের স্বামীদের রক্তের নমুনা পরীক্ষা করে ষোলো আনা নিশ্চয়তায় সন্তানের মা-বাপকে সনাক্ত করতে পারেন।

মানব-বংশাণুবিদ্যা তত্ত্বীয় গবেষণার সঙ্গে প্রয়োগিক ফলোৎপাদনের পর্যায়েও উন্নীত। বহু বড় শহরের চিকিৎসা-বংশাণুবিদ্যার পরামর্শকেন্দ্রের অস্তিত্ব এর সাক্ষ্যস্বরূপ। কিন্তু এই ধরনের পরামর্শকেন্দ্রগুলির কাজ কী?

তাদের কাজ বহুবিধ এবং ক্রমান্বয়ে বর্ধমান। প্রথমত, যেসকল শিশুদের জন্মগত খুঁত রয়েছে তাদের মা-বাবা শিশুর প্রতিপালন ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরামর্শের জন্য এখানে আসেন। দ্বিতীয়ত, সংযমীমনা দম্পতি একটি বিকলাঙ্গ সন্তান লাভের পর কিংবা অনুরূপ কোন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় থাকার প্রেক্ষিতে পরবর্তী সন্তান লাভের জন্য দ্বিধান্বিত হতে পারেন। তাঁদের পক্ষে বংশানুসৃতি সম্পর্কিত পরামর্শ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা সম্ভাব্য বিপদ সম্পর্কে হুঁশিয়ারি পেতে অথবা ভিত্তিহীন ভয় থেকে মুক্ত হতে পারেন। স্মরণীয়, জন্মগত খুঁতমাত্রেই বংশানুসৃত নয় বরং তার উল্টো। সম্ভাব্য বিবাহরোধী লক্ষণের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। তাছাড়া বংশানুসৃত ও

অবংশানুসৃত রোগবিশেষজ্ঞ ও আদালতী মেডিকাল পরীক্ষার ক্ষেত্রেও কেন্দ্রগুলি সবিশেষ সহায়ক।

এ তো কেবল পরামর্শ। বংশানুসৃত ব্যাধি দূর করা কি সম্ভব? আমরা আজও ত্রুটিযুক্ত জিন 'মেরামতে' অক্ষম। সত্য কথা এই যে, অদূর ভবিষ্যতেও তা সম্ভব নয়। কিন্তু মিউটেশনগ্রস্ত জিনের ক্ষতিপূরণ ক্ষেত্রবিশেষে সম্ভবপর। এতে মিউটেশন অপরিবর্তিত থাকলেও রোগী স্বাভাবিক বোধ করে। তাছাড়া বিকলাঙ্গতা দূরীকরণের চেষ্টাও এখন সম্ভব। এসব কোন কল্পকাহিনী নয়। ইতিমধ্যেই এ পথে উল্লেখ্য পদক্ষেপ চিহ্নিত হয়েছে।

একটি দৃষ্টান্ত: প্যান্‌ক্রিয়াসের ইনসুলিন নিঃসরণের ব্যর্থতাজনিত কারণে শর্করার বিপাকক্রিয়ায় যে মারাত্মক বিঘ্ন ঘটে বহুমূত্র তারই ফল। সম্পূর্ণভাবে বহুমূত্র দূরীকরণ ও প্যান্‌ক্রিয়াসের পুনঃসংশোধন এখনো সাধ্যাতীত। কিন্তু রোগীরা আজ ইনসুলিন ব্যবহার করে সুস্থ বোধ করছেন। বহুমূত্রের বহু প্রকার (সবক'টি নয়) বংশাণুধৃত নয়।

হিমোফিলিয়ায়ও একই ব্যবস্থা প্রযোজ্য: রক্তক্ষরণরোধী গ্লবিউলিনপূর্ণ টিউব ও এর সঙ্গে যুক্ত ইনজেকশনের সূচ আজকাল পাওয়া যায়। নির্বীজিত একটি প্যাকেটে হিমোফিলিয়াগ্রস্তদের কাছে সর্বক্ষণ এগুলি থাকা প্রয়োজন, যাতে কোন ক্ষত হলে সে নিজেই ইনজেকশন নিতে পারে। এর ফলে তার রক্ত জমাট বাঁধবে এবং রক্তপাতে মৃত্যুর ভয় থাকবে না।

বংশানুসৃত রোগ থেকে পূর্ণ আরোগ্যের নজিরও অনুপস্থিত নয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে বংশানুক্রমিক জড়ধীত্ব উল্লেখ্য। এদের একটির নাম ফেনাইলকিটোনিউরিয়া। প্রস্রাবে প্রাপ্ত বিশেষ একধরনের রাসায়নিক পদার্থই এর মূল লক্ষণ এবং তাই এই নামকরণ। রোগটি খুব সহজলভ্য নয়। এর হার লক্ষ প্রতি চারজন। কিন্তু বিপুল বিশ্বজনসংখ্যার প্রেক্ষিতে এর মোট অঙ্ক খুব কম নয়।

যখন সন্দেহ হল যে, রোগটি বংশানুসৃত তখনই শুরু হল রোগীর বংশপঞ্জী সন্ধান। জানা গেল, ফেনাইলকিটোনিউরিয়ার স্বভাব প্রচ্ছন্ন চারিত্র্যানুগ এবং তা একক জিন মিউটেশনজাত। এই মিউটেশনের ফলে বিপাকক্রিয়ায় যে বিচ্যুতি ঘটে তাই রোগলক্ষণের কারণ এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের নিরবচ্ছিন্ন যন্ত্রণায় তা প্রকটিত। ফেনাইল্যালানিন নামক এমিনোএসিডে বিপাকক্রিয়ায় বিশৃঙ্খলার জন্যই রোগটির উদ্ভব। সুস্থ মানুষের বাড়তি ফেনাইল্যালানিন দেহ থেকে সম্পূর্ণভাবে নিষ্কাশিত হয়,

কিন্তু রোগীর ক্ষেত্রে এক বিষাক্ত পদার্থে এর রূপান্তর ঘটে। এমতাবস্থায় জন্মের কয়েক সপ্তাহ পর থেকেই যদি শিশুকে স্বল্প ফেনাইল্যালানিনযুক্ত খাদ্যে অভ্যস্ত করা হয় তবে তার স্বাভাবিক বৃদ্ধি সম্পূর্ণ অব্যাহত থাকবে।

কিন্তু নবজাত শিশুর সম্ভাব্য জড়ধীত্ব নির্ণয় কীভাবে সম্ভব? অল্প বয়সে ফেনাইলকিটোনিউরিয়া সনাক্ত করা খুবই সহজ, কারণ জন্ম থেকেই এই রোগীর প্রস্রাবে অস্বাভাবিকতা প্রকটিত হয়।

মানব-বংশাণুবিদ্যা ও চিকিৎসা-বংশাণুবিদ্যার দ্রুত বিকাশ যদিও সাম্প্রতিক ঘটনা তবু ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ১,৫০০টি বংশানুসৃত রোগের আবিষ্কারই এর প্রজ্জ্বলন্ত প্রমাণ। সমাজ এখন সঙ্গতভাবেই অধিকতর অগ্রগতি প্রত্যাশা করে। কিন্তু চিকিৎসা-বংশাণুবিদ্যাও নিজ ক্ষেত্রে এখন সমাজের কাছে তার প্রয়োজনীয় দাবীপূরণের প্রত্যাশী।

জিন আর মানুষ

আমাদের কালে পারমাণবিক শক্তি, সেমিকণ্ডাক্টার, ইলেকট্রনিক্স, সাইবারনেটিক্স ও মহাশূন্যযাত্রার কৃৎকৌশলগত অগ্রগতি যে সকল বিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কেবল তাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যারূপে স্বীকৃত। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীটি যে সর্বৈব ন্যায্য নয় তা অচিরেই স্পষ্টতর হবে। স্মরণীয়, সকল প্রকৌশল প্রকল্পই মানবকল্যাণের লক্ষ্যে নিবেদিত এবং এজন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন মানুষের প্রতি যত্নশীল হওয়া।

মানবজাতির সুপরিচর্যা ও মানব-বংশানুসৃতি নিয়ন্ত্রক নিয়মাবলী সমগ্র জীবজগতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কিন্তু মানবসমাজের বিকাশ তার স্বকীয় নিয়মনির্ভর এবং তাই প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের নিয়মাবলী থেকে তা স্পষ্টতই স্বতন্ত্র। এই পরবর্তীদের বিকাশে প্রাকৃতিক নির্বাচনই সর্বেসর্বা। কিন্তু মানবসমাজের উপর তার প্রভাব অবসিত হয়েছে বহুকাল আগে।

এমন কি দূর অতীতে মানুষ যখন প্রথম আদিম দলে সংঘবদ্ধ হতে শুরু করে তখনই উদ্বর্তনের কারণ হিসেবে ব্যক্তিচারিত্র্যের গুরুত্ব নিঃশেষিত হয়েছিল। তাছাড়া সবিশেষ উল্লেখ্য যে, তখন সুস্থতম ও বলিষ্ঠতমেরাই প্রথম প্রাণ হারাত যুদ্ধে কিংবা শিকারে, আর রুগ্ণ ও দুর্বলরা বেঁচে

থেকে সুযোগ পেত প্রজন্মান্তরে তাদের 'মন্দ' জিন সংক্রমণের। অতঃপর মানবসমাজের ক্রমোন্নতিজাত অনেক হেতুর প্রভাবে বংশানুসৃতি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও পরবর্তীকালে তাদের ভূমিকার বিপুল সম্প্রসারণ ঘটে।

ধ্বংসাত্মক যুদ্ধে বিপুলসংখ্যক প্রাণ বিনষ্ট হয়েছে, নাৎসীদের হত্যাশিবিরে বলিদত্ত হয়েছে মানবজাতির বহু বলিষ্ঠতম ও অমূল্য প্রতিনিধি।

চিকিৎসাবিজ্ঞান আজ ধন্যবাদার্হ। যে সকল বংশানুসৃত ব্যাধি কিছুকাল আগেও জীবান্তক ছিল তার উন্নতির ফলেই সেই সকল রোগীরা এখন বাঁচছে, সন্তানের জন্ম দিচ্ছে।

বংশানুসৃত ব্যাধি এখন মানবসমাজের উপর এক দুর্ভার বোঝা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, স্নায়ুরোগ ও মানসিক বিকারগ্রস্তদের বিপুলসংখ্যা লক্ষণীয়। স্নায়ু-মানসিক বৈকল্যের অর্ধেকই বংশানুসৃত। যেহেতু রোগীদের পক্ষে সার্বক্ষণিক পরিচর্যা অপরিহার্য, তাই প্রতি হাজারে ছয়জন সুস্থ মানুষ এদের জন্যই তাদের কর্মকালীন সব সময়টুকু ব্যয় করতে বাধ্য হয়।

ডাউন্‌স রোগ এর অন্যতর দৃষ্টান্ত। এটি দুষ্প্রাপ্য এবং হাজার প্রতি এর সংখ্যা মাত্র দুই। কিন্তু এতে যে অর্থ ব্যয় হয় তা প্রায় ইনফ্লুয়েঞ্জার সমান। প্রত্যেকেরই বছরে গড়ে একদিন ইনফ্লুয়েঞ্জার জন্য নষ্ট হয়। কিন্তু ডাউন্‌স রোগ ক্রনিক চারিত্র্যের। সুতরাং একজন জড়ধীর জন্য একজন সুস্থ মানুষের সবটুকু সময়ই প্রয়োজন হয়।

অতি নৈরাশ্যজনক ছবি। তাই না? আর আমরা যদি এর প্রতিবিধানে সচেষ্ট না হই তবে অবস্থার ক্রমাবনতি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু কী করা যায়?

অনেককাল আগে, আধুনিক বংশাণুবিদ্যা যখন ভ্রূণাবস্থায়, 'ইউজেনিক্স' শব্দটি তখনই উদ্ভাবিত হল। ইউজেনিক্সের অর্থ সুমানবপ্রজননবিদ্যা। শব্দটি সতর্কতাব্যঞ্জক। বিশের দশকে, মানব-বংশাণুবিদ্যার শৈশবকালে, ইউজেনিক্সের অত্যুৎসাহী সমর্থকেরা কিন্তু আজগুবি প্রস্তাব উপস্থাপিত করে। বিবাহপ্রথা নিয়ন্ত্রণ, সর্বোত্তম প্রতিভাবানদের গণপিতা হিসেবে ব্যবহার ইত্যাদি তন্মধ্যে উল্লেখ্য। নাৎসীরা জাতির পর জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার যুক্তিস্বরূপ ইউজেনিক্সকে খোলস হিসেবে ব্যবহার করেছিল।

শব্দটি এখন সন্দেহপৃক্ত এবং অশুভচক্রে আবদ্ধ। কিন্তু চিকিৎসা-বংশাণুবিদ্যার পরামর্শকেন্দ্রগুলি তাহলে কী করছে? তা কি ইউজেনিক্স নয়? ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহের নিষেধ কি ইউজেনিক্স নয়? ইউজেনিক্সের মূল প্রত্যয়সমূহে আপত্তির অবকাশ নেই। কিন্তু এর

ফলিত প্রয়োগ সঠিক তথ্যনির্ভর হওয়া উচিত এবং এই ব্যবস্থাদির সম্ভাব্য চারিত্র্য ও লক্ষ্যের প্রকৃতিই মূলকথা।

মানব-বংশানুসৃতির মৌলিক কোন উন্নতি সাধনের আনুষঙ্গিক অপরিহার্য তথ্যাদি সম্পর্কে অদ্যাবধিও আমরা জ্ঞাত নই। তাছাড়া প্রাকৃতিক নিয়মের হঠকারী বরখেলাপ যে মারাত্মক বিপজ্জনক তা অবশ্য স্মর্তব্য। স্বীয় প্রকৃতি সম্পর্কে বর্ধমান জ্ঞানের প্রেক্ষিতে মানবজাতির নিশ্চিততর ভবিতব্য যে অদূরবর্তী এতে আজ আর সন্দেহের অবকাশ নেই।

পরিভাষা

অঙ্গসংস্থান — morphology
অণুপ্রত্যঙ্গ — organellus
অতিবেগুনী — ultraviolet
অতিবেদনশীল — hypersensitive
অধঃক্ষিপ্ত — precipitated
অনন্বিত — disconnected
অনবচ্ছিন্ন — discontinuons
অনাক্রম্যতা — immunity
অনাক্রম্যতা তত্ত্ব — immunology
অনুক্রম — sequence
অনুদ্ভিন্ন — rudimentry
অন্তরণ — isolation
অন্তঃপ্রাজাতিক — intraspecific
অন্বয় — linkage
অন্বিত — linked
অপজাত — degenerate
অপুংজনি — parthenogenesis
অবংশানুসৃতি — non-intertance
অবলোহিত — infrared
অবিমিশ্র — pure
অভিন্ন যমজ — identical twins
অভীক্ষা — test
অসম্বদ্ধ — random
আত্মীকরণ — assimilation
আদি উপাদান — ground substance
আধান — charge
আণবিক বংশাণুবিদ্যা — molecular genetics

আন্তঃপ্রাজাতিক — interspecific
আবেশন — induction
আয়তাকার — oblong
আয়নক — isnizing
আয়নন — ionization
আসঞ্জন — altachment
আসঞ্জিত — altached
আহৃত — aequired

উৎক্রম — inversion
উৎক্রমিত — inverted
উৎপাদক — factor
উৎসেচক — enzyme
উদ্বর্তন — survival
উপাত্ত — fact, data

একপ্রস্থ — haploid

কলাসংস্থান — histology
কাস্তেকোষী — sickle-cell
কূটাভাস — paradox
কুণ্ডলিত — coiled
কোষপ্লাজ্‌ম — cytoplasm
কোষবংশাণুবিদ্যা — cytogenetics

গড়ুল — wart
গণব্যত্যয় — mass deviation
গলন — fusion
গুটি — cocoon
ঘাত — impulse

জড়ধী — idiot
জড়ধীগ্রস্ততা — idiosy
জননকোষ — germ cell
জিনসত্তা — genotype
জীবগোষ্ঠী তত্ত্ব — biocoenology
জীবমণ্ডল — biosphere
জীববংশজনি — biogenetic
জীবান্তক — lethal

তঞ্চন — coagulation
তর্কু — spindle
তিলকিত — spotted
তেজজীববিদ্যা — radiobiology
তেজবংশাণুবিদ্যা — radiation genetics
তেজাঘাত — irradiation
তেজাহত — irradiated

ত্রয়ী — triplet
দ্বিপ্রস্থ — gaploid
ধবলী — albino

নভোবস্তুবিদ্যা — astrophysies
নিগমভুক্ত — incorporated
নির্বীজিত — steritized
নিষেক — fertiliration
নিসর্গী — naturalist

পরনিষেক — cross fertiliration
পরপরাগ — alien pollen
পরাগায়ণ — pollination
পরিবাহী (আর-এন-এ) — transfer (RNA)
পরিবৃত্তি — variation
পরিস্রুত — filtration
পুত্তলি — pupa
পুনর্নভ — rejuvenation
পারম্পর্য — correlation

পৃথকীভবন — segrigation
পৌনঃপুণ্য — frequency
প্রকট — dominant
প্রকটন — dominance
প্রকল্প — hypothesis
প্রকারণ — variation
প্রকারোৎপত্তি — origin of varietis
প্রচ্ছন্ন — recessive
প্রতিলিপি — replica
প্রতিসঙ্গী — corresponding
প্রতীত বিষয় — phenomenon
প্রত্যাগতি — regression
প্রলক্ষণ — trait
প্রলম্বন — extension
প্রাবরণ — overlapping
ফসলী — cultivated

বংশাণু — gene
বংশাণুবিদ্যা — genetics
বংশাণুবিদ — geneticist
বংশাণুধৃত — genetic
বংশাণুসংস্থিতি — genetic composition
বংশাণুসঙ্কেত — genetic code
বংশানুসৃতি — heredity
বার্তাবাহী (আর-এন-এ) — messenger (RNA)
বাহারী — decorative
বাহ্যসত্তা — phenotype
বিপাকক্রিয়া — metabolisation
বিশুদ্ধ ধারা — pure line
বিসম উৎপত্তি — heterogenesis
বীজগমনপথ — germ route
ব্যতিহার — reciprocity
ব্যবর্তন — diffraction
ব্যামিশ্রণ — differentiation

ভাস্বর — incandescent
ভৌত — physical
ভ্রূণাণু — zygote
ভ্রাতৃ যমজ — fraternal twin
মহাণু — macromolecule
মাত্রিক — quantilative
মিউটেশনগ্রস্ত — mutant
মিথষ্ক্রিয়া — interaction
যমজতত্ত্ব — gemelology
যুগল — allele
রঞ্জকগ্রাহী — stainable
লালাগ্রন্থি — salivary gland
লিঙ্গ নির্ধারণ — sex determination
লিঙ্গান্বিত — sexlinked
শারীরবৃত্ত — physiology
শারীরস্থান — anatomy
শিম্বজাতীয় — deguminous
শূক — larva
সংযুতি — structure
সংযুতি সঙ্কেত — structural formula
সংস্থিতি — composition
সঙ্করণ — hybridization
সঙ্করসাবল্য — hybrid vigour
সঙ্কর নিষেক — hybrid fertilira-tion
সমগনীয় — homologous
সমভ্রূণাণুজাত — homozygvus
সমসত্ত্ব — homozygous
সমসংস্থ — homologous
সমাবন্ধন — combination
সম্ভাবনা তত্ত্ব — theory of probakility
সহিষ্ণু — resistant
সহিষ্ণুতা — resistance
সারণী — table
সুস্থিতি শক্তি — stabilizing force
স্বতজনন — spontaneous origin
স্বপ্রজনন — self-repliation

পাঠকের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জা সম্পর্কে আপনার মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:
প্রগতি প্রকাশন
২১, জুবোভ্স্কি বুলভার
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
21, Zubovsky Boulevard
Moscow, Soviet Union

গ্রন্থটির লেখক জীববিজ্ঞানী নিকোলাই লুচ্নিক। বংশাণুবিদ্যার অনন্য আবিষ্কার, গবেষকদের সংকটাকীর্ণ যাত্রাপথ, জীবিতের বংশানুসৃতি ও তার পুনর্গঠনে নিবিষ্ট বিজ্ঞানীদের কাহিনী এখানে বিবৃত।